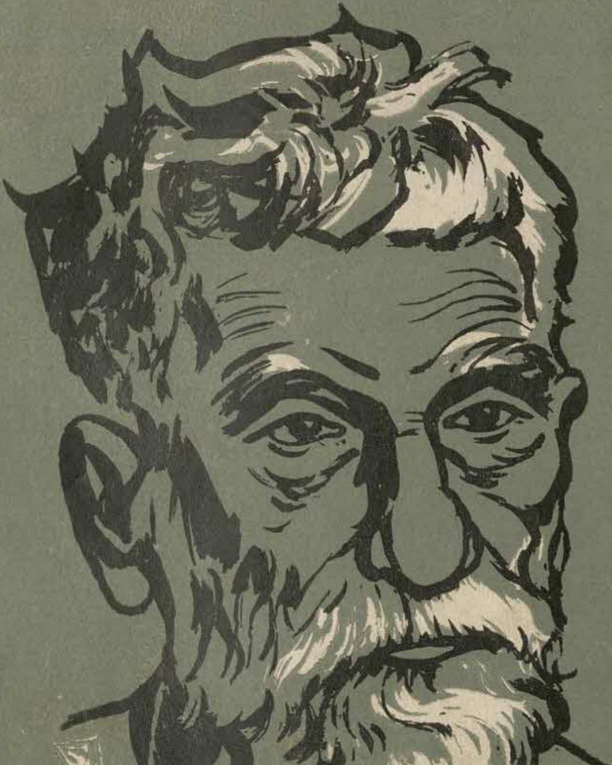


আচার্য
প্রফুল্লচন্দ্রের
চিন্তাধারা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা

অনুলেখক ও সম্পাদক

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

দিয়া ঐ স্থান ছাড়িয়া আসি। উপরের শ্রেণীগুলিতে পড়িবার কালে সুবিখ্যাত 'প্রবাসী' মাসিক পত্র পাঠের সুযোগ মিলিল, সেই সঙ্গে সুযোগ পাইলাম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিবার। এই সকল প্রবন্ধ আচার্য্যদেবের বক্তৃতার অনুলিখন। প্রায়ই প্রবন্ধ শেষে অনুলেখকের নাম লেখা থাকিত—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। দেখিতেছি এই পুস্তকে আচার্য্যের যে এগারটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার নয়টি 'প্রবাসী' হইতে গৃহীত এবং সন ১৩২৫-২৯ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত। বাকি প্রবন্ধ যাহা প্রবাসীতে বাহির হয় নাই তাহা 'মাসিক বসুমতী' হইতে লওয়া হইয়াছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেকার কথা হইলেও এখনও স্মরণ হইতেছে, প্রবাসীর পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধগুলি ঐ সময় পাঠ করি। তখন সব কিছু যে বুঝিতে পারিতাম তাহা নহে, তবে পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইতাম তাহা আজ নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আচার্য্যদেবের অনুগ্রহপুষ্ট বাগেরহাট কলেজে ভর্তি হই, এবং তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শের সুযোগ আমার ঘটে। আচার্য্যদেব প্রতি বৎসর অন্ততঃ সপ্তাহ খানেক ঐ কলেজে গিয়া থাকিতেন এবং বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার স্নেহপ্রীতি আমি প্রচুর লাভ করিয়াছি। আজ এই সুযোগে তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

আচার্য্যদেব বাঙালী জাতিকে যে কত ভালবাসিতেন, বাঙালীদের ঘরের খবর কিরূপ রাখিতেন, যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে এক আধবার মাত্রও আসিয়াছেন তাঁহারাও তাহা বুঝিতে পারিতেন। বাগেরহাটের সুপারীর কারবারে স্থানীয় লোকেরা বেশ দুই পয়সা করিয়াছিলেন। আমার নিজ জিলা বাখরগঞ্জের কোন কোন অঞ্চল, যেমন পিরোজপুর ইত্যাদি হইতে ব্যবসায়ীরা এই সব সুপারী কিনিয়া আনিতেন। কিন্তু লাভের মোটা অংশ পাইত সেই সব অবাঙালী যাহারা কলিকাতায় বসিয়া কিনিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা, কেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে উহা চালান দিত। দেখিয়াছি, আচার্য্যদেবের মনে এই জন্য কত দুঃখ! তিনি আমাকে একদিন সুপারীর ব্যবসার কথা বলিতে বলিতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আরও কত খুঁটিনাটি কথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাইতাম। সে সব এখানে বলিবার অবকাশ নাই।

এই যে বাঙালী জাতির প্রতি তাঁর মমতা, ভালবাসা তাহা এই পুস্তকে নিবদ্ধ প্রবন্ধগুলির ছত্রে ছত্রে বিধৃত রহিয়াছে। আজিকার পাঠকও যখন এগুলি পড়িবেন তখন তাহা সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু শুধুই কি মমতা বা ভালবাসা ইহার মধ্যে বিধৃত? তিনি জাতির বিবিধ সমস্যার মূলে গিয়াছেন, আলোচনা করিয়াছেন, সমাধানের নির্দেশ দিয়াছেন। বাঙালী জাতির দ্রুত অধোগতি দেখিয়া তিনি রসায়নাগারে স্থির থাকিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে তাঁহার চিন্তা নিবেদন করিয়াছেন। অদ্ভুত কথা এই যে, অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বাঙালীর জীবনে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছিল আজিও তাহার অধিকাংশেরই সমাধানের উপায় হয় নাই। কোন কোনটির, যেমন, জমিদারি প্রথার অবলুপ্তি ঘটায় কিছু কিছু সমাধান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও আবার ভিন্ন আকারে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী-জীবনের মূল সমস্যাগুলি এখনও প্রতিদিন ক্ষয়ের দিকে জাতিকে টানিয়া লইতেছে। ঐ সমস্যাগুলির সঙ্গে পাঠক এই প্রবন্ধ সমূহের মধ্য দিয়া পরিচিত হইবেন। ইহার সমাধানের উপায়ও মিলিবে। কিন্তু 'ম্যাও ধরিবে কে?' পরাধীন ভারতে সমস্যা ছিল, কিন্তু সমাধানের ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আজ স্বাধীন ভারতে আত্মশক্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও বাঙালী জাতির মূল সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় হইল না—ইহা অপেক্ষা বেদনার কথা আর কি আছে?

সেই যুগেই ঝুড়ি ঝুড়ি বি এ, এম এ, পাশ-করা যুবকেরা চক্ষে সর্ষে ফুল দেখিত। হা চাকরি, হা চাকরি করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিত। এরূপ অসহায় বেকারের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া কি লাভ? শিক্ষায় আগাগোড়া গলদ। ছেলেরা নোট মুখস্থ করিয়া পাশ করে—আসল বিষয়ের কাছ ঘেঁষিয়াও যায় না। পরীক্ষা-বৈতরণী কোন রূপে পার হয় বটে, কিন্তু ফল হয় ঐ হা চাকরি, হা চাকরি। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আচার্য্য রায় যে সমস্যার কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন আজিও কি তাহা এতটুকুও নিরাকৃত হইয়াছে? স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়াছে। পাসের সংখ্যাও আগের তুলনায় অত্যধিক। কিন্তু দু একটা 'পাস' দিবার পর অবস্থা কি দাঁড়ায়? আগেকার ঐ হা চাকরি, হা চাকরি! বেকারের সংখ্যা যে কত বাড়িয়াছে তাহার

ইয়ত্তা নাই। এক একটি ফ্যাকটারি হইতে যেমন এক এক ধরণের বস্তু বাহির হয়, তেমনি স্কুল কলেজ রূপ ফ্যাকটারি হইতেও যেন একই বস্তু বাহির হইতেছে! এক একটি বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় মনে হয় বেকার উৎপাদনের কারখানা! আচার্য্যদেব এই সমস্যা দূরীকরণের উপায়ও বাৎলাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আজিও কি আমরা তাঁহার কথা প্রণিধান করিতেছি?

ডক্টর শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য দুই বৎসরকাল ভিয়েনায় গবেষণা কার্যে রত থাকিয়া বৎসর খানেক হইল স্বদেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, অস্ট্রিয়ায় চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ বিদ্যার চর্চা হইতেছে। নির্দিষ্ট মানের পরীক্ষায় যে সব ছাত্র উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় তাহারাই এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। এই সব উৎকৃষ্ট ছাত্রের সংখ্যা শতকরা পাঁচের বেশি হইবে না। বাকি পচানব্বই জন ছাত্রই উক্ত মানের পরীক্ষান্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কৃষি শিল্প কারিগরী ব্যবসায় প্রভৃতি বৃত্তিতে লিপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশ বড়, কাজেই উচ্চ ধরণের বিবিধ বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক বিদ্যার (যাহাকে আমরা বর্তমানে প্রযুক্তি বিদ্যা বলি) জন্য শতকরা কুড়িজন উৎকৃষ্ট ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে স্থান হইতে পারে। বাকি ৮০ জন যাহারা পড়াশুনায় ভাল নয়, মাত্র পাসের মান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহাদের জন্য এই বিশাল দেশের কত ব্যাপারেই না কাজ কর্ম জুটিতে পারে। কিন্তু পূর্বেকার পরাধীন অবস্থার মত আজ এই স্বাধীন পরিবেশেও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররাই বেশি করিয়া কলেজগুলিতে ভিড় করিতেছে। কলেজে তিন চারি বৎসর তাহাদের একরূপ বিনা কাজেই পডাশুনার অছিলায় আলস্যেই কাটিয়া যায়। কিন্তু এই বৎসর কয়টি বিশেষ বিশেষ কাজে—কৃষি শিল্প ব্যবসায় এবং আরও শতরকমের ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া তাহারা শিক্ষা লাভ করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে। যত সামান্যই হোক প্রতিটি শিল্পে বা ব্যবসায়-কর্মে শিক্ষা-নবিশী দরকার। আচার্য্যদেব বলিতেন, তোমরা বাবুরা মুদিখানা খুলিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাও, কিন্তু ইহারও শিক্ষানবিশী প্রয়োজন। দাঁড়ি-পাল্লার ওজন রপ্ত করিতে সময় লাগে। যদি ওজনে কম দাও, দোকানের বদনাম হইবে, এমন কি তোমার অদৃষ্টে চড়টা চাপড়টাও জুটিতে পারে।

আর যদি ওজনে বেশি দাও তাহা হইলে দোকানের পটল তুলিতে বড় বেশি বিলম্ব হইবে না। প্রতিটি কাজই আগে শিক্ষা করা দরকার এবং ইহা সময়সাপেক্ষ।

আচার্য্যদেব মুখ্যতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের উদ্দেশ করিয়াই এই সব কথা বলিতেন। ইহার একটি বড় কারণও ছিল। আমরা জানি, শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা যাহা করে তথাকথিত অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত নিম্নবিত্ত বা নিম্নস্তরের লোকেরা তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। আজ মধ্যবিত্তদের দূরদৃষ্টির অভাবে সমাজে সামগ্রিক ভাবে কি অনর্থই না ঘটিতেছে।

আচার্য্যদেব ঐ যুগেই বাঙালী যুবকদের মান-অপমানের কথা ভুলিয়া হাতে-হাতিয়ারে কাজ করিতে বলিয়াছেন। বাঙালীর শ্রম-বিমুখতা তাঁহাকে বিশেষ পীড়া দিত। জেশপ কোম্পানির এক তরুণ কর্মীকে একদিন বলিতে শুনি—অবশ্য সে তাহার বন্ধুকে বলিতেছিল,—'দেখ আমি নাইট ডিউটি লইয়াছি কেন জান? পরিশ্রম খুবই কম। রাত দশটা হইতে বারটা কোনরূপে কাজ করি; তাহার পর সকাল ছ'টা পর্যন্ত একটানা ঘুম। সমস্ত দিনটাই বাড়িতে বসিয়া আরামে কাটাই।" একজন কারিগর কর্মীর মনোভাব যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে আর কি বলিবার আছে? আচার্য্যদেব বহুপূর্বে এই ধরণের শ্রমবিমুখতা, আলস্য ও আরামপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া ইহা সর্বপ্রকারে পরিহার করিতে বাঙালী জাতিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই শ্রমবিমুখতা শুধু শিল্পক্ষেত্রে নয়. জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ঢুকিয়াছে। ফাঁকি সর্বত্র। আচার্য্যদেব কয়েক-বারই স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইখানে স্বামীজির একটি কথা পুরনো হইলেও উল্লেখ করি—চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না।

জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি, জাতি-সংগঠন—প্রতিটি বিষয়ে মূল সমস্যার কথা তুলিয়া আচার্য্যদেব আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। শুধু বক্তৃতায় বা মুখের কথায় জাতীয় ঐক্য বা সংহতি হইবে না। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বিবিধ ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন রহিয়াছে, তেমনি হিন্দু সমাজের মধ্যে ভেদ বৈষম্য অতিমাত্রায় প্রকট। জাতিগত ও

ধর্মগত বিভেদ, অসাম্য এবং ব্যবহার-বৈষম্য দূরীকৃত করিয়াই তবে আমাদের ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাঁহার এই উপদেশ-বাণী পরবর্তীকালে কতই যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অর্থ নৈতিক কাঠামো দৃঢ় করিতে হইলে যেরূপ শিল্প ব্যবসায়ে যুবকগণকে বহুলভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে, তেমনি সমাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়া সত্যিকার প্রগতির পথে চালনা করিতে হইবে। মূলগত ভেদবৈষম্য দূর করিয়া সমাজকে সংহত ও শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবে। আজিকার দিনেও আচার্য্যের বাণী প্রণিধান করিলে আমরা নানা বাধা বিপত্তি ও বিপর্যয়ের মধ্যেও যে সুস্থ শক্ত ও শক্তিমান হইয়া উঠিতে পারি তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

আচার্য্যদেব বাঙালীর শ্রমবিমুখতা ও তজ্জনিত আর্থিক দুর্গতির কথা বারবার আমাদের শুনাইয়াছেন। আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি, শুধু ছোটবড় শিল্প ব্যবসায়ই নয়, সামান্য সামান্য কার্যেও অবাঙালীরা আসিয়া আসর জুড়িয়াছে ও লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছে। কলিকাতায় ও কলিকাতার আশেপাশে জলের কল মেরামতকারী, পান-বিড়িওয়ালা, ঠেলা গাড়ী ও গরুর গাড়ীওয়ালা, রিক্শাওয়ালা, মোটর চালক, লরীওয়ালা, —এই রকম হাজার রকমের কাজে অবাঙালীরা বিস্তর টাকা রোজগার করে এবং প্রতি মাসে মনিঅর্ডারের হিসাব যদি দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে প্রতি পক্ষান্তে বা মাসান্তে কত লক্ষ টাকা বাঙলার বাহিরে চলিয়া যায়। নিছক বাঁচিবার জন্যই আচার্য্য রায় বাঙালীকে এই সকল কথা বলিয়াছেন—অবাঙালীর প্রতি তাঁর মনোভাব কদাচ অনুদার ছিল না।

আচার্য্যদেব শুধু শহরের নয়, গ্রামের কথাও বিশেষ করিয়া বলিতেন। তরুণেরা শহরের দিকে ধাওয়া না করিয়া কত গ্রামীণ শিল্প-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারেন। বর্তমানে অনেক নূতন গ্রাম পত্তন হইয়া ঘন বসতিতে পূর্ণ হইয়াছে। গ্রাম নানারকম উপচারে শহরে পরিণত হইতে উদ্যত। আমি বর্ধমানের কলানবগ্রামে এবং মেদিনীপুরের রাজারামপুরে উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। খাট-চৌকি, চেয়ার-টেবিল-বেনচি, দরজা-জানালা, আলনা-আলমারী,

তাক-ব্রাকেট, জামা-শুকুনি ইত্যাদি তৈরী হইয়া থাকে। ছোট ছোট কারখানায় দক্ষ মিস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে যুবকেরা এইসব জিনিসপত্র তৈরী করিয়া পল্লীবাসীর চাহিদা মিটাইবে। সামান্য সামান্য জিনিষের জন্য শহরে না ছুটিয়া পল্লীবাসীরা বাড়ীতে বসিয়াই সব পাইবেন। গ্রামের অর্থ গ্রামে থাকিয়া যাইবে। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের আদর্শই আমাদের সম্মুখে ধরিয়া তুলেন। আচার্য্যদেব বাঙালীর কথা কত ভাবিয়াছেন, কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিকে ছিল তাঁহার দৃষ্টি। শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত হইয়া যুবকেরা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করিতে পারিবে, এই বিশ্বাস তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল।

পূর্বে আচার্য্যদেবের বক্তৃতাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সবই আজ দুষ্প্রাপ্য। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় রতনমণি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অনুলিখিত প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা সমূহ আমাদের নিকট পরিবেশন করিয়া একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইয়াছেন ; এ জন্য তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদভাজন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক সময়ে তো বক্তৃতাবলী মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন কি? ইহার খানিকটা উত্তর উপরের ছত্র কয়টিতে পাঠক পাইবেন। তথাপি এই পুস্তকের প্রবন্ধাবলী নূতন করিয়া পরিবেশনের অন্য কারণও বিস্তর রহিয়াছে। আর ইহাই গ্রন্থখানিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৯২৭, ১ জুলাই রতনমণি চট্টোপাধ্যায়কে যে পত্র লেখেন (পত্রগুলি পরিশিষ্টে ছাপা হইয়াছে) তাহা পাঠেই আমরা এ বৈশিষ্ট্যের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি। আচার্য্যদেব লেখেন : "প্রুফ দেখিবার সময় স্পষ্ট বোঝা যায়, যেগুলি তোমার লিখিত সেগুলি যেন অদ্ভুত ধরণের। তাহার সহিত অপরগুলি খাপ খায় না। পার্থক্য এত বেশী যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এক এক সময় মনে হয়, তুমি যদি মসী ধারণ করিতে (অবশ্য মসীজীবী বলিতেছি না) তবে সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত বলিয়া গণ্য হইতে।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়াছেন, জীবিতদের মধ্যে এরূপ লোক এখনও বিরল নন। আমিও তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা শুনিয়াছি। তিনি বাগ্মী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে বক্তৃতার মধ্যে বিবিধ বিষয়ের

অবতারণা করিতে দেখিয়াছি। একজন বিখ্যাত রাসায়নিক, রসায়ন ব্যতিরিক্ত বিবিধ বিষয়ে কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে এই কথাই শ্রোতৃবর্গের মনে হইত। সমাজের অন্তর্নিহিত কুসংস্কার ও তজ্জনিত দুঃখ দুর্দশার কথা বলিতে বলিতে তিনি উদ্বেল হইয়া উঠিতেন। মোটের উপর তিনি বেশ তাড়াতাড়িই বলিতেন এবং একটু অন্যমনস্ক হইলেই শ্রোতার পক্ষে খেই হারাইয়া যাওয়া এতটুকুও অসম্ভব ছিল না। কাজেই সুদক্ষ, সমভাবনার ভাবুক অনুলেখক না হইলে বক্তৃতার বিষয়সমূহ পারম্পর্যক্রমে ধরিয়া রাখা বেশ কঠিন হইত। রতনমণি বাবুর লেখনী মুখে তাঁহার কথাগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এবং পাঠকের নিকট রসাপ্লুত ভাবগম্ভীর সাহিত্যের নিদর্শনরূপে প্রতিভাত হইত। আজিকার দিনেও তাঁহার অনুলিখিত এই বক্তৃতাবলী, যখন পাঠ করি, তখন আমরা বিশেষ সাহিত্যরস উপভোগ করি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রতনমণি বাবুর অনুলেখনের এবম্বিধ বৈশিষ্ট্যের কথা বহুবার বিবিধ পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। একখানি পত্রে লিখিয়াছেন : "আমি হ য ব র ল যাহা বলিয়া যাই তাহা যে এমন করিয়া গাঁথা যায়, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে—তবে এই হারে রতনমণির রতন ছড়ান আছে বলিয়া এত সুন্দর হইয়াছে।" (১৮. ৪. ২২)।

আচার্য্যদেব এই বক্তৃতাবলীকে 'প্রবন্ধ' বলিতেন। বাস্তবিকই যাঁহারা ঐ দিনে, এমন কি আজিও এইগুলি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিবেন তাঁহারা,— প্রবন্ধ বলিতে যাহা বুঝি তাহারই মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় ইহাকে দিবেন। নানান্ পত্রে তিনি রতনমণি বাবুর লিখন-শৈলীর খুবই তারিফ করিয়াছেন। এমনও ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার দ্বারা অনুলিখিত ও সম্পাদিত না হইলে এ সব রসিক জনের হয়ত গ্রাহ্য হইবে না। কঠিন কঠিন বিষয়গুলি যাহা আমাদের জীবনে সমস্যারূপে তখন দেখা দিয়াছিল এবং সমাজদেহকে জীর্ণ করিয়া তুলিতেছিল, তাহা যে এত সুন্দর ও সহজভাবে পাঠকের নিকট পরিবেশন করা যায়, আচার্য্যদেব ইহা দেখিয়া সময় সময় বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। ইহা তাঁহার বিনয় স্নেহ সরলতার নিদর্শন বটে, তবে এগুলি যে বাস্তবিকই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যপদবাচ্য তাহা পাঠক মাত্রেরই

হৃদ্‌গত না হইয়া যায় না। বস্তুতঃ আচার্য্যদেব একখানি পত্রে রতনমণি বাবুকে এমনও লিখিয়াছিলেন, "তুমি Reporter স্বরূপ উপস্থিত থাকিলে আমার inspiration আসে।" (৭. ৩. ২১)। এবং, অপর একখানি পত্রে দেখিতেছি, তিনি লিখিয়াছেন, "তুমি reporter না থাকিলে সবই পণ্ড হইয়া যায়।" (১৯-৮-২২)।

আজকাল বাঙলা রিপোর্টারের ছড়াছড়ি। তখনকার দিনে এমনটি ছিল না। কাজেই রতনমণি বাবুর অনুলিখনের উপর তাঁহাকে বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইত। অনুলিখনও যে একটা আর্ট বা শৈলী তৎসম্বন্ধে আচার্য্যদেবের ধারণা অতি স্পষ্ট। সেজন্য তিনি অনুলিখনপটু রতনমণি বাবুর উপর এত আস্থাশীল ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার কোন কোন পত্র রতনমণি বাবুর সাহিত্যিক গুণপণার প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। একস্থানে আচার্য্যদেব তাঁহাকে এমনও লেখেন: "হড়্‌ বড়্‌ তড়্‌ যাহা মুখে আসিল বলিয়া গেলাম। তবে তোমার হাতে ছাইমুঠ সোণার মুঠে পরিবর্তন হয়"—(২৩. ৩. ২৫)। আচার্য্যদেবের আর একটি উক্তি: "আমি বলিয়া থাকি, 'রতন ও মণি' একসঙ্গে হইলে অনেক কাজ হয়।" (৩০. ৩. ২৩)।

আনন্দের কথা, রতনমণি বাবুকে লিখিত আচার্য্যদেবের ৪১ খানি চিঠি পরিশিষ্টে ছাপা হইয়া পুস্তকখানিকে স্বতন্ত্র একটি গৌরব দান করিয়াছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা তথা প্রবন্ধাবলী যাহা এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা শুধু আমাদের সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবারই দিগদর্শন হইয়া থাকিবে না। 'বক্তৃতা-সাহিত্য' বিভাগে নিঃসন্দেহ ইহা উচ্চস্থান অধিকার করিবে। আর আচার্য্যদেবের অমর নামের সঙ্গে স্বীয় যোগ্যতায় রতনমণি বাবুরও নাম যুক্ত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার হইলে বাঙালী জাতির প্রকৃত কল্যাণ হইবে বিশ্বাস করি।

নব-বারাকপুর
২৪ পরগণা
১৩ই মার্চ, ১৯৬৭.

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সম্পাদকের নিবেদন

'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা'র প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হইল। ইহার জন্য আমরা "প্রবাসী" ও "মাসিক বসুমতী" পত্রিকার নিকট ঋণী। অধিকাংশ প্রবন্ধ "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সময় সন ১৩২৫ হইতে ১৩২৯।

প্রবন্ধাকারে লিখিত আচার্য্য রায় মহাশয়ের এই বক্তৃতাগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিবার কারণ হইল এই যে, এইগুলি সব এক হাতের লেখা এবং এই লেখাগুলি আচার্য্য রায় মহাশয় অতিশয় পছন্দ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পরিশিষ্টে প্রকাশিত তাঁর পত্রাবলি দ্রষ্টব্য।

'এখন ও তখন' শীর্ষক বক্তৃতায় আচার্য্য রায় বলিয়াছেন যে, প্রায় ৫০ বৎসর পরে তিনি জাতির জীবনের একটা হিসাব-নিকাশ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। তারপর আজ আবার প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইতে চলিল। এক্ষণে প্রবন্ধগুলি যত্ন করিয়া পড়িলে তখন ও এখন-এর তুলনা করিয়া বিচার করা সম্ভব হইবে এবং বাঙালী সম্বন্ধে দরদী আচার্য্য রায় মহাশয়ের চিন্তা কত গভীর, আন্তরিক ও সুদূরপ্রসারী তাহা বুঝা যাইবে।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী কালে দেশে নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মদাহী পরিবর্ত্তন হইল অখণ্ড বঙ্গ খণ্ডিত হইয়া বাঙালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহা ছাড়া জমিদারী প্রথা লুপ্ত হইয়াছে। দেশে বিধ্বংসী ম্যালেরিয়া প্রায় আর নাই। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ছুঁৎমার্গ বা অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি সাধন করা হইয়াছে। শিল্পোন্নয়ন কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের ভালমন্দ দুই দিকই আছে। প্রবন্ধগুলি পাঠকালে এই সকল কথা তুলনামূলকভাবে স্বতঃই মনেই উদিত হইবে।

আচার্য্য রায় শ্রমবিমুখ বাঙালীকে পরিশ্রমী হইতে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "আমি যখন বেঙ্গল কেমিক্যাল আরম্ভ করি

তখন কুলীর মত খেটেছিলাম"—"আসল মাঝি সে-ই যে পদ্মাপার হয়েছে,—মাথার উপর দিয়ে যার অনেক ঝড়-ঝাপ্টা গেছে। ঝড়-ঝাপ্টা না পোহালে কোন কাজই হয় না।" ('চিন্তাধারা' পৃঃ ৮৭-৮৮)

আচার্য্য রায় তখন মধ্যবিত্ত বাঙালীকে ডিগ্রী ও চাকরির পথ ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিশ্রমের পথ ধরিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও বাঙালী সেই ডিগ্রী ও চাকরির আলেয়ার পিছনেই ছুটিতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদের বন্ধু ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া আমাদের সহায় হইয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় যত্নপূর্ব্বক এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, এবং জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুস্তকে তাঁহার "আচার্য্য-প্রশস্তি" শীর্ষক প্রবন্ধটি ছাপিবার অনুমতি দিয়াছেন। মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়" পুস্তক হইতে আচার্য্যের জীবনপঞ্জী উদ্ধৃত হইয়াছে। এজন্য আমরা তাঁহাদের সকলের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিশিষ্টে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে মল্লিখিত তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

প্রুফ দেখার কাজে স্নেহাস্পদ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল. এ. ও শ্রীঅজিতকুমার বসু এবং নির্ঘণ্ট তৈরি করার কাজে স্নেহাস্পদ শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ভড় আমাকে অশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সহযোগিতার কথা সানন্দে স্মরণ করি।

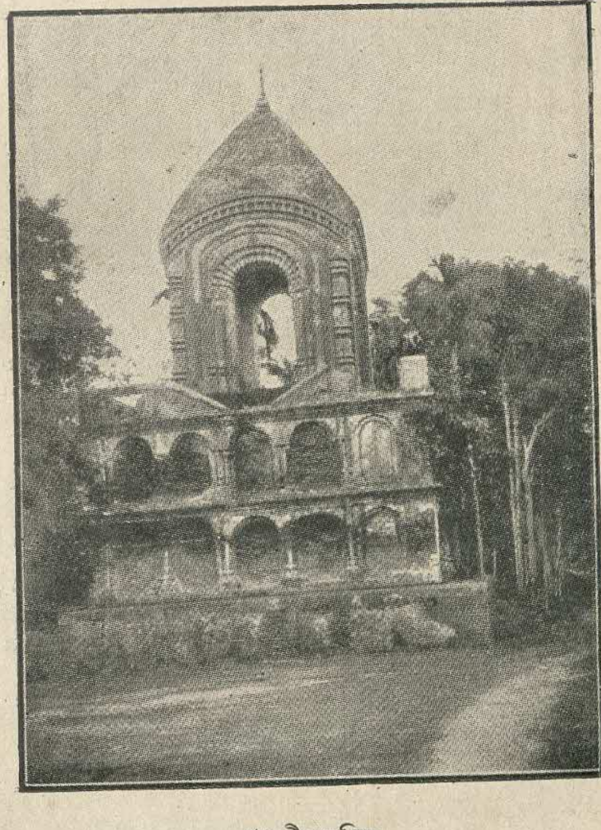
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

সূচী

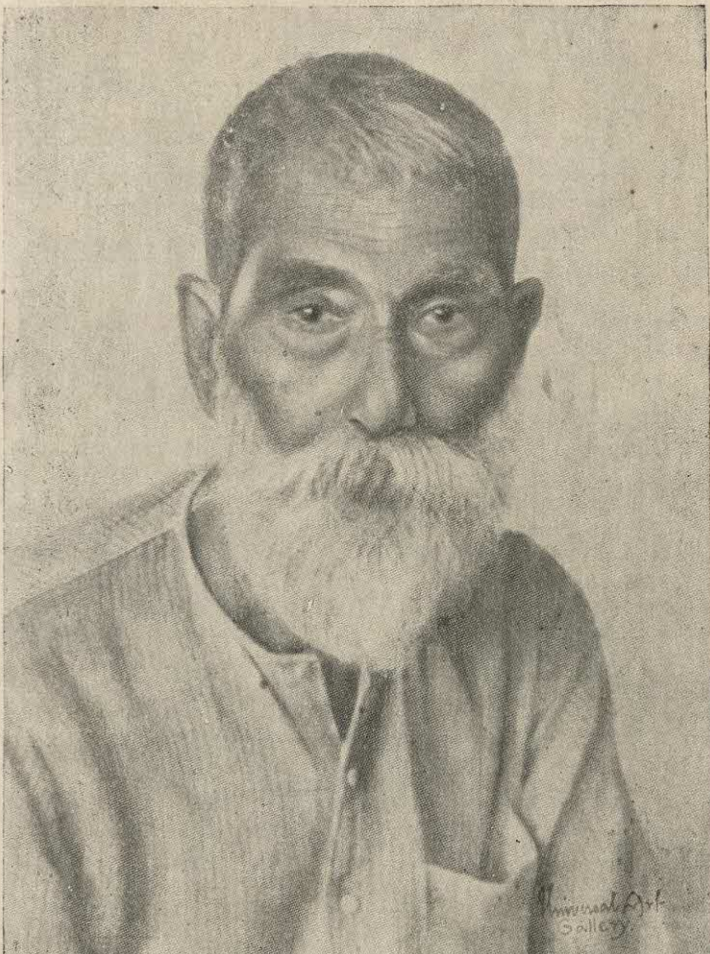
বিষয়			পৃষ্ঠা
শিক্ষা-সমস্যা			
অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ	...	...	১
পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা	...	...	১২
সময়ের সদ্ব্যবহার	...	...	২২
সাধনা ও সিদ্ধি	...	...	৪১
অন্ন-সমস্যা			
অন্ন-সমস্যা ১	...	...	৫৫
অন্ন-সমস্যা ২	...	...	৬৭
অন্ন-সমস্যা ৩	...	...	৮৩
অন্ন-সমস্যা ও বাঙালীর নিশ্চেষ্টতা	..	...	৯২
সমাজ-সমস্যা			
এখন ও তখন	...	...	১১১
জাতিগঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের		...	১২৪
জাতিভেদ-সমস্যা	...	...	১৩৫
পরিশিষ্ট			
আমি ও আমার জীবন—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়		...	১৫৫
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কয়খানি চিঠি		...	১৫৮
আচার্য্য-প্রশস্তি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু—জাতীয় অধ্যাপক			১৭৭
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়		...	১৮৪
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাদেশিকতা—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়			১৯৫
জনসেবায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়			২০৩
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনপঞ্জী	...	...	২১০
নির্ঘণ্ট	...	...	২১৩



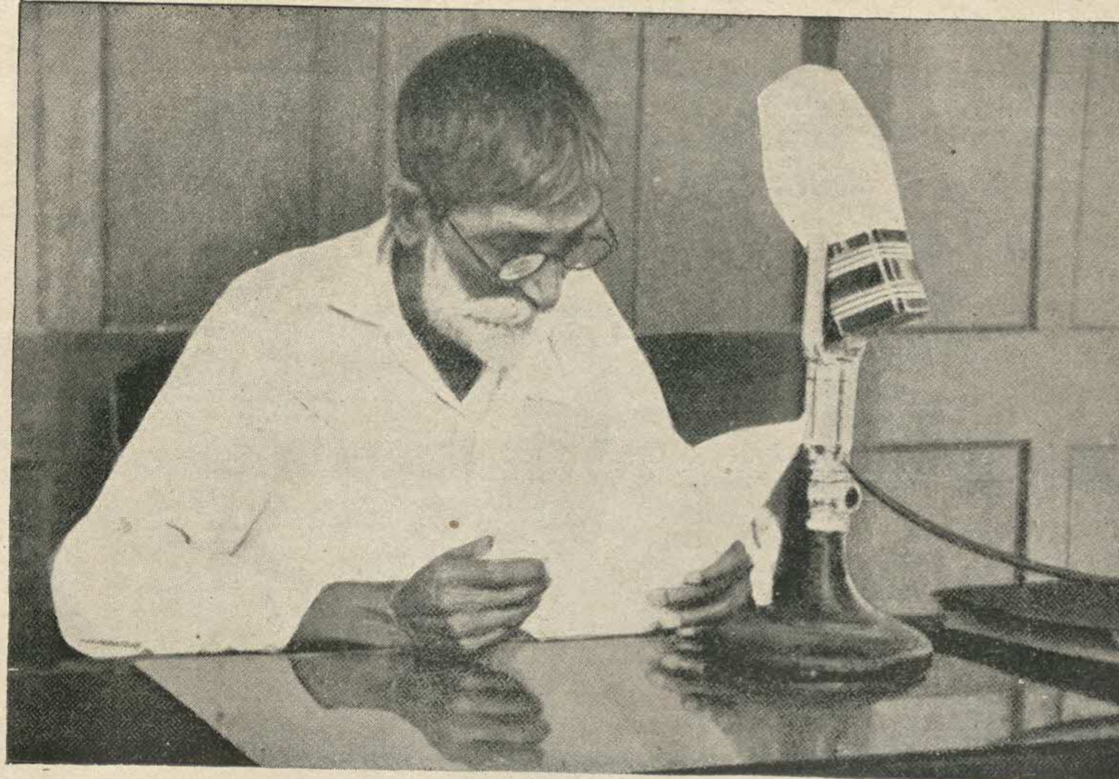
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র



রাড়ুলীর মন্দির



বৃদ্ধবয়সে প্রফুল্লচন্দ্র



অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র



যৌবনে প্রফুল্লচন্দ্র

শিক্ষা-সমস্যা

অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

আমি এখনও নিজেকে ছাত্র ব'লে গণ্য করি। ঐ জীবন ত্যাগ করে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ করেছি ব'লে মনে হয় না। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—বাস্তবিক এই ঋষিবাক্য বড় সত্য—বড় সার কথা। আর আমাদের এই ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের পার্থক্যের প্রাচীর বড়ই অমঙ্গলকর।

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি ষ্টডী অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ করবার অর্থ এই, আর যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুর ঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়-দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুরঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত করতে হবে, তাকে নিভৃতে স্থাপন করতে হবে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র বাড়ীতে থাকেন, আবার অনেকে মেসে থাকেন। এখানে ছাত্রের প্রধান বিপদ এই যে তার কোন স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকে না। বড়লোকে বড় বাড়ীতে থাকেন—নানাকার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য তাঁদের অনেক ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বাড়ীর ছেলে কিরূপে কোলাহলের বাইরে নির্জ্জনে বসে পড়বে সাধারণতঃ কোন বাড়ীতেই তার বন্দোবস্ত থাকে না—এরূপ বন্দোবস্ত যে থাকা দরকার তাও কেউ ভাল ক'রে উপলব্ধি করেন না। আর মেসের ত কথাই নেই। আমাদের দেশে কথা আছে—'এক উস্‌খুস্ দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট'। মেসে অনেকে একত্র জোটে, কাজেই প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। হাটে হয় হট্টগোল, সরস্বতী সেখানে টিকতে পারেন না। মন্দিরে যেরূপ ভক্তের জপতপ আরাধনা—পাঠাগারে সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা। ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য অধ্যয়ন; আর এই অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধিদান করে।

প্রথম কথা এই যে—কি করে পড়তে হয় ? ক' ঘণ্টা পড় তার হিসাব রাখবার দরকার নেই, কিরূপ একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন কর সেইটাই সবার চেয়ে দরকারি জিনিস। পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে—ঘণ্টার উপর নয়—একাগ্রতার উপর নির্ভর করতে হয়। আমি আজ সকালে "খুব" পড়েছি—কিন্তু মোটে একঘণ্টা, কি তার কিছু বেশী। এইভাবে আমি রোজই পড়ি, তা রবিবার নেই, ছুটিও নেই, অবকাশ নেই। এইভাবে সমানে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত পড়ে যেতে হবে। কিন্তু এদেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ গল্প, খেলা আর আড্ডা। একাগ্রতার সম্পূর্ণ অভাব ; তার উপর পড়বার সব সময়টা খেয়াল ও হুজুগের মধ্যে কেটে যায়। পরে যখন পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসে—তখন আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে, রাত্রিজাগরণে স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে তার জন্যে প্রস্তুত হবার বিপুল প্রয়াস। এ-কে লেখাপড়া বলে না, এ লেখাপড়া নয়, এ ইউনিভারসিটিকে ফাঁকি। কেবল মুখস্থ আর উদরস্থ ; পেটুকের মিষ্টান্ন ভক্ষণের মত—এক পন সন্দেশ টপাটপ্ করে গেলা, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি। সব সময়টা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা কাছে এলেই টপাটপ্ মুখস্থ ও উদরস্থ করবার প্রয়াস ; তারপর পরীক্ষা-মন্দিরে গিয়ে একেবারে বমি। পরীক্ষার পরই সরস্বতীর সঙ্গে 'সেলাম আলেকম্'—সকল সম্বন্ধ লোপ। আর পাশ হলে 'হকার' চাচার দোকানে পুস্তক-বিসর্জ্জন। মনে পড়ে ছেলেবেলায় জ্বর হ'ত, আর কেবল মিছরী, বেদানা ও কুইনিন খেতে হ'ত। বাল্যজ্বর মনে করিয়ে দেয় ব'লে ঐ জিনিসগুলোয় আমার একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা আছে—ওগুলো আমার কাছে বিভীষিকা! পাশ করবার পর এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর ঠিক ঐ রকমই তীব্র বিতৃষ্ণা হয়—বইগুলো তাদের কাছে আতঙ্ক উপস্থিত করে। পুস্তককে আজীবন সঙ্গী করতে হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পরীক্ষার পর বই আর পাবার জো নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার কোন ছাত্রকে বলেছিলেন "ব্ল্যাকীর সেলফ-কালচার' বইখানা দাও ত"। সে জবাব দিলে "সে বই তালাবন্ধ, দেখলে ভয় হয়"। এ বড় দুঃখের কথা। সৎ পুস্তককে আজীবন সহচর করতে হবে, আজীবন ধ'রে সৎপুস্তক পাঠে ভাব সংগ্রহ করতে হবে, হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে হবে এবং প্রকৃত

জ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে। ইংরেজ কবি সাদি পুস্তককে লক্ষ্য করে যথার্থই বলেছেন—

"The mighty minds of old"
"My never-failing friends are they."

পুস্তকপাঠের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে খুব বেশী বই পড়বার দরকার হয় না। অনেকে যা পায় তাই পড়ে, পরিণত বয়সেও তাদের এই অভ্যাস থেকে যায়। তারা কখন পুস্তক নির্ব্বাচন ক'রে পড়ে না। ছুটি পেলে তারা অনেক রকমে অনেক পয়সা ব্যয় করবে। বেড়াবার সখ্ মেটাবার জন্যে দামী পোষাক, ট্রাঙ্ক, গ্লাড্‌ষ্টোন্ ব্যাগ কিনবে, কিন্তু ছুটিতে পড়বার জন্যে কি বই সঙ্গে নিয়ে যাবে কখনই তার কিছু স্থির করবে না। হাতে যা পাবে তাই পড়বে, কিছু বিচার করবে না। বায়রণের পদ্য থেকে এমার্সন বলেন, "He knew not what to say and so he swore"। প্রথম মনে হ'ল কি পড়ব? খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম, আগে খবর পড়লাম, তারপর অন্য কথা পড়া হ'ল, শেষ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ পর্য্যন্ত নিঃশেষ করা গেল। কি পাওয়া গেল, কি বোঝা গেল, তার কোন চিন্তাই করলাম না। কিন্তু এরকম ঠিক নয়, উদ্দেশ্যবিহীন পাঠ কোনমতেই ঠিক নয়। সবার আগে পড়বার উদ্দেশ্য খুব ভাল করে বুঝতে হবে, তারপর রুচি অনুসারে পুস্তক নির্ব্বাচন করতে হবে, কারণ সকলের সব বই ভাল লাগে না। কিন্তু একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তারই উপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচন করা এদেশের ছাত্রদের মধ্যে নেই বললেই চলে। যে-কোন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যদি জিজ্ঞাসা করে দেখেন,—"পাঠকগণ নভেল নাটকই বা কত পড়েন, আর ইতিহাস ও জীবনীই বা কখানা পড়েন,"—দেখবেন তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যাবে না।

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে নভেলের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর আগ্রহ দেখা যায়। ভাল-পাশ-করা শিক্ষিত ছেলে ছুটিতে যদি নভেল পেলে ত স্নানাহার বন্ধ—যতক্ষণ না বইখানা শেষ হয়। কিন্তু একখানা নভেল পড়তে আমার ছ'মাস লাগে, কারণ আমাকে ঠিক সময়মত কাজ করতে হয়, ল্যাবরেটরীতে কাজ করার পর আধ ঘণ্টা সময় পেলে পড়ি, নইলে নয়। সব কাজেরই

একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা চাই—সকলেরই এই প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ আমাদের দেশে, যেখানে স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোকে আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত, দেশে খাবার নেই, শরীরে পুষ্টি নেই। সকলেই দীন দরিদ্র, অন্নসংস্থানের ভাবনায় সবাই অস্থির। বাঙালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য মাছ ও দুধ সর্ব্বত্রই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। একে অস্বাস্থ্যের এই সব কারণ উপস্থিত রয়েছে, তার উপর ছাত্রের অতিরিক্ত পাঠ; কাজেই অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সে কাজের বা'র হ'য়ে পড়ে। ২৪ ঘণ্টায় একদিন। ছেলেমানুষের আট ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হয়। ১৬ ঘণ্টা হাতে থাকে। তার মধ্যে রোজ ৪ ঘণ্টা পড়লেই প্রচুর। কিন্তু পড়তে হবে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হবে না। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রধান শত্রু—পড়বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ করলে গল্প আসবেই, অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আসবে। আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে আড্ডা। বেশী বয়সে আমরা সবাই বসে কাটাই, বাহিরে উঠে হেটে বেড়াতে উৎসাহ আসে না, প্রবৃত্তিও হয় না; তাসপাশাতেই কত সময় কেটে যায়। আবার এই তাশপাশার আড্ডার পাশে অনেক সময় ছেলেরা পড়াশুনা করে। বিপদ্ কি ভয়ানক! ইউরোপীয়ান্ যখন পাঠাগারে একমনে অধ্যয়ন করে তখন তার স্ত্রীকেও ("May I come in") "আমি কি ভিতরে যেতে পারি" এই ব'লে দরজায় (Knock) টোকা দিতে হয়। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরে যেতে হচ্ছে—যেন শুধু বিরক্ত করতে। কারণ পাঠাগার ঠাকুরঘরের মত পবিত্র স্থান, সেখানে কথা কওয়া পাপ।

তার পরের কথা—

"Work while you work, play while you play,
This is the way to be cheerful and gay"—

কাজের সময় কাজ করতে হয়, খেলার সময় খেলা; তা হ'লেই মনে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে। আমি সর্ব্বদাই কাজ করি, আবার অবসর মত করি না। একজন বড় ইংরেজ দোকানদার আপিসে এক মনে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম ক'রে কাজ করে, কিন্তু যেমনি কাজ শেষ হয় অমনি গঙ্গার ধারে, খোলা মাঠে, মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যায়। তারা সে সময়ে

বসে থাকে না, কুড়েমি করে না, আড্ডা বা মজলিসে জমে না। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য রাখতে জানি না, সময়ে কাজ করি না, তাই শরীর ও সময় দুই-এরই অপব্যবহার হয়, স্বাস্থ্যও থাকে না, কাজও ওঠে না।

এদেশে শুধু বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপে সাধারণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ ক'রে জ্ঞানার্জ্জন করবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু বই পড়ে কত শেখা যায়? নিজের চেষ্টায় বিশ্বরাজ্যের নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা নিপুণ চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়, তবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হয়। পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় কখনই বেশি হয় না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে মদের দোকানে গিয়ে বসে থাকতেন। উদ্দেশ্য মাতালের কথাবার্ত্তা শুনে তার প্রকৃতি বুঝে দেখা। এইভাবে নানা রকমে বিখ্যাত ইউরোপীয়েরা মানব-প্রকৃতি নিখুঁত করে জানবার চেষ্টা করেন। এ-ই প্রকৃত অধ্যয়ন। মানব-প্রকৃতির পর জড়-প্রকৃতি। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাও বুঝতে হবে। লণ্ডনের কাছে এক বোটানিকেল গার্ডেন আছে, তার নাম কিউ গার্ডেন্স (Kew Gardens), পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ করবার জন্যে শত সহস্র বিদ্যার্থী যেখানে যান। নানা রকমের গাছ, তাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিয়ম—নিজের চোখে সুকৌশল পর্য্যবেক্ষণ ক'রে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তাঁরা অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। আর আমাদের এই সুজলা সুফলা দেশে, এই ভারতবর্ষে ত গাছের অভাব নেই। কিন্তু উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কি তত্ত্ব জানতে পেরেছি আমরা? বিলাতে তিন মাস, কি তার কিছু বেশি দিন ধ'রে গাছপালায় সবুজ পাতা থাকে। অন্য সময়ে কাচের ঘরের মধ্যে কলাগাছ প্রভৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কয় মাসের সুবিধায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন করে সেই সম্বন্ধে নানা সত্য আবিষ্কার করে। আর আমরা এই চির সবুজ দেশে চিরকালই চুপ ক'রে বসে থাকি। চক্ষুষ্মান্ কারা? ১৮৪৫ সালে হুকার নামে এই ইউরেপীয়ান্ এ দেশে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ করতে এসেছিলেন। তখন দার্জ্জিলিঙ্গের রেল হয় নি। কিন্তু তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে গাছগাছড়া দেখবার জন্যে সিকিম গেলেন। তারপর সে দেশে বন্দী হলেন; সেই কারণে

সিকিমের সঙ্গে যুদ্ধই বেধে গেল। যা হোক্ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি ১০,০০০ (দশ হাজার) রকম আবশ্যকীয় গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে বিলাতে ফিরে গেলেন ; সে-সব এখনও কিউ গার্ডেন্সে (Kew Gardens) আছে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে ভারতের উদ্ভিদ্-জ্ঞান ইংরেজের বই প'ড়ে শিখতে হয়।

রকস্‌বর্গের Flora Indica নামে এক অমূল্য গ্রন্থ আছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সমস্ত ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করে নানা রকম গাছ সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রত্যেকটির বাঙ্গালা হিন্দী তামিল নাম জোগাড় করেছিলেন। তাঁর বই সকলে পড়ে। এঁরা ইউরোপীয়ান্ ম্লেচ্ছ, কিন্তু আমাদের চিরস্মরণীয়।

জূঅলজিক্যাল গার্ডেনে ইউরোপীয়েরা নানা রকম পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির জীবন-যাপন-প্রণালী অধ্যয়ন করেন। ফরাসী দেশের একজন উকিল কুড়ি বৎসর ধ'রে শুঁয়োপোকা ও প্রজাপতি কেমন ক'রে এক থেকে অপরে পরিণত হয় তা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন, আর তার একটি কৌতূহলপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি নিজের চোখে গুটি ও তুঁত পোকার জীবনযাত্রা দেখে, ঐ সকল কীট থেকে রেশম উৎপন্ন করা সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় নূতন কথা সভ্য জগৎকে জানিয়েছেন। আর একজন অন্ধ মধুমক্ষিকার ইতিহাস লিখেছেন। তিনি যৌবনে অন্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্য মধুমক্ষিকার জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে সেই সব কথা তাঁর কাছে বলতেন এবং তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তা লিপিবদ্ধ করতেন। এই প্রকারে হিউবার (Huber) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক মৌমাছির ইতিবৃত্ত (History of the Bees) লিখেছেন।

ইংরেজ ও আমেরিকানের এক একটা Hobby অর্থাৎ খেয়াল আছে। কেউ গার্ডেনিং করেন, বাগানে নানা রকম ফল ফুল উৎপন্ন করেন। এ একটা সুন্দর খেয়াল। কেউ বা প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, আবার কেউ বা পতঙ্গবিজ্ঞান (Entomology) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল নিজে পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ইংরেজ কখন ব'সে থাকে না। এই রকম একটা খেয়ালে থাকে। এই

সকল ব্যাপার অধ্যয়ন ক'রে তাঁদের সকলেই যে কলেজের অধ্যাপক হন তা নয়, কিন্তু এই সব কথা পুস্তকে প্রকাশ ক'রে তাঁরা জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন, তাঁদের বিলক্ষণ আয়ও হয়।

এদেশে গবর্মেন্ট পুনা কৃষি-কলেজে লেফ্রয় (Lefroy) নামক একজন মস্ত পতঙ্গতত্ত্ববিৎ (entomologist) কে এনেছেন। তিনি কোন্ কোন্ পতঙ্গ শস্য নষ্ট করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমরা জানি শুধু পঙ্গপালই ফসল নষ্ট করে দেয়; কিন্তু আরও অনেক রকম পতঙ্গ আছে যারা ফসলের বড় কম ক্ষতি করে না। ইনি তাদেরই জীবনযাত্রা আলোচনা করছেন, আর কিসে তাদের নষ্ট করে শস্য বাঁচানো যায় তার উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। এই সকল ব্যাপারের আলোচনা ও অধ্যয়ন আমাদের ব্যবসা ও ধনাগম সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করে। যাঁরা পতঙ্গবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কি ক'রে তুঁতপোকাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা ক'রে বর্দ্ধিত করতে হয়, তা জানেন। গুটিপোকার রোগ হলে তা থেকে ভাল রেশম হয় না। ফ্রান্সে "Disease of Silkworm" অর্থাৎ গুটিপোকার রোগ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সে বই পড়ে যাঁরা রেশমের চাষ করেন তাঁরা গুটিপোকাকে বর্দ্ধিত করবার নানা রকম উপায় জানতে পেরেছেন, আর সেই কারণে রেশমের চাষে খুব লাভবান্ হয়েছেন। আর আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে—যেখানকার উৎকৃষ্ট রেশম এক সময়ে সব দেশে আদৃত হ'ত—সেখানে রেশমের চাষ দিন দিন উঠে যাচ্ছে; কারণ আমরা ঐ কাজ অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলে রেখে দিয়েছি যাদের গুটিপোকা সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জ্ঞান নেই।

এই সমস্ত কারণেই বলছি যে, শেখবার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়লেই হয় না। আমি এলবার্ট স্কুলে পড়তাম্। সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হ'ত। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, "বাঙালীর ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিসের খোলে তুলো পুরে দেওয়া; কেবল ঠাসো আর গাদো।" তার উপর অভিভাবক সর্ব্বনাশ করছেন—স্কুলের ছুটি হ'লেই মাষ্টার মশাইকে ছেলের পিছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখবে। এঁরা হচ্ছেন murderer of boys

বালকহন্তা, কারণ স্কুলের ছুটির পর ছেলের অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোটো, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও। তবে ত স্বাস্থ্য থাকবে, মনে প্রফুল্লতা আসবে। তা নয়, বাড়ী এসেই কেতাব নিয়ে বসো। তারপর কোন্ ছেলে কোন্ বিষয়ে backward অর্থাৎ কাঁচা,—অমনি প্রাইভেট টিউটর লাগাও—ইংলিসে একটি, সংস্কৃতে একটি, সব বিষয়ে একটি একটি। টিউটরের ঠেলায় বেচারি ছাত্র একবারে dull অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে, নিজে ভাববার বা নিজের উপর নির্ভর করবার শক্তি তার একেবারে লোপ পায়। তাই বলি, এ প্রথার অনেক দোষ। এমার্সন বলেন "Guardians are benefactors but sometimes they act like the worst malefactors,"—অভিভাবকগণ ছেলের উপকার করেন বটে কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর অপকার সাধন করে থাকেন। বেশী পড়লেই বিদ্যে হয় না। আমি আজীবন ধরে সামান্য একটি বিদ্যা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাঠ ত এক ঘণ্টা।

আমাদের বাঙ্গালীর ছেলের জীবন যেন একটা ভার বওয়া। বেদান্ত মতে জীবন কিছুই নয়, দুহাজার বছর ধরে আমরা চিরকাল শুনে আসছি, জীবন মানে কিছুই নয়—'নলিনীদলগতজলমিব'—এর একটা প্রভাব জাতীয় চরিত্রে ত আছেই। আমরা সকলেই খানিকটা স্বীকার করে নিই যে জীবন একটা দুর্ব্বহ ভার। তার উপর আবার এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রাম। সকাল আটটার সময় বাড়ী থেকে দৌড়াদৌড়ি করে ম্যালেরিয়াজীর্ণ শরীর খানি নিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করা অর্থাৎ কলম পিষে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য সহরের দিকে ছুটোছুটি করা। দিন যে কোথা দিয়ে চলে যায়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী তা জানতে পারে না—পৃথিবীর কোন আনন্দই সে উপভোগ করে না। আকাশের উন্মুক্ততা, আলোকের হাসি বা বাতাসের সুখময় স্পর্শ—কিছুই তার প্রাণে সজীবতা ও নবীনতা আনয়ন করে না। লাবকের (Lubbock) "জীবনের সুখ" নামে একখানি পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকে তিনি বলছেন—জীবন কি শুধু ঔষধ-গেলা। জীবনে আনন্দ-উপভোগই বিধাতার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে সেই উদ্দেশ্য বিফল করি। পাখী গায় কেন, মৌমাছি মধু আহরণ করে কেন, যদি বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকে?

লাবক একজন ধনী মহাজন (broker) ছিলেন। অতুল তাঁর ধন ঐশ্বর্য্য, কিন্তু লেখাপড়া যথেষ্ট জানতেন। তিনি আজীবন ছাত্র (student)। অনেক ইউরোপীয় ধনী মৌমাছি পিঁপড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করেছেন। আমরা তা বই পড়ে জানি, কিন্তু তাঁরা নিজের চোখে দেখে ঐ সব কথা লিখে গেছেন। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। শুধু চোখ থাকলেই হয় না, সূক্ষ্ম দর্শন চাই। ইউরোপীয়ান্ লেখক লাবক মৌমাছিদের সাধারণতন্ত্র (Republic) সম্বন্ধে এক চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মৌচাকে কেমন ক'রে তারা সকলে কাজ করে, সে অদ্ভুত বিবরণ পড়লে—মাতোয়ারা হ'য়ে উঠতে হয়। লর্ড এভবেরী (Sir John Lubbock) যে শুধু ধনী ছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক। আমাদের দেশের ধনী সাধারণতঃ জবড়জং জানোয়ার হয়। তার নাকের ডগা থেকে ওলনদড়ি ঝুলিয়ে দিলে ভুঁড়ির দরুন perpendicular অর্থাৎ লম্বরেখার যে বিচ্যুতি হয় তাই তাঁর ধনশালিতার মাপ। ধনী জুড়ি চড়েন, আর আয়েসে বিলাসে ডুবে থাকেন। কিন্তু ইউরোপে অনেক স্থলে এরূপ হয় না। বিলাতে মাটির তলায় রেল (underground railway) আছে। তাতে প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী নেই। লাখ্‌পতি ও সাধারণ লোক সব এক জায়গায় বসে। এণ্ড কার্ণেগী একজন ক্রোড়পতি ; পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোহের মালিক। আমেরিকার পিট্‌স্‌বার্গে তাঁর লোহার কারখানা ছিল। প্রথম বয়সে তিনি রাস্তায় খবরের কাগজ বেচতেন। তারপর অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে আমেরিকায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। পরে টাকা রোজগার ত্যাগ করে অধ্যয়নে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তাঁর ব্যবসা এত বড় ছিল যে, একজনে নয়—অনেকে প'ড়ে ৯০ কোটি টাকা দিয়ে সেই ব্যবসাটি কিনেছেন ; তার বাৎসরিক আয় হচ্ছে সাড়ে চার কোটি টাকা। তিনি শ্রমজীবীদের জন্যে আমেরিকা ও স্কটলণ্ডের অনেক সহরে বিনাব্যয়ে অধিগম্য পাঠাগার স্থাপন করেছেন। মজুরগণ সন্ধ্যার পর যখন অবসর পায় তখন ঐ-সমস্ত লাইব্রেরীতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করে আত্মোন্নতি সাধন করে। কার্ণেগী এখনও (এই বছর দুই তিন নয়) অনেক বই লিখছেন। নাইনটিন্থ

সেঞ্চুরী পত্রিকায় তিনি শ্রমজীবীদের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি, তাঁর আয় ছিল সাড়ে চার কোটি টাকা। আমাদের এই বাঙ্গালা বিহার ও অন্য জায়গায় সকল জমিদারের বাৎসরিক আয় জড়িয়ে সাড়ে চার কোটি নয়। এখানকার সকল জমিদারকে একদিকে আর কার্ণেগীকে একদিকে রেখে ওজন করলে টাকায় তিনিই ভারী হবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে তিনি এখনও পড়েন। ছিলেন "ষ্ট্রীট্ বয়" রাস্তায় কাগজ বেচতেন, কেবল স্বাবলম্বনের জোরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হয়েছেন।

তোমরা অনেকেই ইউনিভারসিটির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হও। সেটা ভাল; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশঃ। কারণ পাশের পর তোমরা নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। এ রকম ভাল-পাশ-করা ছেলের যজ্জীবনম্ তন্মরণম্। ইংলণ্ডে কিন্তু তা নয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা খুব বেশী পড়ে না, অকালপক্ক হয় না, এঁচোড়ে পাকে না। ১৮৭৫ সালে ফার্ষ্ট ক্লাস পাশ করে আমরা আজীবন তার দোহাই দিয়ে থাকি, যদিও এই পাশ করার পর লেখাপড়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই আমাদের থাকে না। তারপর এই ফার্ষ্ট ক্লাস পাশ করাটাই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের যা Academic year তাতে ত দুবছরে দশ মাস মাত্র পড়া হয়। এই দশ মাস প'ড়ে সব বিদ্যা আয়ত্ত হ'য়ে যায় কি? আজীবন না পড়লে শেখা যায় না। প্রত্যেক দিন নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, সে-সকলের খবর রাখতে হবে। ফার্ষ্ট হও আর না হও, আজীবন পড়বে, পাশ হবার পরেই কেতাবের সঙ্গে সেলাম আলেকম্ ক'রে তার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কি ভয়ঙ্কর! কি সর্ব্বনাশ! এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দেখ্‌লে আতঙ্কে আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। তারা ছদ্মবেশী মূর্খ।

এমার্সন বলেন, "কোন ছেলে backward অর্থাৎ পড়াশোনায় কাঁচা হ'লে তাকে তিরস্কার করবে না। সাধারণতঃ ছেলেরা সব বিষয়ে ভাল বা চৌকস হয় না। যে ছেলে সব বিষয়ে ভাল সে ত একটা miracle—একটা অদ্ভুত কিছু, যা ভূতলে অতুল।" এমার্সন আরও বলেন,"কোন ছেলে যদি চুরি ক'রে ক্লাসের বই ছাড়া অন্য বই পড়ে, মাষ্টার তাকে বেত মারেন; আমি হলে পুরস্কার দিই।" ছাত্র হয়ত নেপোলিয়নের জীবনী বা গোল্ডস্মিথের ইতিহাস

বা যা তার স্কুলপাঠ্য নয় এমন কিছু পড়ছে ; তাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, উৎসাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, কারণ সে অনেক নূতন বিষয় শিখতে পারবে। ছাত্রের প্রতি চাপ দেওয়া উচিত নয়, তার প্রতিভার যাতে বিকাশ হয় শিক্ষকদের তাই করা চাই। ইউনিভার্সিটির বাঁধা বই পড়লে বা গোটাকতক পাশ করলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। হালিসহরে রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন, তাঁর কথা সবাই জান। তিনি হিসাব-লেখার এক চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু খাতার পিঠে পিঠে কালী-সংকীর্ত্তন লিখতেন। এমন কি ভারতের যে দুজন জগতে অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন,—রবীন্দ্রনাথ ও রামানুজম্ (ইনি সম্প্রতি রয়েল সোসাইটির সভ্য হয়েছেন)—তাঁদের কেউই ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের ধার ধারেন না, তাঁরা পাশ করা নন্। কিন্তু এই পাশ না করতে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। মা বলেন, পোড়া কপাল আমার, ছেলে পাশ হলো না। আবার সময় সময় ছেলে আত্মহত্যা ক'রে বসে। আমি বলি—তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। উৎসাহের সহিত একটা নূতন কিছু আরম্ভ করে দাও। কারণ উকীল ডাক্তার ও কেরাণী এই নিয়ে জাতি টেঁকে না। আমাদের চরম দুর্গতি হয়েছে। এখন আমাদের নানা বিষয়ে, অর্থকর বিষয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিতে হবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার লিখিত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক পুস্তিকায় কয়েকটা কথা লিখেছি ; তোমরা সেটা পড়ে দেখো। আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, বিধাতা যেন বলেন, "বাঙ্গালীর ছেলে, শরীর নষ্ট করবি আর কেরাণীগিরি করবি ; তার বেশী কিছুই নয়।" এ অবস্থায় থাকলে চলবে না, এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ ; এ পথ থেকে ফিরতেই হবে।*

* বক্তৃতাটি 'প্রবাসী' ১৩২৫, আষাঢ় সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এই বক্তৃতা দেন।

পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা

এমার্সন বলেন "গোলাপবাগান কার? —আমার; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ! বাগানের মালিক বেড়া বাঁধান, মালি রাখেন, জলসেচন করান; সে অনেক কাণ্ড। কিন্তু অমল শোভা কার'ও একার নয়।" কারণ গোলাপের সার্থকতা ফুটে, সৌন্দর্য্যের বিকাশ ক'রে। আর সে সৌন্দর্য্য দর্শক মাত্রেই উপভোগ করতে পারেন। কথাটি পাঠাগার সম্বন্ধেও সত্য। পাঠাগারের যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা পয়সার যোগাড় করবেন, জমি কিন্‌বেন, ঘর তুল্‌বেন; তারপর উৎকৃষ্ট পুস্তকরাশি সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের হাতের কাছে এনে দেবেন। সে পুস্তকের অধিকার কা'রও একার নয়। পাঠক মাত্রেই তার সৌন্দর্য্যরস উপভোগ করতে পারবেন। এই গ্রন্থশালা জ্ঞানলিপ্সুদের বড় আদরের জিনিষ।

জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চ'লে গেছে বুঝতে পারি নি। আজ বার্দ্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু ঘন্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত আছে। উপনিষদ্ ও ষড়্‌দর্শনের তত্ত্ব, গ্রীসদেশের সক্রেটীস্, প্লেটো, অরিষ্টট্‌ল্ প্রভৃতি মহানুভবগণের চিন্তারাশি, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের বাণী,—সকলই পুস্তকের মধ্যে। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন তা অমূল্য সামগ্রী। আমরা সকলেই উত্তরাধিকার-সূত্রে তার অধিকারী। যিনি ধনী তিনি স্ত্রীপরিবারকে সুখে রাখেন, তাঁর ব্যক্তিগত রোজগার ছেলে, নাতি, বড় জোর আত্মীয়স্বজনে খায়। তিনি গহনা গড়ান, কোম্পানীর কাগজ করেন, জমিদারী কেনেন, আর পাটা কবুলত লেখেন। তাঁর জিনিস ঘরের বাইরে যায় না। কিন্তু ভাব ও চিন্তাজগতের কথা স্বতন্ত্র। প্রতিভাশালী

ব্যক্তি ভাব-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে রত্ন আহরণ করেন তা'তে সকলের সমান অধিকার। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সকলের সাধারণ সম্পত্তি। তাই গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিকগণ মহামান্য, জগতকে তাঁরা মহাঋণপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে যান।

এদেশে লাইব্রেরীর উন্মেষমাত্র হচ্ছে। আমাদের মুস্কিল এই যে পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া আর কিছু বড় কেউ পড়তে চায় না। তাই বলি, আমাদের কপাল পুড়ে গেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের স্থচনা থেকে ছাত্রগণের একমাত্র চিন্তা হ'য়ে উঠেছে—কি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাধি নেব। তারপর উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরাণী,—এ ছাড়িয়ে যাবার আর যোগ্যতা নেই; কেবল দাসত্ব আর গতানুগতিকে গা ঢালা। স্বাধীন জীবিকা ব'লে যে একটা কথা আছে শিক্ষিতদের সে ধারণা নেই। পোষ্ট অফিসের ছাপের মত তাঁরা ইউনিভার্সিটির ছাপটাকেই সার বুঝেছেন। যা হোক এখন সুবাতাস বয়েছে, সময় এসেছে। তাই ধীরে ধীরে পাঠাগারের আদর বাড়ছে।

আমেরিকার ৪৮টি ষ্টেট্ আছে। প্রত্যেক ষ্টেটে একটি বা কোনটিতে দুটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়, তা ছাড়া আবার প্রাইভেট্ ইউনিভার্সিটিও আছে। জাপানেও তাই,—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। জ্ঞানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে ব'লেই তারা নিজের দেশে দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। বাতাস, জল যেমন বিনা মাশুলে মেলে, ঐ সব দেশে তেমনি সৎ পুস্তকরাশিও দরিদ্রের অনায়াসলভ্য সম্পত্তি হচ্ছে। সকলেই তা বিনা মাশুলে পাচ্ছে, তার জন্যে ব্যয় করতে হচ্ছে না। সেখানে ধনীরা বলেন—দরিদ্রের গৃহে শিক্ষার পথ পরিষ্কারের স্থচনামাত্র এখানে হয়েছে; লাইব্রেরী এই স্থচনার প্রধান লক্ষণ! ঐ সব দেশে জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানপিপাসা এখনও হয় নি। পরীক্ষা-পাশ আমাদের বরাবর সন্ধান ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস (First Class) এম-এ পাশ করেও কেউ রিসার্চের (Research) দিকে ঘেঁসে না। কারণ তাতে বিপুল উদ্যম ও ধৈর্য্য চাই, দিনের পর দিন একটানা খাটুনি চাই। কিন্তু সে উৎসাহ কোথায়? তাই বলি প্রায় কোনো

গভীর চিন্তা-প্রসূত ফল হয় নি এই লেখাপড়ায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়, পৃথিবীর সামনে দাখিল করা যায় এমন কিছু অল্পই আছে।

আপনারা কার্ণেগীর নাম শুনেছেন। তিনি স্কটলণ্ডের লোক। ছেলেবেলায় খবরের কাগজ বিলি করতেন। তারপর নিজের উদ্যমের বলে আমেরিকার পিট্‌স্‌বার্গের পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানার মালিক হয়েছিলেন। ৯০ কোটি টাকা দিয়ে একজন নয়—একদল লোক মিলে তাঁর কারখানা কিন্‌লে। তিনি টাকা নিয়ে স্কট্‌লণ্ডে ফিরে এলেন। তাঁর আয় বছরে ৪ কোটি টাকা হবে, অর্থাৎ সমগ্র বাংলা দেশ থেকে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব হিসাবে যত টাকা পান প্রায় তাই। দেশে ফিরে এসে তিনি গ্লাস্‌গো, ডণ্ডী প্রভৃতি বড় বড় সহরে Workingmen's Institute অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জন্যে বড় বড় বিদ্যামন্দির ও গ্রন্থশালা খুলে দিলেন। সমস্ত দিন কলকারখানায় খেটে সন্ধ্যার পর তারা এইসব গ্রন্থাগারে নানা রকমের বই, খবরের কাগজ প্রভৃতি পাঠ করে। সেখানে তারা চা, কাফি খায়—মদ নয়; ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মদের বিষময় ফল ফলে। শ্রমজীবীদের পাঠাগারের জন্যে কার্নেগী অনেক বড় সহরে সাড়ে সাত লক্ষ করে টাকা দিয়েছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ রকম পাঠাগার স্থাপিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। সে সব দেশে মুটে, মজুর, গাড়োয়ান কাগজ পড়ছে, রাজনীতি আলোচনা ক'র্‌ছে। যারা মাটির নীচে খনিতে কাজ করে তারাও কাগজ পড়ে। চাকরাণী, মেথরাণীও দেশের খবর রাখে। জাপানেও তাই। রবিবাবু বল্লেন—জাপানে তাঁর বাসার দাসী তাঁর গীতাঞ্জলির খবর রাখে। দেখুন এই সব জায়গায় জ্ঞানস্পৃহা কত বলবতী। আর আমাদের দেশের দিকে চেয়ে দেখুন। যে বই কেনে সে পড়ে না, আর যার পড়বার ইচ্ছে আছে তার কেন্‌বার পয়সা জোটে না। তারপর বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয় না—ওজর দেখায় অমুক নিয়ে গেছে। এই রকমে দিন কতক কাটিয়ে দিয়ে শেষে বইখানার অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে দেয়। এই রকম জঘন্য আচরণে লাইব্রেরী উজাড় হ'য়ে গেছে শুনেছি।

বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাঁদনীতে নানা ফ্যাসনের কাপড় কিন্‌বে, নানা রকমের বিলাসে পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়। মান্দ্রাজে দেশীয়

লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান আছে। উদাহরণস্বরূপ—গণেশ কোম্পানী ও নটেশন্ কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে। নটেশন্ মোটর চড়েন। প্রথম দেখে মনে হয়েছিল বই-এর দোকান ক'রে মোটর হাঁকাচ্ছেন অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির অপচয় কর্‌ছেন। কিন্তু তা ত নয়—এর পিছনে মান্দ্রাজীদের জ্ঞানের আদর ও পাঠের তৃষ্ণা বর্ত্তমান। তাই তিনি নিজের রোজগারেই মোটর কিনেছেন। আমাদের বাংলাদেশে Text book, ছাত্রপাঠ্য বই না ছাপালে দোকান উঠে যায়। কিন্তু নটেশন্ Text book বা ছাত্রপাঠ্য বই ছাপান না। তাঁরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা ছাপান ; রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্বিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রভৃতি নানা প্রকারের পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই কাজে ব্যবসায়ী যে শুধু লাভবান্ হন তা নয়, সৎপুস্তক প্রকাশ ক'রে দেশের একটা অভাবও দূর করেন। তাই বলতে হয় সেখানে জ্ঞানতৃষ্ণা বেশি। কলকাতার বড় পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায় "People's Library" প্রভৃতি সংস্করণের অল্প মূল্যের বই মান্দ্রাজীরা বেশী কেনেন, বাঙ্গালী বড় একটা কেনেন না। বাংলা-দেশে 'টেক্সট্ বুক কমিটি'র অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক না হ'লে আর বই উদ্ধারের উপায় নেই। এখানে রসায়ন-সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তকের আদর হয় না। কারণ তার জন্যে "ল্যাবরেটারী" চাই। ছেলেদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীবজন্তু সম্বন্ধে কৌতূহল হ'তে পারে, এই ভেবে একখানা ছোট 'প্রাণীবিজ্ঞান' লিখেছিলাম। কিন্তু বইখানা কয়েক বৎসর পড়ে রইলো, কাট্‌তি হ'লো না। কিছুকাল পরে, জানি না কেন, সেখানা 'টেক্সট্ বুক কমিটি'-র (Text Book Committee) অনুমোদিত হ'য়ে গেল। একজন ইন্স্‌পেক্‌টার পূর্ব্ব বাংলার একটা অঞ্চলের জন্য সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন ; ব্যস, এক নিশ্বাসে সব বই বিক্রী হ'য়ে গেল।

বিজ্ঞান-কলেজের জন্য স্যর্ তারকনাথ ও স্যর্ রাসবিহারী পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। দুটি ল্যাবরেটারীর প্রত্যেকটিতে ২০ জন ছাত্রের জন্য বছরে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু ২৫০০ টাকার উপর ব্যয় হচ্ছে। তবু কি ব্যাপার! প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী কজন পাই? অনেক সময় কাঁদ্‌তে হয়। এখন ক্রমশঃ হাওয়া ফির্‌ছে। তবে কোকিল একবার

ডাক্‌লেই যে বসন্ত সমাগত হয়, এমন ভাব্‌লে চলে না। সে বসন্তের অগ্রদূত মাত্র। লণ্ডন, প্যারী প্রভৃতি স্থানের Chemical Journalএ অর্থাৎ রসায়নসম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকায় প্রত্যেক বারে বর্ণমালা অনুসারে হাজার দু-হাজার রাসায়নিকের নাম থাকে। তার অন্ততঃ ৫০০ জন রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। জার্ম্মানীতে ৫০০০, ইংলণ্ড আমেরিকায় কয়েক হাজার, এবং সমস্ত য়ুরোপে অন্ততঃ ১০,০০০ রাসায়নিক প্রতিদিন মৌলিক গবেষণা করেন। আর আমরা? এই কবির কথায় বিংশতি কোটি— এখন ত্রিশ কোটি মানুষ, আমরা কি কর্‌ছি? আমাদের গর্ব্বের কিছু নেই। আমায় সভাপতি হবার জন্যে টানাটানি করেন; আজ সমাজ সংস্কারের আলোচনা, কাল পাটেল বিল; কিন্তু এক মুর্গী কবার জবাই হয়? ত্রিশ কোটির মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশজন রাসায়নিক (Chemist) হোক, তবে ত নিষ্কৃতি; নইলে বিশ্রাম কোথায়?

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লণ্ডনে পাঠাগারের প্রচলন দেখে অবাক হয়েছিলেন—

"আমি গিয়া দেখিলাম শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া, সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকানঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবসা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেছে! ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যের বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য। এইরূপ একটি পুস্তকালয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, একপার্শ্বে দুইটি আলমারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম পুস্তকগুলি স্বল্প মূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য?

উত্তর—না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

আমি—এ সব পুস্তক কাহারা লয়?

উত্তর—এই পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।

আমি—আমি কি বই লইতে পারি?

উত্তর—হাঁ পারেন, এ ত সাধারণের জন্য।

তারপর আমি একখানি ৬।৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বই ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আর একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ?'

উত্তর—গত ৮।৯ বৎসর।

আমি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না?

উত্তর—কিরূপে?

আমি—লণ্ডনের মত বড় সহরে মানুষ এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় উঠিয়া গেলে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরাইয়া না দিয়া এ পাড়া হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বই কি করিয়া পাইবে?

এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, 'তাহা কি করিয়া হইতে পারে? এ যে আমাদের বই? উঠিয়া যাইবার সময় ফিরাইয়া দিতেই হইবে।'

আমি—মনে কর যদি না দেয়!

তাহারা হাসিয়া কহিল, 'সে হইতেই পারে না।' বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে—ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।"

—"আত্মচরিত," পৃঃ ৩৫৬।

আপনারা হাজারখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী করুন, মাসিক চাঁদা দু আনা। দেখবেন মাসে মাসে অনেক বই ফাঁক হ'য়ে যাবে।

জগতে দেখা যায়, যাঁরা বিদ্যাভ্যাস প্রকৃতই করেছেন, তাঁরা অনেকেই Self-taught অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় শিখেছেন। ডাক্তার জন্‌সনের মত বিদ্বান্ বিরল। তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁর পিতার পুস্তকের দোকান ছিল। তিনি পাঠাগার থেকে কোনো বই নিতেন আর একটি উচ্চস্থানে ব'সে একমনে পড়তেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। নব্য বাংলার অভ্যুদয়ের প্রধান উৎস রাজা রামমোহন রায় রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডিগ্‌বি সাহেবের নিকট ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করেন, আরবী পারসী শিক্ষার অনেক পরে। কিন্তু অল্প দিনে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে ইংরেজী-নবীশরা অবাক্। দেশে কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অনেক টোল ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ক'রে তিনি একখানা চিঠি লেখেন। বিশপ্ হিবার সেই চিঠি তদানীন্তন

গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে দেন। সে চিঠির ইংরেজী রচনা এত উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর সেটি যখন প্রকাশিত হয়,—এশিয়াবাসীর লিখিত ব'লে তার উল্লেখ করে বিশপ্‌ হিবার বলেছিলেন "Real curiosity—অর্থাৎ, বিস্ময়ের বস্তু।" তাই বলি যাঁরা প্রতিভাশালী, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন না—নিজের শিক্ষার ভার তাঁরা নিজের উপরেই রাখেন। যদি বল Dr. Ray. D. Sc., তবে বুঝতে হবে এই যে তাঁর ১৮৮৫ বা ৮৭ সালের ডিগ্রীর কথা হচ্ছে। তারপর ৩৫ বৎসর ধ'রে তিনি রসায়ন বা অন্য কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা করলেন, D. Sc., বললে সেটা ত স্বীকার করা হয় না! সুতরাং ডিগ্রাটা কিছু নয়,—ওটা অনেক সময় অজ্ঞতার আবরণ মাত্র। অনেকে অমুক সালে দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে 'স্বর্ণ পদক পেয়েছি' ব'লে গর্ব্ব করেন; এদিকে হয়ত পরীক্ষার পর পড়া ছেড়েছেন ব'লে হ্যামিল্টন ও রীডের মত ছাড়া নূতন দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ রাখেন না। অনেক ডাক্তারবাবু ১৮৭২ সালের অর্জিত জ্ঞান অনুসারে রোগীর প্রেস্ক্রিপ্‌শন্‌ লেখেন। সে কালের মতের খণ্ডন হয়ে কত নূতন মত প্রচলিত হয়েছে তার খবরই রাখেন না। আলোচনা না করলে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়। কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিকায় লোকে এত ডিগ্রী চায় না। তারা চায় প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের দেশে একে ত লাইব্রেরীর অভাব, তারপর লাইব্রেরী যেখানে আছে সেখানে পাঠকের অভাব। সাময়িক পত্রে এখন চুটকি গল্পই বেশী। এতে পাঠকের রুচি বিকৃত হ'য়ে যায়। তাঁরা আর কঠিন ভাবপূর্ণ বিষয় পড়তে পারেন না, ঐ চানাচুর, সাড়ে আঠার ভাজাতেই মস্‌গুল্‌ হ'য়ে থাকেন। কিন্তু চাই ভাল জিনিস। উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন ক'রতে লোকের যাতে প্রবৃত্তি ও রুচি জন্মে—তারই বন্দোবস্ত করবার জন্যে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। লাইব্রেরীর যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, এই কার্য্যের ভার তাঁদেরই উপর বিশেষভাবে ন্যস্ত রয়েছে। আমার ধারণা পাঠাগারে নভেল যত কম থাকে ততই ভাল। উপন্যাস পাঠের সার্থকতা আছে, এ কথা আমি কখনও অস্বীকার করি না। স্কট্‌, ডিকেন্স্‌, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকগণের উপন্যাসে অনেক

বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের মধ্যে ভাবুকতা ও রসগ্রাহিতার অত্যন্ত অভাব। তাঁরা উপন্যাস পাঠে গল্পাংশের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। আর সেই কারণেই গভীর ভাবাত্মক কোন বিষয় তাঁদের ভাল লাগে না। লাইব্রেরীতে নানা বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকা চাই; যেমন মহাপুরুষগণের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ভূগোল, ইতিহাস, ভাবুক লেখকগণের সমাজ, শিক্ষা, নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তক। আর থাকা চাই সারগর্ভ প্রবন্ধে পূর্ণ সাময়িক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আজকালকার সাময়িক পত্রিকাগুলি নিতান্ত মামুলি ধরণের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বা অক্ষয়কুমারের "তত্ত্ববোধিনী" অথবা বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনের" মত সাময়িক পত্রিকা আর ত দেখি না। নূতনের মধ্যে এই মাসের "প্রবাসী"তে "মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব" নামক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা থেকে লোকে aeroplane বা উড়োজাহাজের ও arctic exploration বা মেরু-সন্ধানের খবরও পায়। আর দুঃখ এই, আমাদের বিদ্যালয়েও কেউ ভাল ক'রে এর খোঁজ নেয় না।

"ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ," কথাটা আমি প্রায়ই ব'লে থাকি। আমার দাঁত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে কথাটা আমি বুঝতে পারি শুধু খাবার সময়, উৎসাহের সময় কখনও নয়। যুবকেরা আমার সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না। আমি ৯টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ল্যাবরেটরীতে খাটি। আমি তাদের সমকক্ষ, জুড়িদার। কিন্তু মুস্কিল ত এইখানে। যাঁরা অন্বেষণের জন্য ১০০ টাকা বৃত্তি পাচ্ছেন—এদেশে এক-শ' অর্থাৎ ইংলণ্ডে পাঁচ-শ'—প্রথম বয়সে নবীন উৎসাহে তাঁদের ত আরও বেশী পরিশ্রম করা উচিত। আর যে ছাত্রদের প্রত্যেকের জন্যে সায়ান্স কলেজে বার্ষিক দু'হাজার টাকার বেশী ব্যয় করা হয় তাঁরাই বা কি করেন? বিশেষভাবে বিজ্ঞান অনুশীলন করবার উৎসাহ ও যোগ্যতা অনেকের মধ্যে ত দেখতে পাই না; দুই একটির মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

কিন্তু যাঁরা বিশেষ অনুশীলনে ব্যস্ত, অর্থাৎ যাঁরা বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন, তাঁদের দেখে সময় সময় আমার ভয় হয়। ঘোড়া যেমন চলে, তাঁরা নিজের

বুদ্ধিটাকে ঠিক তেমনি একরোখে চালান, দুনিয়ায় আর কোনো দিকে চেয়ে দেখেন না। চর্ম্মকারের কাছে যেমন Nothing like leather অর্থাৎ দুনিয়ায় চামড়াই সার বস্তু, ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞের নিকট তেমনি তার Special subject, বিশেষ বিষয়টি—Vibration of the violin string, বেহালার তাঁতের অনুরণন বা অন্য কিছু। (সভায় সায়ান্স কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডঃ রমণ উপস্থিত ছিলেন।) আমার এক ছাত্র আছেন; তাঁর খ্যাতি য়ুরোপে পৌঁছেচে। তিনি একজন এই রকম বিশেষজ্ঞ, একজন D. Sc.। একদিন ছাত্র-পরিবেষ্টিত হয়ে ব'সে তাঁকে বল্লাম, "আমার ত বয়স হ'ল। B. C. P. W. অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যাল আমার মেয়ে, আর ছাত্রেরা আমার ছেলে। এখন বুড়া বয়সে দেখছি আমার King Lear, রাজা লীয়ারের দশা হবে। কেউ কর্ডেলিয়া হবেন, কেউ গণেরিল, আবার কেউ বা রেগান।" ছাত্র ত শুনে অবাক্—বল্লেন, 'তারা কে?' দুনিয়ার সব রসে বঞ্চিত হয়ে এ রকম রসায়ন-রসিক হওয়া ত বড় মুস্কিল। আর বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য বড় কম দায়ী নয়। কুক্ষণে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য তালিকা থেকে ভূগোল নির্ব্বাসিত হয়েছে। পরীক্ষার কাজে লাগবে না, সুতরাং আমাদের দুলালরা আর ভুগোল পড়বেন না, কে যেন মাথার দিব্যি দিয়েছে। ম্যাপ (Map) টাঙ্গান রয়েছে; পাশ-করা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বার্লিন কোথায়?' সে ইংলণ্ডের দিকে চেয়ে রইল। আমার একজন সহাধ্যাপক, তিনি M. Sc. তে Figure of the Earth অর্থাৎ পৃথিবীর আকৃতি বিষয়ে গণিতশাস্ত্রমূলক বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ভূগোলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তারা পৃথিবীর আকার নির্দ্ধারণ করতে এসেছে, কিন্তু ভূতলের উপরে কি কি প্রসিদ্ধ দেশ, নগর বা সমুদ্র আছে সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। তারপর কন্‌স্টান্টিনোপল্ দেখাতে বলায় ম্যাপের উপর অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াতে লাগলো। ইংলণ্ডে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে ছেলেরা ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল আগে শেখে; পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, নগর, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতির কথা জানবার জন্যে তাদের আগ্রহ খুব। আমাদের দেশে পালে পালে পাশ হয়, কিন্তু কেউ কোনো খবরই রাখে না।

বিলাতে যারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাদের মধ্যে শতকরা ১০।১৫ জন কলেজে যায়, কিন্তু এখানে শতকরা ৯৯ জন। কলেজে পড়তে না পেলে তারা ভাবে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। আরে পাশ করলেই মাটি! কেবল কতকগুলো অকেজো পুতুল স্থষ্টি! শিবপুর কলেজ থেকে একজন এম. এস্-সি বা বি-এস্ সি 'অনার্স' এর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে, মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা। দেখুন কি ব্যাপার দাঁড়িয়েছে! বড় ষ্টেশনে রেলের মুটে মাসে ৫০৲ টাকা রোজগার করে। যশোর জেলার শ্রমজীবী গ্রীষ্মকালে পোস্তা থেকে আম কিনে 'গোপালভোগ', 'ক্ষীরভোগ' নাম দিয়ে দিনের বেলা বেচে। আর রাত্রে বেচে বরফ। এতে তারা একজন গ্রাজুয়েটের চেয়ে বেশী রোজগার করে। এ বিষয় আর কত বলবো! এখন অর্থাগমের নূতন পথ খুলতে হবে, শুধু পাশ করলে চলবে না। বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রথম যিনি ৭৫৲ টাকা পেতেন, এখন তিনি ১০০০৲ পাচ্ছেন। গত বৎসর কারখানার কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিককে পরিচালকগণ যথেষ্ট টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। 'Knowledge is power', 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'— শুধু মুখে ব'ললে কি চলে? বিদ্যার জোরে ইউরোপ এত ক'রলে; আমরা কি পাশ করা ছাড়া কিছুই করতে পারি না? লেখাপড়া শিখে আমরা কি কেরাণী ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারি না? যদি এমনি ক'রে শিক্ষার অপব্যবহার করতে থাকি তবে আমাদের দুর্গতির শেষ কোথায়? কলকাতার যত লোকসংখ্যা তার প্রায় অর্দ্ধেক অ-বাঙালী (Non-Bengalee)—অর্থাৎ শুধু ইউরোপীয় নয়—মাড়োয়ারী—ভাটিয়া—দিল্লীওয়ালা—হিন্দুস্থানী—ওড়িয়া—চীনে প্রভৃতি লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। ব্যবসা বল—বাণিজ্য বল—যত রকম অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় সমস্তই বিদেশীর হাতে সঁপে দিয়ে আমরা অদৃষ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে হাত পা গুটিয়ে ব'সে আছি—আর শিক্ষিত এই ভান ক'রে উপবাসে ক্লিষ্ট দেহে দিন কাটাচ্ছি।*

* বক্তৃতাটি 'প্রবাসী' ১৩২৬, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতার উপকণ্ঠ কসবা (বালিগঞ্জ) লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন।

সময়ের সদ্ব্যবহার

আজ সন্ধ্যার সময় আপনাদের সুমুখে কিছু বলতে দাঁড়িয়ে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ছে কবি Cowper-এর সেই সর্ব্বজনবিদিত ছোট কবিতাটি—"Time and Tide wait for none." প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "রহস্য-সন্দর্ভ" নামক পত্রিকায় এই সুন্দর সারগর্ভ কবিতাটির একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—

নদী আর কালগতি একই সমান,
অস্থির প্রভাবে করে উভয়ে প্রয়াণ।

* * * *

সর্ব্ব অংশে এক রূপ যদিও উভয়,
চিন্তারত চিত্তে কিন্তু ভেদজ্ঞান হয় ;
বিফলে না বহে নদী—যথা নদীভরা
নানাশস্য শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল সদাত্মক্ষেত্রের শোভাকর,
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

বাস্তবিক উপেক্ষিত হলে কালও মানুষকে ভয়ানক উপেক্ষা করে, তার জীবনকে ঘোর মরুভূমির ব্যর্থতায় ডুবিয়ে দেয়। আমাদের মহিলা-কবিও লিখেছেন—

একে একে একে হায়, দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়,
আর দিন চলে যায়।

মানুষের জীবনে যে-সময় একবার চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। কথাটি অতি প্রাচীন কিন্তু ততোধিক মূল্যবান। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—মানবজাতির প্রতি বিধাতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান কি? আমি তখনই উত্তর দিয়ে থাকি,—মহামূল্য সময়। সময়ের সদ্ব্যয় বা অপব্যয়ের উপরই মানব-জীবনের সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। Lord

Morley তাঁর Study of Literature নামক পুস্তকে সময়ের কিরূপ সদ্ব্যবহার করা যায় সে কথা বলেছেন। ইংলণ্ডে সামান্য কেরাণী ও শ্রমজীবিগণ পর্য্যন্ত সময়ের মূল্য বোঝেন, এক মিনিটও হেলায় নষ্ট করেন না। কিন্তু আমরা কাজ না করার কৈফিয়ৎ দিই—সময়ের অভাব, অথচ গল্প-গুজব আড্ডা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। বাস্তবিকই বড় লজ্জার কথা। যাঁরা কেরাণী, সকালবেলা আহারাদি ক'রেই যাঁদের উদরান্নের জন্য দৌড়াতে হয়, তাঁরাও প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে পাঠ করলে ৩৬৫ দিনে অনেক বই প'ড়ে শেষ করতে পারেন। কিন্তু পড়তে হবে নিয়মিতরূপে, অর্থাৎ প্রতিদিন কর্ত্তব্যবোধে সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রে। ধারাবাহিকরূপে কাজ করা চাই। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে পাথরও ক্ষয় হয়। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত—ধ্যান-ধারণার সমতুল্য। ঠাকুর-ঘরে যখন কেউ উপাসনা-নিরত থাকেন, তখন পাছে ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে চাই না। সেইরূপ কেউ অধ্যয়ন বা চিন্তা-নিরত থাক্‌লে, তাঁকে কোনমতে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। বাধা দিলে কত ক্ষতি হতে পারে আমরা তার ধারণাই করতে পারি না। একটা উদাহরণ দিই—কবি কোলরিজের (Coleridge) Kubla Khan or Vision in a Dream নামক বিখ্যাত কবিতা রচনার কথা। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কবির একটু মরফিয়া সেবন অভ্যাস ছিল। একদিন মরফিয়া সেবন ক'রে আরাম-কেদারায় তিনঘণ্টা যাপনের পর নিদ্রিতাবস্থায় কবির মনন শক্তি ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠল, (মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এ কথা স্বীকার করেন)—তিনি স্বপ্নে "কুবলা খাঁ" কবিতার ৩০০।৪০০ ছত্র রচনা করলেন। নিদ্রার পূর্ব্বে তিনি চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র কুবলা খাঁ সম্বন্ধে কিছু পড়ছিলেন বটে। যাহোক নিদ্রাভঙ্গের পরই কাগজ কলম দোয়াত নিয়ে কবিতাটি লিখতে আরম্ভ করলেন। ৫৪ লাইন লিখেছেন এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে কোন লোক তাঁকে কথাবর্ত্তায় এক ঘণ্টা ব্যস্ত রেখে দিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এই প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কবির চিন্তাধারার সূত্র হারিয়ে গেল, আর তার ফলে সেই অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা মাত্র ৫৪ লাইন লিখিত হ'য়ে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ হ'য়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ

যখন শান্তিনিকেতনে নিভৃত নিবাসে 'গীতাঞ্জলি' রচনা করতেন তখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করলে কি অবস্থা হ'ত! সুদূর য়ুরোপ থেকে দর্শনাকাঙ্ক্ষী এসে তাঁকে কার্ড পাঠিয়ে সাক্ষাৎ ক'রে,—অন্যথা পাছে তাঁর কল্পনার স্বচ্ছন্দগতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এ দেশে এই সব কথা বলবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে। কেহ প্রাতঃকালে আপন ঘরে অধ্যয়ন-নিরত আছেন, এমন সময় কোন শিক্ষিত লোক—সম্ভবত বন্ধু এসে হাজির,—বললেন "মশায় পড়ছেন নাকি?" আর মশায়, বই খুলে বসে পড়ছি না ত পায়খানায় গেছি না কি? চেয়ার টেনে বসে আরম্ভ করলেন—"খবর কি? ছেলেপুলে কেমন? মেয়ে সেয়ানা হচ্ছে, বিবাহের কি করছেন?" ব্যস্, পড়াশুনোর ইতি হয়ে গেল। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হল। বাস্তবিকই আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই—"উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।" ইংরেজ কিন্তু সময়ের মূল্য বোঝেন; তাঁরা বোঝেন "Work while you work, play while you play"—কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা। এর ব্যতিক্রম হ'লেই আমরা কোন কাজে অগ্রসর হতে পারি না। বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমার্সন বলেন—"At times the whole world seems to be in conspiracy to importune you with emphatic trifles. Friend, child, sickness, fear, want, charity, all knock at once at thy closet door and say—Come out unto us." অধ্যয়ন ও মননের সময় পরিচিতগণের প্রত্যেকেই একবার দরজায় ধাক্কা দেবে। তাই আরও বিরক্ত হ'য়ে আর একস্থানে তিনি বলছেন—'O father, O mother, O wife, O brother, O friend, I have lived with you after appearances hitherto. Henceforward I am the truth's. Be it known unto you that henceforward I obey no law less than the eternal law; I will have no covenants but proximities. I shall endeavour to nourish my parents, to support my family, to be the chaste husband of one wife,—but these relations I must fill after a new and unprecedented way.' সবই হ'তে রাজী আছি, কিন্তু দয়া করে আমাকে একা থাকতে

দিন। বাস্তবিক এই মহামনীষিগণ গভীর চিন্তার ফলে যে ভাবরত্ন আহরণ করেন, কাব্যে অথবা প্রবন্ধে গেঁথে দেবার সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাঁদের চিন্তাধারা বিপর্য্যস্ত করে দিলে যে কি সমূহ ক্ষতি হয় সে বোধ অনেক লোকেরই একেবারে নেই।

ইংরেজ দার্শনিক কার্লাইল ছিলেন এমার্সনের বন্ধু। তাঁর জীবন-কাহিনী এক অদ্ভুত ব্যাপার। কার্লাইল দরিদ্র কৃষক-সন্তান। তাঁর পিতা রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। পরে বৃদ্ধবয়সে কিছু অনুর্ব্বর জমি সংগ্রহ করে চাষ করতেন। আর্থিক অবস্থা একেবারে অসচ্ছল। বৃদ্ধ পিতামাতা—৬।৭টি ভাইভগ্নী, অজস্র প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ হ'ত। ছেলেদের মধ্যে কার্লাইল ছিলেন মেধাবী; তাই সকলে মিলে চেষ্টা ক'রে তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। সেখানে কিছু দিন একনিষ্ঠ অধ্যয়নের পর কার্লাইল দেখলেন, এক প্রফেসর লেস্‌লি ছাড়া আর এমন কেউ নেই যার পদতলে বসে তিনি শিক্ষালাভ করতে পারেন। তাই বিরক্ত হ'য়ে কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু এডিনবরা সহর থেকে দূরে গেলেন না। পয়সা অভাবে নিকটে ডামফ্রিসশায়ারে এক ক্ষুদ্র কৃষক-কুটীরে বাস ক'রে সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর নিকট থেকে বই ধার ক'রে অধ্যয়ন-তৃষা মেটাতে লাগলেন। কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদৌড়ি নেই,—শুধু নীরব সাধনার বলে, নিজ চেষ্টায়, সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কার্লাইল অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁর জীবন-চরিত-লেখক বলেছেন—

'Then was, perhaps, no one of his age in Scotland or England who knew so much and had seen so little. He had read enormously—history, poetry, philosophy; the whole range of modern literature—French, German, and English—was more familiar to him, perhaps, than to any man living of his own age.'

জার্ম্মান সাহিত্য ও দর্শনে কার্‌লাইল কি অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তৎপ্রণীত Sartor Resartus পাঠে তার সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চরিত-লেখক Henry Froude বলেছেন—তাঁর মত সাহিত্য-জ্ঞান কদাচিৎ কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। বাংলা দেশে যেমন লোকে বিদ্যার প্রসারের জন্য গ্রাম থেকে কলকাতায় যায়, কার্‌লাইল সেইরূপ প্রতিভার সম্যক্‌ স্ফুরণের জন্য লণ্ডন যাত্রা করলেন। সেখানে এক বন্ধু-পরিবারে অতিথি হ'লেন। কিন্তু দুদিন পরেই বন্ধুকে বললেন "বন্ধু এখানে চলবে না—লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে, বিশেষতঃ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে এত সময়ক্ষেপ ক'রে আমার চলবে না। শীঘ্র একটা বাসা ঠিক ক'রে দাও, আমি বাড়ী ছেড়ে বাঁচি। কি ভয়ঙ্কর! গুডমর্ণিং, কেমন আছেন, খাসা দিনটা আজকের, চা আর একটু ঢাল্‌ব কি? এই সব ভদ্রয়ানার মার-প্যাঁচের জ্বালায় যে দিনরাত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম; এখন এমন জায়গায় নিয়ে চল যেখানে কেউ বিরক্ত ক'রবে না।" এইরূপে চিত্তবিক্ষেপের সকল কারণ হ'তে দূরে থেকে, সময়ের সমুচিত সদ্ব্যবহার ক'রে কার্‌লাইল শুধু ইংরেজী নয়, জার্ম্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান, স্প্যানিস্‌ প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর সম-সাময়িকগণের মধ্যে তাঁর তুল্য প্রগাঢ় পণ্ডিত কেহ ছিলেন বলে আমার জানা নেই।

একজন ইংরেজ যখন পাঠাগারে অবস্থান করে, তখন সেথায় কেউ প্রবেশ করে না। এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত স্বামীর ঘরে দরজায় আঘাত দিয়ে—"আমি আসতে পারি কি?"—অনুমতি নিয়ে তবে ঘরে প্রবেশ করে এবং এক কি দেড় মিনিটে দরকারী কাজ শেষ ক'রে মাপ চে'য়ে পালায়। আর আমাদের অবস্থা কি? সেই ত কথায় আছে—একে—দুয়ে—তিনে হট্টগোল। পামারষ্টোন (Palmerstone) বলেন "Dirt is matter in the wrong place" বাস্তবিক সব জিনিসেরই একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান কাল আছে, যেখান থেকে ভ্রষ্ট হলে তার আর শোভা থাকে না। বৈঠকখানায় বসবার সময় কেউ রান্না ঘরে যায় না; সেইরূপ গল্পেরও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা কি করেন?—"ওহে

ভাই শুনেছ? কাউন্সিলে কে গেল? কে কত ভোট পেলে? কার কত পাওয়া উচিত ছিল?” এইসব আলোচনা ও উত্তেজনায় ব্যস্ সময় কাবার। এক খবরের কাগজেই একটা সকাল কেটে গেল। তা ছাড়া ফুটবল খেলা প্রভৃতির আলোচনা নিয়ে আরও কত সময়ের অপব্যয় হয়, কে তার হিসাব রাখে? খবরের কাগজ প'ড়ো না এ কথা কখনও বলি না। আমি নিজে অনেক খবরের কাগজ পড়ি—আমার মত খবরের কাগজের কীট কমই আছে। কিন্তু কাগজ নিরূপিত সময়ে অবসর মত পাঠ করি। যখন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন করবার সময়, তখন খবরের কাগজ স্পর্শও করি না। সব জিনিসেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, এ তোমরা কখনও ভুলে যেও না।

আত্মচেষ্টায় মানুষ কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারে, তার আর একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে হেন্‌রি টমাস কোলব্রুক। তাঁর সম্বন্ধে দু একটা কথা বলছি। কোলব্রুক হচ্ছেন “Digest of Hindu and Mahommedan Law” নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” হবার ১০ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে কোম্পানীর কেরাণী হ'য়ে তিনি এদেশে আসেন। সে সময়ে বিলাতী সমাজের অবস্থা ও নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দুষ্ট ছিল। মদ, জুয়া ও অন্যপ্রকার দুর্নীতির প্রভাব কোলব্রুক সম্ভবতঃ এড়াতে পারেন নি। তথাপি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে তিনি অশেষ শাস্ত্রবিৎ হ'য়েছিলেন —বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। ম্যাক্সমূলর ব'লেছেন, তিনি যে কেবল ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন তা নয়, তিনি সুদক্ষ ব্যবহারজীবী এবং সুপটু অর্থসচিবও ছিলেন। ইউরোপখণ্ডে সংস্কৃত ভাষানুশীলনের তিনিই প্রবর্ত্তক। ১৮০০ সালে তিনি “Condition of Peasantry in Bengal”—“বাংলাদেশে কৃষকের অবস্থা” নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। বৈশেষিক দর্শন তিনিই প্রথম ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। বরাহমিহির ও আর্য্যভট্ট থেকে হিন্দু পাটীগণিত ও বীজগণিত অনুবাদ ক'রে তিনিই প্রথম ইউরোপকে দেখান যে, গ্রীকদের পূর্ব্বে হিন্দুরা এ সকল বিজ্ঞানের চর্চ্চা করত—হিন্দুরাই অঙ্কশাস্ত্রে দশমিক

প্রথার আবিষ্কারক। হিন্দুদের জ্ঞান প্রথম আরবেরা ও আরবদের নিকট থেকে ইউরোপ শিক্ষা ক'রেছিল। কোলব্রুক আবার জ্যোতির্ব্বিদ্যারও অনুশীলন ক'রেছিলেন। অবসর নিয়ে ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তন করে তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নিজে উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রবন্ধাদি প্রেরণ ক'রে তাকে পুষ্ট ক'রেছিলেন। কণাদের পরমানুবাদ (শঙ্করের অনুবর্ত্তী মায়াবাদীরা আবার ঠাট্টা ক'রে বলেন কণাদ বা কণভুক্—জগতের অস্তিত্বই নেই, তার আবার পরমাণু!) তিনিই অনুবাদ ক'রে ইউরোপে প্রচার করেন। সেই অনুবাদের প্রথম অধ্যায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার "History of Hindu Chemistry" নামক পুস্তকে অবিকল উদ্ধৃত করে দিয়েছি। জীবনের সব কয়টি দিনের সদ্ব্যবহার না করলে কোলব্রুক একাধারে এত গুণের গুণী হ'তে পারতেন না। Elphinstone, James, Princep, Horace, Hayman, Wilsor প্রভৃতি বড় শাসনকর্ত্তা বা এক এক ডিপার্টমেন্টের কর্ত্তা ছিলেন—পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এঁদেরও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকালকার সিভিলিয়ানরা?—এঁদের "ডেস্ক ওয়ার্কের" থোড়-বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়ি থোড় করতেই কর্ম্মশেষ! পঞ্চায়েত থেকে চৌকিদার, ততঃ দারোগা, তারপর ডেপুটি, তদূর্দ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট, এই চক্রের মধ্যেই এঁরা পাক খাচ্ছেন। কাজেই কোন অনুসন্ধানের ফলও তদনুরূপ হচ্ছে। যেমন খুলনার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিলেন—গাছে ফল প্রচুর, দুধ চাইলেই মেলে, আর মাছ ধ'রে খেলেই হ'ল। লোকে তোফা সুখে আছে—দুর্ভিক্ষ কোথায়? এঁরা হচ্ছেন লেফাফা-দুরস্ত, অন্য কিছুরই ধার ধারেন না। Elphinstone সাহেবের নাম আপনারা শুনেছেন। তিনিই বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এদিকে ঐতিহাসিক গবেষণাও যথেষ্ট করেছেন। তাঁর প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও এম-এ পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক। Malcolm সাহেব পারস্য দেশে ইংলণ্ডের রাজদূত ছিলেন। সেই সুযোগে পারস্য দেশ সম্বন্ধে নানা তথ্য অনুসন্ধান ক'রে তিনি সেই দেশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করলেন, যা ঐ দেশ সম্বন্ধে আজও নির্ভর-যোগ্য আদর্শ মৌলিক পুস্তক। এঁদের জীবনের কৃতিত্ব ও সফলতার

পশ্চাতে রয়েছে সময়ের মূল্য-জ্ঞান ও সদ্ব্যবহার, এ কথা কেহ ভুলে যেন না যাই।

এখন কেউ অভিযোগ ক'রে বলতে পারেন—"ইংরেজ ইংরেজ ; বাঙ্গালী বাঙ্গালী। ইংরেজ যা ক'রেছে, প্রতিকূল ঘটনাচক্রের মধ্যে বাঙ্গালীর দ্বারা তা কি করে সম্ভব হবে?" আচ্ছা বেশ কথা। আমাদের দেশের লোকেরই দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। রাজা রামমোহন রায় ১৮ বৎসর বয়সে বাঁকীপুরে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তা পারসী ভাষায় লিখিত এবং তার মুখবন্ধের ভাষা আরবী। যখন তিনি অসীম সাহসে ভর ক'রে প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর পিতা তাঁকে আপন ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিম্বদন্তী এই যে, রামমোহন তারপর হিমালয় পার হ'য়ে তিব্বত দেশে উপস্থিত হ'য়ে লামাদের নিকট পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান কত গভীর ছিল, তা এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিনিই নব্যভারতে প্রথম বেদান্তের বাণী প্রচার করেন। নবদ্বীপ ভাটপাড়ায় তখন স্মৃতি-শাস্ত্রেরই সম্মান ছিল, বেদ উপনিষদের সেরূপ চর্চ্চা ছিল না। ঈশ, কেন, কঠ, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদ্ তিনি প্রথমে এ দেশে বাঙ্গলা ভাষায় এবং পরে বিলাতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। মাঝ বয়সে রংপুরে ডিগ্‌বী সাহেবের সেরেস্তাদার হ'য়ে তাঁরই কাছে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজী ভাষায় তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য লাভ ক'রেছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডিত্য এখনকার ভারতবাসীর মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। লর্ড আমহার্ষ্টের সংস্কৃত কলেজ স্থাপন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে তিনি তাঁকে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তিনি বলেন দেশে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে ; আমরা এখন চাই রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি। প্রতিবাদপত্র তিনি বিশপ্‌ হিবারের হাতে দেন। হিবার বলেছেন—"এমন ইংরেজী কোন এসিয়াবাসীর নিকট পাইনি।" সুতরাং ইংরেজ পারে, আর দেশের লোকে পারে না—এ কথাই নয়। আসল কথা সর্ব্বপ্রকার সফলতার মূলেই অক্লান্ত চেষ্টা।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেরই

যুগ ছিল। বঙ্কিম যে কি অপরিশোধ্য ঋণে দেশকে আবদ্ধ ক'রে গেছেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি ডেপুটী ছিলেন; কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে আপন কর্ত্তব্যে কখনও অবহেলা করেছেন, এ অভিযোগ কেহ কখনও করে নি। অবসর নিয়ে শেষ জীবনে সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছিলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মজীবনে তাঁর একদিকে ছিল শ্রমসাধ্য রাজকার্য, অন্যদিকে ততোধিক শ্রমসাধ্য সাহিত্যস্থষ্টি। এই দুইএর কোনটির প্রতিই কোন দিন তিনি আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নি। আপত্তি উঠতে পারে—বঙ্কিমের ছিল ঈশ্বরদত্ত শক্তি, যেন ধ্যানে ব'সে লিখতেন। সুতরাং তিনি যা ক'রেছেন সাধারণে তা কি করে করবে? বেশ কথা। আমি তাঁর অনন্যসাধারণ ও অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলছি না; সাধারণের যা অনুকরণীয় তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ শ্রমশীলতা। বই লেখা ছাড়া তাঁকে "বঙ্গদর্শন" সম্পাদন করতে হ'ত। এই সম্পাদন-কার্যের জন্য তাঁকে সাহিত্য চর্চ্চা ও রাজকার্য্যের পরেও সময় করতে হ'ত। কি বিপুল সে চেষ্টা! বঙ্গদর্শন বাংলাদেশে এক নবযুগ আনয়ন করেছিল। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা, সামাজিক সমস্যার বিচার, বিজ্ঞানরহস্যের পরিচয় প্রভৃতি নানা রসসম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে বঙ্গদর্শনের সৌন্দর্যবৃদ্ধি হ'য়েছিল। বাস্তবিক বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর চিত্ত নিত্য নূতন দিকে সাড়া দিয়েছিল। এই পত্রিকা সম্পাদনের জন্য নানা প্রবন্ধ পাঠ ও নির্ব্বাচন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং করতেন। এই জন্য কত দায়িত্ব ছিল এবং কত সময়ই যে তাঁকে ব্যয় করতে হ'ত, তা একবার ভেবে দেখা উচিত। আমাদের তখন ১০।১২ বৎসর বয়স। সাহিত্য-রসবোধ তখনও জন্মায় নি। তবু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতাম—বঙ্গদর্শন আবার কখন বাহির হবে। বিষবৃক্ষের দোবে, চোবে, তেওয়ারী, তাদের বংশদণ্ড, সেই লালচাঁদ সিং নাচে তিড়িং মিড়িং, ডাক্তরুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম, এই সব তখন বেশ লাগতো। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ পুস্তক; তাদের স্থান সর্ব্বোচ্চ। তখন থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভার পূর্ণ উন্মেষ হ'য়েছিল। যাঁরা অসংখ্য কাজের মধ্যে গুরু পরিশ্রম ক'রে জাতি-গঠনের মালমশলা যুগিয়ে গেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখেও কি আমরা আমাদের শ্রমবিমুখতার

কৈফিয়ৎস্বরূপ বলতে থাকব—"আর মশাই পারিনে, অফিসের কাজ, কখন সময় পাই।"

আচ্ছা, রমেশ দত্ত মহাশয়ের কথা ধরা যাক। তিনি সুরেনবাবু ও বিহারী গুপ্তের সঙ্গে সিভিলিয়ান হ'য়ে বিলাত থেকে দেশে ফিরলেন। তারপর বঙ্কিমের পরামর্শে তাঁরই পদানুসরণে কত বাঙ্গালা উপন্যাস লিখলেন। বঙ্কিম ও রমেশ, রবিবাবু বা শরৎবাবু ঔপন্যাসিক হিসাবে কে বড় আমি তার হিসাব করব না, সে সাধ্য আমার নেই। আমার কথা এই—তখন বঙ্কিমের পরই রমেশ। রমেশচন্দ্র সাহিত্যসেবী, কিন্তু শাসনকর্ত্তা হিসাবে তাঁর প্রতিভা কারও চেয়ে কোনদিকে কম ছিল না। কিন্তু রাজকার্য্যে তিনি কমিশনর পর্য্যন্ত হ'য়েই খতম হ'লেন। রাজকার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তিনি উপন্যাস লিখেছেন, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনামূলক সন্দর্ভ রচনা ক'রেছিলেন, নানা গবেষণা ক'রে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে বেদের বঙ্গানুবাদ ক'রেছিলেন। আশ্চর্য্য শ্রমশীলতা! ফার্লো (লম্বা ছুটি) নিয়ে বিলাত গিয়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১৩ খৃঃ হ'তে ১৮৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত বাণিজ্যের সনদ (charter) সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের খাতাপত্র পার্লামেন্টের দপ্তর থেকে অনুসন্ধান ক'রে, পাঠ ক'রে, আলোচনা ক'রে তিনি Economic History of India এবং India Under Victorian Age নামক অপূর্ব্ব ও অমূল্য গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেছিলেন। বৈদেশিক রাজশক্তি ও বণিকের চক্রান্তে ভারতের শিল্পবাণিজ্য কি প্রকারে ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ভারতবাসী দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়, অধঃপতনের সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাস রমেশচন্দ্রের এই সকল পুস্তক পাঠ করলে জানতে পারা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরে কমিশনরের কার্য্য ক'রেও তিনি কত সাহিত্য, কত ইতিহাস রচনা ক'রে গেছেন, তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়। এঁদের দৃষ্টান্ত শ্রমবিমুখকে প্রতিনিয়ত লজ্জা দিক!

অতএব দেখা গেল আমাদের দেশের লোক পারে না, এ কথা একেবারেই খাটে না। মহামূল্য সময় একবার গেলে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই যে হাজার হাজার B. A. ও M. A. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বাহির হচ্ছেন, এতে আমরা বাস্তবিকই কি উন্নতির পথে বেশী অগ্রসর হচ্ছি? তা

যদি হয়, তবে ডিগ্রীধারীদের বুদ্ধির বন্ধ্যাদশা ঘুচে যাচ্ছে না কেন? আমি ত আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল দেশের ছেলেদের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছি। শ্রীমানেরা আমার ত নাতি, আর মা লক্ষীরা সব দিদিমণি। বল ত সব বুকে হাত দিয়ে, কি ক'রে সময় কাটে? কলেজ ক্লাসে ত ছুটির অন্ত নেই, M. A. M. Sc. ক্লাস বৎসরে পাঁচ মাস হয়, বাকি সাত মাস ছুটি। এই যে মহামূল্য সময়, এর যথার্থ সদ্ব্যবহার করলে দেশের ছাত্রেরা আজ জীবনের নানাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারতো। ভবানীপুরে একজন সম্ভ্রান্ত নামজাদা ভদ্রলোক বড় দুঃখেই বলেছিলেন, ফুটবল দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ১৯০৪ সালে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাই, তখন পোর্টসৈদে একজন সঙ্গী জুটে। লোকটি বেশ আমুদে ও রসিক। তিনি বলেছিলেন "আচ্ছা, বল ত, ফুটবল খেলার ধারে লোক জমায়েৎ হয় ত বিশ ত্রিশ হাজার? কিন্তু কসরৎ হয় কয়জনের?" ফুটবল খেলছে ত ২২ জন লোক। আর বত্রিশ হাজারে মিলে মোহনবাগান, ফাউল, গোলকিপার ইত্যাদি চীৎকারে সহর মাথায় ক'রে মাথা খারাপ করবার দরকার কি বাপু! এ যেন পাহাড় থেকে টেলিস্কোপ নিয়ে যুদ্ধ দেখা, আর আরাম-চৌকিতে ব'সে অমুক জেনারলের দোষে এইটি ঘটল ব'লে নিশ্চিন্ত আরামে মন্তব্য প্রকাশ করা। এত বড় মাঠ পড়ে আছে—আকাশের তলে বাতাসের মধ্যে গঙ্গাতীরে প্রকৃতির কোলে গা ঢেলে দাও; তা নয় ব্যর্থ উত্তেজনায় আপনাকে শুধু হাল্কা ক'রে ফেলচ। এত বড় খোলা মাঠ—যেন জনাকীর্ণ সহরের ফুসফুসের মত—এমন অদ্ভুত জিনিষ আর কোন সহরে নেই, তারই মাঝে আনন্দ আহরণ না করলে চলবে কেন? আমি ত গত ১৮ বৎসর নিয়মিতরূপে বেড়াই—কত আনন্দ! তোমরা স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের এ অমূল্য সময় নষ্ট কর কেন?

সকলেই তোমরা কার্লাইল, কোলব্রুক অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র হবে একথা বলিনা। তবু কাজ ত সবারই আছে। সংসারে আপন আপন ক্ষেত্রে সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজের কোথাও অন্ত নেই। আমি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করি। অনেক স্থানে লোকে অনুগ্রহ ক'রে আমার গলায় বুনোফুলের মালা পরিয়ে দেয়। তার গন্ধে গা বমি করে। লক্ষ

টাকার মালিকেরও এমন একটু বাগান নেই যেখানে দুটো গোলাপ, চামেলি ফুল ফুটতে পায়। অথচ আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে ত জমির অভাব নেই। বিলাতে এক কাঠা জমিতে গাছপালা তৈরী ক'রে মানুষ ফুটন্ত ফুলের মধ্যে প্রকৃতির হাসি ফুটিয়ে রাখে। আমি দেখেছি, ৫০।৬০ বৎসর আগেও আমাদের দেশের লোকের এই সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল। এখন যেন সব সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছে। এখনও যে কোন যুবক ইচ্ছা করলে নিজ হাতে কোদাল পেড়ে বাগান ক'রে তার মধ্যে দুটো গোলাপ, যূঁই চামেলি ফুটিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সময় কোথায়? শ্রীমানেরা রাত্রে ৮।১০ ঘণ্টা ঘুম দিয়ে সকাল বেলা উঠে এ পাড়া ও পাড়ায় সমবয়সীদের সঙ্গে পরনিন্দা, পরচর্চ্চার পালা গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে আসেন বেলা বারটায়। আয়িমা দিদিমা রান্নাঘরে গোপালদের জন্যে ব'সে থাকেন—ভাত কড়-কড়; জ্ঞান নেই মেয়েগুলো ম'রে যায়। তারপর আহারাদি ক'রে ঘুম একেবারে তিনটা চারটা পর্য্যন্ত। আর এবেলা ওবেলা কতবার কিস্তিমাৎ ত আছেই; গাছতলায় ব'সে তাস পিটে পিটে তাস তেলা হয়ে যায়। ছিঃ! ছিঃ! নিশ্চেষ্টতার মধ্যে সফলতা কোথায়?

আত্মচেষ্টা ও সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা কি অসাধ্য সাধন করা যায় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এডিনবরায় অবস্থানকালে আমি ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী পাঠ করি। কি অদম্য পুরুষকার! দরিদ্রের সন্তান ফ্রাঙ্কলিন কম্পোজিটারের কাজ করতেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'য়ে শিক্ষা অর্জ্জন করবার উপায় ছিল না, কারণ অর্থাভাব। কিন্তু লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল। তাই কেতাব-ওয়ালার সঙ্গে ভাব করে, ময়লা করব না, পাতা কাটব না, সকাল বেলা ফিরিয়ে দেবো ইত্যাদি প্রকার প্রতিজ্ঞা ক'রে তিনি পুস্তক ধার নিতেন। সকাল বেলা বই ফিরিয়ে দেবার জন্য সময়ে সময়ে সারা রাত্রি অধ্যয়ন ক'রে পুস্তক শেষ করতেন। সঙ্গীরা সকলে মদ খেতো, তিনি খেতেন না; রুটী ও জল ছিল তাঁর আহার; তাই ঠাট্টা ক'রে সকলে তাঁকে জলচর জীব বল্‌ত। ইংরেজী সাহিত্য অধিগত করবার জন্য তাঁর অজস্র চেষ্টা ছিল। Addison's Essay পাঠ ক'রে তিনি নিজ ভাষায় তার ভাবার্থ লিখতেন,

তার পর মূল প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আপন ভ্রম সংশোধন করতেন। সেই ১৭৫০ সালের কথা, ফ্রাঙ্কলিনের বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল। তখন আজকালকার মত কথায় কথায় ল্যাবরেটরীর সুবিধা ত ছিলই না, কোন নূতন তথ্য জানবার আবশ্যক হ'লে ইংলণ্ড থেকে পুস্তক আনিয়ে পাঠ করতে হ'ত। তাঁর অপূর্ব প্রতিভা ঘুড়ি উড়াবার কালে ভিজা সূতার সহযোগে বিদ্যুতের স্পর্শ পেয়ে বিদ্যুৎ-পরিচালক-দণ্ড (Lightning Conductor) আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। এই দণ্ড এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ফ্রাঙ্কলিনের সময়েই ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বিবাদ বাধে এবং আমেরিকার স্বাধীনতামূলক No taxation without representation আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে আমেরিকার পক্ষে একদিকে প্রাতঃস্মরণীয় জর্জ্জ ওয়াশিংটন সেনাদলের অধিনায়ক, অন্য দিকে শক্তিমান ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডে আমেরিকার রাজদূত ছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডের বার্ক, চেদাম প্রভৃতি বড় বড় রাজনীতিবিদ্‌গণের সঙ্গে দেখা শোনা ক'রে একটা আপোষে মিট্‌মাট্ করবার অনেক চেষ্টা ক'রেছিলেন। এ দিকে আবার খুব বড় বৈজ্ঞানিক ব'লে চতুর্দ্দিকে খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান-সমিতি Royal Society হ'তে সম্মান ও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল বড় বড় পুস্তকে ফ্রাঙ্কলিনের কৃতিত্বের কথা নেই, তা অসম্পূর্ণ। আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাসে ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই অসাধারণ কৃতী পুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সময়ের সদ্ব্যবহার। প্রতিদিনের কার্য্য সম্পাদনের জন্য ফ্রাঙ্কলিন যেরূপ সময়ের বিভাগ (Routine) ক'রেছিলেন, তাঁর অনুসরণ করলে সকলেই উপকৃত হ'তে পারে। রুটিনের মধ্যে সকল জিনিষই ছিল—প্রাতরুত্থান, আত্ম-চিন্তা, আত্ম-জিজ্ঞাসা, সৎপ্রতিজ্ঞা, অধ্যয়ন, কার্য্যের হিসাব, ব্যায়াম, ক্রীড়া, সঙ্গীত, কথাবার্ত্তা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি। অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত এই আত্মশাসন-পদ্ধতি পালন ক'রে ফ্রাঙ্কলিন এত বড় হ'তে পেরেছিলেন।

বাস্তবিক সময় ঠিক ক'রে অগ্রসর হতে পারলে এমন কিছুই নেই যা মানুষ পারে না। আমাদের দেশের বড়লোকেরা সাধারণতঃ এমন পাত্র-মিত্র-

কোটাল-পরিবৃত হ'য়ে থাকেন যে পাঁচ দিনেও একবার তাঁদের দেখা মেলে না। দুই বৎসর আগে লালা লাজপত্ রায়ের সভাপতিত্বে যখন কলকাতায় হিন্দুসভার অধিবেশন হয়, তখন মাড়োয়ারী বন্ধুগণ এসে আমাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হ'বার জন্য অনুরোধ করেন ; কারণ বাঙ্গালাদেশে অন্য প্রদেশের লোক ঐ পদ গ্রহণ করলে ভাল দেখায় না। সভার কার্য্য-ব্যপদেশে কোন জমিদার-বাটী গিয়ে শুনলুম জমিদার বাবু বেলা ১২টার সময় শয্যা ত্যাগ করেন। স্বদেশী কাজে কেউ এসে অনুরোধ করে বল্লেন, অমুক জমিদার-বাটী চলুন, তাঁর সাহায্য পেলে কার্য্যোদ্ধার হবে। অমনি মোটর চড়ে তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখলুম—শান্ত্রীর পাহারা। নিজের নাম ক'রে বাবুকে সেলাম দেবার কথা বলতে শান্ত্রী বলে উঠ্‌ল, বাবু বেলা ১১৷৷০ টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করবেন না। কি বাদসাহী আলস্য! আমি ত এই বয়সেও ভোর ৫টা বা তৎপূর্ব্বে গাত্রোত্থান ক'রে থাকি ; চিরকাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ ক'রে এসেছি ; সূর্য্যোদয়ের পরও বিছানায় পড়ে থাকা আমার ধাতে সয় না। যাক্‌, আমাদের দেশের ধনীদের ত এই ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজ লাট বা গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য চিঠি লিখে অনুরোধ করলে, তিনি যদি দেখা করা উচিত বিবেচনা করেন, তবে সময় স্থির করে সংবাদ পাঠিয়ে দেন। তারপর ৫।৭।১০।২০ জন সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেও নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পর পর সকলের সঙ্গেই দেখা করেন। তাঁদের সব কাজের সময় বাঁধা। এ বিষয়ে তাঁরা আর আমরা,—তুলনা কর। কোন কাজের জন্য ইংরেজের কাছে যাও ; সে ৫।৭ মিনিট চিন্তা ক'রে হাঁ বা না একটা জবাব দেবে। কিন্তু দেশের লোকের নিকট যাও ; প্রথমতঃ ৫।৭ বারের চেষ্টায় দেখা মিলবে। তারপর তোমার প্রস্তাবে মনে মনে অসম্মত হলেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুখের উপর 'না' বল্‌তে পারবে না। তারপর হয়ত আশা দিয়ে একমাস হাঁটিয়ে ঘুরিয়ে তোমায় হায়রান ক'রে, হার মানিয়ে ছেড়ে দেবে।

আমরা ত সময়ের মূল্য বুঝি না। তাই ওরা আমরা এত তফাৎ। ওরা দিনের বেলায় ভূতের মতো খাটে। কিন্তু অপরাহ্ণ ৫৷৷ টায় ওদের ব্যবসায় অফিস সব বন্ধ। তখন কেউ মোটর চ'ড়ে হাওয়া খায়, কেউ বা ক্রিকেট,

টেনিস খেলে। কিন্তু আমাদের বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা,—যত জায়গায় যত দোকান আছে সব রাত্রি ৯৷৷-১০ পর্য্যন্ত খোলা। এক একখানি ছোট ছোট ঘরে দোকান, ৫ মিনিট তার মধ্যে থাকলে বদ্ধ হাওয়ায় মাথা ধ'রে ওঠে। আমরা সকলে একমত হ'য়ে দোকান-বন্ধের একটা সময় ঠিক ক'রে নিতে পারি না—সকলেরই ভয় আছে, পাছে খদ্দের ভাগে। এমনি ক'রেই আমরা শরীর মাটি করি। ইংরেজ কিন্তু ব্যবসাও জানে, স্বাস্থ্যও বুঝে। কিন্তু আমাদের একি সর্ব্বনাশ! আমরা সর্ব্বদা ব্যস্ত, আবার সর্ব্বদা অলস। কলকাতায় ইংরেজের ৩টা ঔষধের দোকান আছে। রোগীর সকল সময়েই ঔষধের দরকার হ'তে পারে। তাই ছুটি নিতে হলে, অমুক রবিবার অমুকের দোকান খোলা, এইভাবে পালা ক'রে ওরা কাজের ব্যবস্থা ক'রে নেয়। আমাদের পাশে পাশে সারি সারি দোকান। কিন্তু আমরা সকলে একমত হ'য়ে সকলের পক্ষে সুবিধাকর এমন কোন বন্দোবস্ত করতে পারি না। সময় স্বাস্থ্য দুই-এরই অপচয় ঘটে, তবু আমরা একটা আইন-কানুনের মধ্যে আসতে পারি না।

এইবার নিজ সম্বন্ধে ২।১ কথা বলি। বয়স ত প্রায় তিন কুড়ি দশ হ'ল; সময় এগিয়ে আসছে। আমি চিররুগ্ন, আলবার্ট স্কুলে তখন কেশব সেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনতাম। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন স্কুলের কর্ত্তা। তিনি ইংরেজী পড়াতেন; তাঁর মত ইংরেজী ভাষার শিক্ষক আজও দুর্লভ। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষার বই কিনে পড়তাম। বঙ্গদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত। সম্প্রতি গত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে আমি নানা কার্য্যোপলক্ষ্যে প্রায় ৯০,০০০ মাইল ভ্রমণ করেছি। ছাত্র-জীবনেই ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। রাসায়নিক হ'লেও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস চর্চ্চা করবার সময় পাই। মহীশূরের দেওয়ান সেদিন অভিযোগ ক'রে বলছিলেন আমি নাকি বিজ্ঞান ত্যাগ ক'রে খদ্দর ও অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-প্রচারকার্য্য আরম্ভ ক'রেছি। বিজ্ঞান ত্যাগ করব কেন? বার মাসে বৎসর। প্রতি মাসে ২।৪ দিন খদ্দর প্রচার করলেই সব ত্যাগ হ'য়ে গেল? সায়ান্স কলেজে স্যর্ রাসবিহারী ২১ লক্ষ, স্যর্ তারকনাথ ১৫ লক্ষ টাকা

দিয়ে আমাদের হাতে কলেজ সঁপে দিয়ে গেছেন। আমরা হচ্ছি কলেজের ট্রাষ্টি। আমি কি দেশদ্রোহী যে, অবহেলায় তাঁদের গচ্ছিত ধনের অপব্যবহার করব? গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি দার্জিলিং যাই না,—পূজাবকাশে কোথাও নড়ি না। এখন রেলওয়ের যুগ। দেশের দূরপ্রান্তেও ২।৩ দিন অবস্থান ক'রে সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসা যায়। সাধারণে বলেন, একে রুগ্ন শরীর, তার উপর এত পরিশ্রম কি ক'রে করি। প্রকৃত কথা এই যে, সময় বেঁধে কাজ করলে অনেকেই অনেক কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে।

"চা-পান না বিষপান?" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে আমি ৪৫ বৎসরের চা-পান অভ্যাস একদিনে ছেড়েছি। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে কোন বিষয়ে অভিনিবেশ-শক্তি সওয়া ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার অধিক কেন্দ্রীভূত রাখা যায় না। উদরপূর্ত্তি ব্যাপারে যেমন চাট্‌নী অনেক সাহায্যকর, আত্মোন্নতি ব্যাপারে সেইরূপ ছোটখাট নানা কাজের চাট্‌নী অনেক সাহায্য করে। তফাৎ এই—উদরপূর্ত্তিতে চাট্‌নীর সাহায্যে কতকগুলো অতিভোজন করা অনুচিত, আত্মোন্নতি-সাধনে চাট্‌নী খুবই দরকার। কোন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন করতে করতে ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। আর ভাল লাগছে না? আচ্ছা চাট্‌নী চালাও,—অর্থাৎ রুচিমত জমি কোপাও, বাগান কর কিংবা গান গাও, খবরের কাগজ পড়, চরকায় সূতা কাট।—এইরূপে বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্লান্তি অপনোদন করে, তারপর আবার সেই গভীর বিষয়ের চর্চ্চা আরম্ভ কর। তা নয়, সমস্ত দিন তাস পাশা আড্ডায় কাটিয়ে মেস-ঘরে রাত্রি জেগে বই প'ড়ে নিজের তথা ঘরের আর ৩।৪ জনের ক্ষতি করা! কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের কথা! ছাত্রদের সম্বন্ধে আমাকে ঠকান যায় না। আমি ছাত্রদের জহুরী বা কামার, যাই বল। আমার কাছে ফাঁকি দেওয়া চলে না। শ্রীমান্‌দের দৌড় আমি সবই জানি। জাপানের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়েছে ১৮৭০ খৃঃ হ'তে। আমাদের দেশে নবযুগের সূত্রপাত আর এক শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের সময়ে। আজ জাপান উন্নতির উচ্চ শিখরে,—আর আমরা কোথায়? চীনদেশে—৪৫ কোটী লোক, আমরা ৩২ কোটী। চীনারা গরীব, অন্তর্ব্বিপ্লবে অবসন্ন। ধন্য সুন্ ইয়াট্‌সেন! যাঁর একনিষ্ঠ সাধনার বলে চীনে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। চীনাদের সুবিধা এই যে তাদের

এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম্ম। আমাদের দেশে কিন্তু ভেদের অন্ত নেই ;—হিন্দু মুসলমান, রাঢ়ী বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ,—শাখা, প্রশাখা, উপশাখা। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান এত কম যে এরূপ বিবাহ সংঘটিত হ'লে তা খবরের কাগজে ওঠে। আমাদের ছাত্রেরা ত এম্ এ, এম্ এস্-সি, বি এ, বি এস্-সি পাশ ক'রে শুধু চাকরির উমেদারী করে। চীনদেশে চীনা ছাত্রেরা দেশের জন্য কি করেছে সে সংবাদ কে রাখে। মনস্বী Bertrand Russell এর নাম বোধ হয় সকলেই শুনেছেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সন্ধির দিকে ছিলেন ব'লে, যুদ্ধকালে তাঁকে জেলের মধ্যে আটক রাখে। তাঁর Chinese Problem নামক পুস্তকে চীনের অভ্যুত্থানে চীনা ছাত্রগণের কর্ম্মচেষ্টা বিবৃত হ'য়েছে। ভার্সেলে সন্ধিতে জাপান টোগোর প্রভাবে, কামানের সাহায্যে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে সান্টুং লাভ করলে। কিন্তু সন্ধিতে চীনের স্থান হ'ল না। দুর্ব্বল চীনকে গ্রাহ্য ক'রে কে? এই অপমানের ধাক্কায় চীনের যুবকশক্তি জেগে উঠল। চীনে ছাত্র-আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। আমাদের গোলদীঘি-পলিটিক্‌স্ কম হলেই ভাল। চীনা ছাত্রেরা তাদের অশিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার আলোক দেবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করতে লাগল। জাপানী দ্রব্য বয়কট করলে। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নানা পুস্তক লিখিত হ'ল—প্রচার-কার্য্য অগ্রসর করবার জন্য নানাপ্রকার বক্তৃতার বন্দোবস্ত হ'ল। ছেলেরা নিজেদের খরচের টাকা বাঁচিয়ে শিক্ষা প্রচারের জন্য ভাণ্ডার স্থাপন করল। নিজেরাই নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা দেবার ভার নিলে। এইরূপ ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পিকিং সহরে আজ পঞ্চাশ হাজার ছেলে লেখাপড়া করছে। আর তোমরা কি করছ, কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা? কেউ ত একবার দেশের নানাপ্রকার দুর্দ্দশার কথা স্বপ্নেও ভাবছ না। কেবল ফুটবল, থিয়েটার, সিনেমার মোহে ডুবে রয়েছ। কাজের কথা উঠলেই মাথা চুলকে নাকি সুরে কৈফিয়ৎ কাটতে থাক—সময় পাই না, স্বাস্থ্য খারাপ। আমি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই বয়সেও নিয়মিতরূপে বেড়াই! শুনলে আশ্চর্য্য হবে, আমি আজও কাঠবিড়ালের মত সুপারী গাছে উঠতে পারি—ভগবান আমার দেহটাকে খুব হাল্‌কা

ক'রেই তৈরী করেছেন। আর তোমরা আলস্যের মধ্যে শুধু শুধু আড্ডা দিয়ে যাও। কজন তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পার যে, তোমাদের অশিক্ষিত দেশ-ভাইদের প্রতি আপন কর্ত্তব্য পালন করছ? এত ছুটি, এতগুলো রবিবার; নিজের পাড়ার চামার হ'ক, মেথর হ'ক ১০।১২টা ছেলেকে যদি পড়াও তা হ'লে ত অনেক হয়। পালা ক'রে ৭ দিনে ৭ জন প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা সময় দিতে পার না? চীনের ছাত্রগণ ঠিক বুঝেছে। তারা সময় ক'রে সমস্ত দেশে ১০।১২ লক্ষ বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে; দেশের অজ্ঞতা দূর করবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর হয়েছে। একবার ভেবে দেখ, এই শিক্ষা-বিস্তারের বিপুল চেষ্টা দ্বারা চীনা ছাত্রছাত্রীরা তাদের দেশের নবজাগরণে কি পরিমাণে সাহায্য করছে। ছাত্র-আন্দোলন কি শুধু বক্তৃতা করা? নৈতিক বলই প্রকৃত বল। গবর্ণমেণ্ট কবে ট্যাক্স বসিয়ে সাধারণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করবে, তার জন্যে ব'সে থাকলে চলবে না। আমাদের কি কোনও কর্ত্তব্য নেই? সাত জন মিলে একটা নাইট স্কুল চালাতে পার না? আমরা কি করছি—বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, ছাত্র? সব বসে বসে শুধু আলস্য আর গল্প—"তারপর বুঝলে কি না (অমনি এক টিপ নস্য)—মেয়ের বিয়ে, সাহেবকে বল্‌তে অমনি একখানা একশ' টাকার নোট দিলে—আর এখনকার ব্যাপার দেখ না, কংগ্রেস ক'রেই ত সব চটিয়ে দিয়েছে।" ছিঃ! ছিঃ! পিকিং সহরে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। টাকা কম, মেয়েদের আলাদা বন্দোবস্ত তাই হয় না। দেশহিতকর কার্য্যে চীনা মেয়েদের দানও বড় কম নয়। দেশ সম্বন্ধে আমরা যে সব সংস্কারের কথা আলোচনা করি মাত্র, চীন তা কার্য্যে পরিণত ক'রেছে। কি অটল প্রতিজ্ঞা, কি একান্ত সাধনা! আমরা শুধু গল্প ক'রে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বৃথা নষ্ট করছি। আমার দেড় ঘণ্টা মাত্র পাঠের সময়। হয়ত পাঁচজন এলেন সাক্ষাৎ করতে। সবাই বলেন এক মিনিট সময় হ'লেই চলবে। আরে, আমার যে খেই হারিয়ে যায়। কিন্তু সে কথা বুঝবে কে? অমনি অভিযোগ হ'বে, মশায়, শ্যামবাজার থেকে আসছি। আচ্ছা, আমার সময়ের কি মূল্য নেই? নয়টা থেকে বারটা পর্য্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করছি; অমনি কেউ এলেন, এক

মিনিটের কথার আধ ঘণ্টা গৌরচন্দ্রিকা ফেঁদে বসলেন। আমি সকলেতেই রাজী আছি ; কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আমায় একা থাকতে দিন।

অনেক কাজ প'ড়ে আছে এই হতভাগ্য দেশে। যে যা পার, আরম্ভ ক'রে দাও। সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীও শ্রীরামচন্দ্রকে আপন শক্তিতে সাহায্য ক'রেছিল। এখন আত্মচেষ্টায় অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে ছাত্রগণ নিজের ও দেশের উন্নতিবিধানে তৎপর হও। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতি-অবনতি সময়ের সদ্ব্যবহার অথবা অপব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। আপন শক্তির পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারলে ভগবানের কৃপায় আমাদের হতভাগ্য দেশও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে। *

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন।

সাধনা ও সিদ্ধি

কথারম্ভে মহাত্মা রামমোহন রায়ের পবিত্র নাম গ্রহণ করি—যাঁর সাধনায় বর্ত্তমান ভারতের সকল প্রচেষ্টার সিদ্ধির বীজ উপ্ত হ'য়েছিল, যিনি নব্য ভারতের স্রষ্টিকর্ত্তা, অজ্ঞান-কুসংস্কারাচ্ছন্ন অমানিশায় যিনি জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে জীবনের সকল পথে অগ্রসর হয়েছিলেন; ১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যিনি জীবন-বাঁশীতে জাগরণের সুর তুলে সুপ্ত দেশবাসীকে নূতন পথের পথিক হতে আহ্বান করেছিলেন; ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে যিনি সর্ব্বপ্রথম সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন; আধুনিক বঙ্গভাষার অন্যতম স্রষ্টা প্রাতঃস্মরণীয় সেই রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের সিদ্ধির মূলে ছিল তাঁর আজীবন সাধনা। সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই, এই কথাই আজ আমি বাঙালী যুবককে বড় আশা করে বলতে এসেছি। আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি ঐ একটা পরম সত্য—সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই। আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ করতে হবে—শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একেবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মহামতি গোখলে বলেছেন—What Bengal thinks to-day, the whole of India thinks to-morrow—বাঙালীর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাই সারা ভারত গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মস্তিষ্ক-চালনার ক্ষেত্রে বাঙালা অগ্রণী বলে গণ্য হয়ে এসেছে—বাঙলার কোলে অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, সুলেখক, বৈজ্ঞানিক, দেশ-বিশ্রুত বাগ্মী জন্মগ্রহণ করেছেন—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রে এক এক জন দিক্পাল বাঙলার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী আগুয়ান্ হয়ে চলেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষা করে দেখতে হবে, তার চরিত্রের গলদ কোথায়, অন্তরের কোন বাধাটা তার চলার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

সক্রেটিস বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হয়েছে, তাদের উপদেশ দিয়ে কোন ফল নেই। তাই আমার বক্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে—যাঁরা আমাদের ভবিষ্যতের আশা, আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা এই যে, "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে কথা;—আমি বলি "ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", অপ্রিয় সত্য বলতে হবে—দেশবাসীকে প্রীতি নিবেদন করে খুব স্পষ্টভাবেই তাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে হবে। পত্রাবরণে ভগ্নস্থান লুকিয়ে রাখলে দুর্গ-প্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ঢাকলে অভাব ঘোচে না; অভাবকে সকল সময়েই মোচন করতে হয়;—আর তার জন্যে চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর বক্তৃতায় একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কথাগুলি এই যে, অনেক কষ্ট স্বীকার করে এবং যথেষ্ট ধৈর্য্য সহকারে তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠার হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৭০০ জন সরকারের চাকরি করেছেন, তারও অধিক ইস্কুল মাষ্টার হয়েছেন, আর ৭৬৫ জন ডাক্তার হয়ে বাহির হয়েছেন। এই তালিকা দৃষ্টে এঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অতি সহজেই অনুমেয়। মান্দ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ জীবনের একটানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞান-জগতে নব নব পথের সন্ধানে বের হননি। আর মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে সেই কথাই সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। বাঙলা দেশেও ঐ—একই দশা—কেরানী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকিল। আর সেই গলাধঃকরণ, উদ্গিরণ, পরীক্ষাপাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্ আলেকম্। মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ,—তা মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হ'য়ে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাঁধা ওই চাকরির ঘানিতে আর সবার অন্তরের কথা হচ্ছে—"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।"

আবার এই গ্রাজুয়েট উৎপন্ন করবার শক্তি মান্দ্রাজের চেয়ে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশী। এই ব্যাপারে কলকাতা সবার অগ্রণী—কিন্তু হেসো না, এ সব ঘরের কথা বাইরে না যায়। অসহযোগ, সহযোগ স্বীকার করি না ; এবার ২০,০০০ ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে আর শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন পাশ হবে। কিন্তু একজন উপাধিধারী কি প্রকার কূপমণ্ডুক তা চিন্তা করলে মন বিষাদগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান প্রথানুসারে একজন এম এস্‌সি কিম্বা এম এ-র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাকলেও চলতে পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির নাম শোনেন নি এমন গ্রাজুয়েটও অনেক আছেন। ভূগোল চাই না, ইতিহাস চাই না, দেশের কথা চাই না, পৃথিবীর কথা চাই না—শুধু পাশ করে যাও—ম্যাট্রিক, আই এ, বি এ, ফাষ্ট ক্লাশ, সরেস এম এ। উচ্চ শিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাটসিনীর নাম শুনেছেন—গ্যারিবল্ডীকেও হয়ত মস্ত একটি বীর ব'লে জানেন, কিন্তু কাভুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুলকাতে আরম্ভ করবেন। যদি প্রশ্ন করি, আমেরিকার অন্তর্বিবাদ (Civil War) কেন হল—এ বিপ্লবে কে কে রথী ছিলেন—লিঙ্কলন, জ্যাকসন্ কে, কোন পক্ষ জয়ী হল, বিরোধের ফলাফলে দেশের লাভ লোকসান কি হল ? তাহলেই ফিলসফির ফার্ষ্ট ক্লাশ এম এ একেবারে অবাক হয়ে হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন ;—এ সব আবার কি ? প্রফেসারের কোন নোটে ত এ সব লাল নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কস্মিন কালে পাঠ করি নি।

চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গত বৎসর এই সময়ে আমি দেশে ফিরে আসি। সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড. কেম্ব্রিজ, বারমিংহাম, লীডস্, এডিনবরা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। অনেক স্থলে এক একটা কলেজ এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা বিদ্যানুশীলনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, আর প্রত্যেক বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই বিশেষ বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন। আর পরপর এমন সব বড়লোক ঐ সকল বিদ্যা-মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসছেন, যা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। এঁদের অনেকে একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণার নেশায় ভরপুর হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একের শূন্যস্থান অপরে পূরণ করছেন। আর এই সকল বিষয়ের বৈচিত্র্যই বা কি! একখানা "নেচার"

তুলে নিয়ে চোখ বুজে তার যে-কোন স্থান খুলে ইউরোপে অনুশীলিত কত রকম বিদ্যার কত রকম রোজনাম্‌চা যে দেখতে পাওয়া যায়; সেখানে কত শত অনুসন্ধান-সমিতি; কত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরাতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি মানবের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ত পরিপুষ্ট করছেন। ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত নিয়ত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে যে তার আর শেষ নেই। কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে কত শত প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কত একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধকের ঐকান্তিক চেষ্টা ঐ সব দেশে বিদ্যার্থিগণের তথা জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিকে সদা জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশর, আসিরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবনযাপন করেছিল সেই সকল প্রত্নতত্ত্বের বিচারের ফলে য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ জ্ঞানরাজ্যের এক একটা নূতন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যার নাম হয়েছে—ইজিপ্‌টলজি, আসিরিওলজি ইত্যাদি। লেয়ার্ড, রলিনসন, পেত্রি (Layard, Rawlinson, Petrie) প্রভৃতি এই সকল বিদ্যানুশীলনের পুরোভাগে।

তারপর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখা যাক। জাপানে তোকিও, কোবে, কিয়াতো প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৌষ্ঠবে ও জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বাংশে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেবার বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় দুইশত ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া সবাই কেমন করে ফাঁকি দিয়ে একটি বিলাতী সস্তা ডিগ্রী এনে দেশী ডিগ্রীর উপর টেক্কা দেবেন, সমস্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ করছিলেন। আমাদের দেশের যেসব ছাত্র ম্যাট্রিক বা আই এ, আই এস-সি প্রভৃতি পাশ করে বিলাত চলে যান, দেখতে পাওয়া যায় জ্ঞানান্বেষণ তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের চিন্তা, কি করে শীঘ্র একটা বিলাতী ডিগ্রী নিয়ে এসে দেশবাসীর চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করবার পর ইউরোপ যান এবং সেখানে সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে সেই বিষয়টিই শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে-মাটি বেচে, কেউ বা বড়লোকের

জামাতা হবার লোভে ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ হয়ে বিলাত যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ ঘটে তা বলছি না। এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই। আমাদের ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও মেঘনাদ সাহা বিদেশে একবার জাপানী ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনারা কি লণ্ডনের ডিগ্রী নিতে এসেছেন?" তাঁরা জাতীয় গর্ব্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন, তাঁরা নিজেদের দেশের ডিগ্রীকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করেন না। আমাদের দেশেরও উক্ত শ্রীমান্‌দ্বয় বিলাতী ডিগ্রীর মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব্ব করেন নি। এ পরম গৌরবের কথা! বাস্তবিক ঐ সব জাপানী ছাত্র এসেছেন স্যর জোসেফ টমসন্‌, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিশারদ্‌দের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জ্জন করবার জন্য, ডিগ্রীলাভের জন্য নয়।

কিন্তু আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেই ১৮৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে ক'জন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌলিক ও নূতন, যাতে মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ করে বৃদ্ধি পেয়েছে? কেউই যে কিছু দেন নি এমন কথা বলছি না। ব্যতিক্রম ত আছেই। কিন্তু তাঁদের আজীবন সাধনার ভিতরের কথা কে বুঝবার চেষ্টা করে—কে তাঁদের অহেতুকী জ্ঞানতৃষ্ণার যথার্থ সম্মান করতে পারে? এখানে যে, সব ছাত্রই ডিগ্রী চাচ্ছেন আর চাকরি করছেন। কোন বিষয়ে কৃতিত্ব ত কেউ দেখাতে পারলেন না। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি আপন রোজগারের প্রধান অংশ পুরাতন পারসী পুঁথি ক্রয় করতে ব্যয় করেছেন, পাটনা খোদাবক্স লাইব্রেরীতে বৎসরের পর বৎসর ধরে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাই মোগলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আজ Authority বা প্রামাণ্য পণ্ডিত। তাঁর উপর আর কেউ কথা বলতে পারেন না, এদেশেও নয়, ইউরোপেও নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এই পাণ্ডিত্যের কারণ নয়—এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জীবনের সাধনা।

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরির দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র হ'তে আরম্ভ করে সকলেই আজ চাকরির

উমেদার। হিন্দু কলেজের ছেলেরা যারা মাইকেল-রাজনারায়ণের সমপাঠী— তাঁরা গ্রাজুয়েট হ'লেই প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ডেকে বড় বড় চাকরি দিতেন। এই সময় থেকে মতিগতি যে চাকরির দিকে গেল, সে আর ফিরলো না। বাঙলার ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর সিন্ধুক বোঝাই হ'ল, আর বাঙলার গোপালেরা শান্তশিষ্ট ভাবে ডিগ্রালাভের সাধনা করতে লাগলেন। সাধনা—ডিগ্রী, তাই সিদ্ধি—চাকরি।

এইরূপে আদর্শ খাটো হয়ে গেল। তাই গভীর জ্ঞান-সাধনা দেশে প্রতিষ্ঠিত হল না। ভাসাভাসা জ্ঞানেই বাঙালী যুবক সন্তুষ্ট থাকতে শিখলেন। মল্লিনাথ, বল্লভ, তারাকুমার, সারদারঞ্জন—এই সব টীকার সাহায্যে এক সর্গ ভট্টি বা রঘুবংশ প'ড়েই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হলেন, কেউ বা আধ সর্গ প্যারাডাইস লষ্টের নোট মুখস্থ করে ইংরেজী সাহিত্য দখল করে বসলেন। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে একখানা বাহিরের বই নিয়ে কেউ পড়ে দেখলেন না—যেহেতু সে পাশ করার কাজে লাগে না। এখন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল একপ্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে; ইতিহাসও না পড়লে চলে। বাস্তবিক কি লজ্জা, কি পরিতাপের কথা যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ এম এ, এম এস-সিগণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত। ক্যালেণ্ডারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হারভার্ডকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সারা দু'বছর ফুটবল ক্রীকেট খেলেছে ও দেখেছে বলে আমার এক বন্ধু যখন আপন পুত্রের এম এ পাশ করা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন চতুর পুত্র কয়েকদিনের মধ্যে মেস্ থেকে মেসান্তর ঘুরে নোট জোগাড় করলে এবং পরীক্ষকের মন জুগিয়ে চলে অবহেলে পাশ করে ফেলে বাপকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিলে।

তাই বলি সর্বনাশ হয়েছে এই ভাসা ভাসা জ্ঞানে, আর অতি সস্তা পাশে। ফিস্ক্যাল কমিশনে স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, ঘনশ্যামদাস বিড়লা প্রভৃতি বসবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে এঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারে যাঁদের নাম জলজল করছে সেই (Cobden Medallist) স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বাঙালী যুবক ত ঐ অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের আলোচনায় আহূত হলেন না। স্যর বিঠলদাস ঠাকরসে বড় বড় কলের মালিক—

পরন্তু "গোল্ড মেডালিষ্ট" নন। টাকার ব্যাপারে হাতে কলমে কাজ করেন বলে মহামতি গোখলে বাজেট বক্তৃতা প্রস্তুতের কালে তাঁর পরামর্শ বহুমূল্য জ্ঞানে গ্রহণ করতেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যাঁর মতামত বহুমূল্য বলে বিবেচিত হয় তিনি হচ্ছেন ডিগ্রাহীন সাতকড়ি ঘোষ। চিন্তামণি, কালীনাথ রায় প্রমুখ সংবাদপত্র সম্পাদকগণ অনেকেই ডিগ্রাশূন্য। কিন্তু এঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেসব মূল্যবান কথা লেখেন, বড় বড় ডিগ্রীধারীগণ তা থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করতে পারেন।

আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জাতি বলে গর্ব্ব করে থাকি আর ইউরোপীয়দের জড়বাদী বলে গালি দিই। কিন্তু জড়বাদী ওরাই না আমাদের দেশের স্থানে স্থানে কুষ্ঠালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে! ভারতবর্ষে ৭২টি কুষ্ঠালয় আছে, তন্মধ্যে দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি ছাড়া আর সবই ত ওদের। ফাদার ডামিয়েন তাঁর জীবনই ত কুষ্ঠীর সেবায় তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন। আর্ত্তকে একদিকে কেউ কোলে তুলে নিয়েছে, আবার অপর দিকে কেউ বলছে—ওকে ছুঁয়ো না। বাস্তবিক কি বৈচিত্র্য ওদের জীবনে! জানবার, বুঝবার, পাবার কি দুর্নিবার চেষ্টা। কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করবার জন্যে বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা করছেন, তার আয়োজনই বা কত; কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের কিলিমেন্‌জেরো পর্ব্বতের চিরতুহিনাচ্ছন্ন চূড়ায় কোন চির নূতনকে দেখবার প্রয়াস করছেন। সুউচ্চ গিরিদেশে শ্বাসরোধ হয়ে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে—তবু দৃক্‌পাত নেই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। মেরু সন্নিহিত প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন, ন্যানসেন, শ্যাকল্‌টন প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মানুষের যা সাধ্য তা এরা করবে, আবার মানুষের যা অসাধ্য তাও এরা করবে। কি বিপুল দুর্দ্দান্ত জীবন! উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ইংরেজ হুকার বিচিত্র লতাগুল্মের সন্ধানে সিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে বন্দী হলেন। তাই নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। যুদ্ধ জয়ের পর তিনি মুক্ত হলেন। তাঁর Flora Indica বর্ণিত সংগ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে (Kew Garden) কত যত্নে রক্ষিত হয়েছে।

আবার পশুতত্ত্ববিৎ ইউরোপীয়ান সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে বাস করে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য গরিলা শিমপাঞ্জী প্রভৃতি বনমানুষের অভ্যাস ও আচরণ জানবেন ; তাদের ত ভাষা নেই, তাই সঙ্কেতে তাদের ভাব-বিনিময় লক্ষ্য করবেন। এমনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারেই তাঁরা সত্যের আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় টাইকো ব্রেহী, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেলের সম্পর্ক কত নিবিড়, কত গভীর! এত গভীরতা শোণিত-সম্পর্কে কোথায় পাবে ? গ্যালিলিও, কেপ্‌লার সমসাময়িক ছিলেন। কেপ্‌লারের অভাবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলীর আবিষ্কারের পথ সুগম হত না। কত বিনিদ্র রজনীতে উদার উন্মুক্ত অসীম আকাশের দিকে কি আনন্দে কি আশায় এঁরা চেয়ে থাকতেন! কি অমূল্য রত্ন এঁরা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে দিয়ে গেছেন। এঁদের জ্ঞান-সাধনার মূলে গভীর অভিনিবেশ! একবারে বাহজ্ঞানশূন্য হয়ে এঁরা সাধ্য বস্তুর সন্ধান করেছিলেন, তাই সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। জ্ঞানান্বেষণে নিউটন এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে আপন আহারের কথাই বিস্মৃত হতেন। একদিন নিউটন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভৃত্য আহার্য্য দ্রব্য সম্মুখে রেখে গেল। তাঁর বন্ধু কৌতুক করে সেইগুলি খেয়ে নিয়ে হাড়গুলি ঢাকা দিয়ে রাখলেন। ধ্যানভঙ্গের পর আহার করতে গিয়ে নিউটন দেখলেন হাড়গুলি পড়ে আছে! অতএব পণ্ডিতবর সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর আহার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অত মনে নেই। তাই পাছে কেউ ঠাট্টা করে এই আশঙ্কায় চারিদিক চেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। কি আপনভোলা ভাব? এরূপ তন্ময়ত্বের আরও কয়েকটি নিদর্শন দেখাই। রেনেসাঁস যুগে প্যারিস নগরে হোমারভক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট স্কালিগার আপন ঘরে পাঠে নিমগ্ন ; এদিকে বাহিরে হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেল (Massacre of St. Bertholomew) ; কত প্রোটেষ্টাণ্টকে খুন করা হল, কিন্তু তিনি পাঠে এমনই তন্ময় যে, হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তার পরদিন জানলেন। এথেন্সের সৈন্যদলভুক্ত হয়ে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস একটানা ২৪ ঘণ্টা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেন, তবেই ত দুরূহ তত্ত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। গ্রীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। প্লেতো তাঁর শিষ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ বুদিয়স-এর বিবাহ-

দিনে গির্জায় কনে এসেছেন, অন্যান্য বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বর কোথায়? বরকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বরের পাঠগৃহে গিয়ে দেখা গেল তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন আছেন। যাঁর বিয়ে তার মনে নেই! রোমান্ সৈন্য যখন আর্কিমিডিসকে খুন করতে এসেছে তখন আর্কিমিডিস বললেন—দাঁড়াও একটু, এই বৃত্তটা নষ্ট করে দিও না, এর প্রমাণটা শেষ করি। বর্ব্বর সৈন্য তাঁকে খুন করে জগতের মহৎ সত্য উদ্ঘাটনের পথ তখন রুদ্ধ করে দিয়ে গেল। এমনই করে আপনহারা হ'য়ে সাধনা না করলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে?

এই নিঃস্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ—স্বার্থপর ক্রোড়পতির কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন 'জনহিতায়' ব্যয় হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্য। জ্ঞান-সাধকের সাধনলব্ধ যা কিছু তা পৃথিবীর সকলেরই সম্পত্তি। তাই তাঁরা সকলেরই বড় আপনার জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই আমরা হ'টে গিয়ে পিছনে পড়ে গেছি। সর্ব্বনাশকারী পল্লব-গ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে। ৺প্রতাপ মজুমদার বলতেন "জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙালী অতি বুদ্ধিমান।" কিন্তু সেইজন্যেই বাঙালী আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, অর্থ-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা প্রভৃতি নানা সমস্যায় পড়ে আমরা সব রকমে মাটি হয়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে পড়ে থেকে এক একটি সমস্যার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই।

আর একটা কথা। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে চেষ্টামাত্রেই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে তা কখনই নয়। সুতরাং কাজ আরম্ভ করেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, প্রয়াসসাধ্য সকল কার্য্যেই করার

আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়; মৃগয়ায় যেমন অন্বেষণেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গূঢ় রহস্য যাঁরা উদ্ঘাটন করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ। আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টায় আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জার্ম্মান দার্শনিক লেসিং সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে, যদি ঈশ্বর এসে তাঁকে বলতেন—তুমি সত্য চাও,—না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন—আমি সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাব, কেমন করে পাব, এই সে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে; এই খোঁজের খেলার বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হয়ে থাকতে চাই। এই ত প্রাণবন্তের লক্ষণ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে। আর এই অন্বেষণ বা সাধনা একই কথা।

ধর্ম্মজগতে বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য—এঁদের সিদ্ধিলাভের ইতিবৃত্ত একই। জনকোলাহলের বাহিরে পর্ব্বতে জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা করে এঁরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রথিত হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য "সিদ্ধার্থ"। আমরা অতীতের গর্ব্ব করে থাকি। কিন্তু অতীতের প্রাণের লক্ষণগুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই না;—অতীতের সিদ্ধির উপর আমাদের লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনেই আমরা আতঙ্কে মরে যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শতদল পদ্মের মত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু একটির পর একটি করে এই শতদল ফুটেছে—এর পিছনে আছে একনিষ্ঠ সাধনা। গোখলে ইস্কুল মাষ্টার ছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ছিলেন। পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫৲ টাকা মাহিনায় গোখলে ফার্গুসন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু গোখলে আজ দেশপূজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা করেছিলেন। এই দারিদ্র্যব্রতধারীর বাজেট-বক্তৃতায় ব্যবস্থাপক সভায় লাট কর্জ্জন কাঁপতেন। আর এক প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর কথা বলে আমার কথা শেষ করি;—তিনিও দ্রারিদ্র্যব্রতধারী মহাসাধক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী আজ বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু একদিনেই কি তাঁর নাম সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে? ২১ বৎসর পূর্ব্বে

আলবার্ট হলে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা দেশবাসীর নিকট বিবৃত করতে আমিই প্রথম তাঁকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। গান্ধীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—কেপ কলোনীতে (Cape Colony) ভারতবাসীর অশেষ দুর্দ্দশার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা। তিনি দেশবাসীর হিতের জন্য আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। নেটাল প্রদেশে তিনি তাদের সকলের সঙ্গে তুল্যভাবে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। মাসে পাঁচ ছয় হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, সবার ব্যথাকে বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কতবার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করেছেন। তাই ত তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার করতে পেরেছেন। আজ অন্ততঃ সাতাশ আটাশ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসার নেতা—যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, সেইখানেই মহাত্মা গান্ধী ; তাই আজ তাঁর নামে দলিত জনসঙ্ঘের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—আশায় উৎফুল্ল হয়। এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের পশ্চাতে রয়েছে মহাত্মাজীর আজীবন সাধনা।

রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানো বিধাতার একটি বিশেষ বিধান বলে আমার মনে হয়। আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার করতে হলে বাঙ্গালীর জীবনে আজ চাই সাধনা—তিল তিল করে আত্মদান। বাঙালী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে থাকলে ভারতের নিদারুণ দুর্দ্দশা ঘুচবেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙালীর সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করবে।*

* বক্তৃতাটি 'প্রবাসী' ১৩২৯, বৈশাখ সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে এই বক্তৃতা দেন।

অন্ন-সমস্যা

অন্ন-সমস্যা ১

বাঙলাদেশে কোন শিল্প-প্রদর্শনীর কথা শুনলেই বুকের ভিতর কেঁপে ওঠে। আমাদের শিল্পই নাই, তার আবার প্রদর্শনী! বঙ্গশিল্পের প্রদর্শন আর বাঙলার বিষাদ-কাহিনীর এক অধ্যায় উন্মোচন, একই কথা। একদিন ছিল, যখন বাঙলার সূক্ষ্ম শিল্প সুদূর ভিনিস্ নগরের বাণিজ্য-কেন্দ্রে আদৃত হত। কিন্তু এখন প্রদর্শনীর আসরে নেমে অন্য সভ্য জাতির তুলনায় আমরা কি দেখাব? এ ত বেদ বেদান্ত উপনিষদ নয়, এ যে স্থূল জড় জগতের কথা। প্রদর্শনীতে আমাদের জীবনধারণের উপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যা আমরা আপন হাতে প্রস্তুত করতে পারি, তারই একত্র সমাবেশ করতে হয়। এখানে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে এসে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি জীবনসংগ্রামে ক্রমাগত পরাজিত হয়ে বাঙালী দুর্দ্দশার কোন্ আবর্ত্তে আজ ঘুরপাক খাচ্ছে। বিদেশ থেকে বস্ত্রের আমদানি না হলে আমাদের লজ্জা নিবারণ হয় না। দিয়াশলাই না এলে আমাদের সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে না। ষ্টীম্ এঞ্জিন থেকে সুচ সূতা পর্য্যন্ত সকল রকম জিনিসের জন্য আমরা পর-প্রত্যাশী। উঠতে বসতে খেতে শুতে এমন পরবশ আর কোন জাতি আছে কি না জানি না। যুদ্ধের সময় আমদানি বন্ধ হল; জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে জিনিষপত্র নিয়মিতরূপে না আসায় বিদেশী প্রতিযোগিতা অনেকটা কমে গেল। কিন্তু আমরা এমনই অক্ষম যে সে-সুবিধার কোন ব্যবহারই করতে পারলাম না। অথচ এদিকে রুচি আমাদের বড় সুমার্জ্জিত! অভাবের দিন হলেও দেশী কারখানা থেকে ভাঁড়ে ওষুধ দিলে আমরা তা স্পর্শ করব না, সলিতা পাকিয়ে দেরকোর উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ রেখে পড়তে বসব না। তাই জাপান ফট্‌ফটে চিম্‌নি আর শিশি বোতল জুগিয়ে আমাদের রুচির মান রক্ষা ক'রে লাখ লাখ টাকা নিয়ে গেল। এই মহাসমরে ইউরোপ যখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে জাপান পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ বেশী জিনিষ ভারতবর্ষে পাঠিয়েছে। এই সব কারণে বলি, প্রদর্শনী দেখতে মন উঠে না—আনন্দ হয় না। কিন্তু তবু প্রদর্শনী হওয়া

চাই, কারণ তা হলে জানতে পারব রোগ কি এবং কোথায়, দেহযন্ত্রের কোন্ স্থানে সঞ্চারিত হয়েছে। প্রদর্শনীর আয়োজন করলে এই রোগ কতকটা ধরা পড়বে। তখন ঔষধের ব্যবস্থার কথা ভাববার অবসর হবে।

যুবকবৃন্দ দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল। তাঁদের ভেবে দেখতে বলি—আমরা আজ দাঁড়িয়েছি কোথায়! মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আজ কি অবস্থায়! শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আমাদের সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। কিন্তু দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে সেই মেরুদণ্ড আজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর শোচনীয় পরিণাম যে: কি তা মনে হলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। উপার্জ্জনক্ষম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মাসিক আয় গড়ে ২৫৲ হতে ৩০৲ টাকা। কেউ বলেন ৩০৲ হতে ৩৫৲ টাকা। কিন্তু তাঁর পোষ্য অন্ততপক্ষে পাঁচটি—স্ত্রী পুত্র আছে, কোথাও বিধবা ভগ্নী এবং তাঁর ছেলেপুলে আছে। সুতরাং এই স্বল্প আয়ে তাঁদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। চালের মণ আজ ১০৲ ১২৲ তেলের সের ১৲, আর ঘি ত জোটেই না। আমরা রাসায়নিক। বাজার-চলন ঘির উপাদান যে কি তা আমাদের জানতে বাকি নেই, কিন্তু সে কথা আর নূতন করে বলতে চাই না। আর মাছ, দুধ, বাঙালীর শরীর-পুষ্টির যা প্রধান উপাদান, তা কয়েক বছর পরে দেশে আর পাওয়া যাবে না এমন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ত এই প্রকার দুর্মূল্য। তার সঙ্গে এই অল্প আয়ের মধ্যে আবার জামা কাপড় জুতা লোক-লৌকিকতা এবং ভদ্রআনার আর পাঁচরকম উপকরণ আছে। তার উপর যখন পুত্রের উচ্চ শিক্ষা এবং কন্যার বিবাহের কথা এসে পড়ে তখন বুঝতে পারা যায় আমরা দুর্দ্দশার কোন স্তরে নেমে গেছি। আমাদের পেট ভরে খাওয়া হয় না, বাড়ীতেও না, বাহিরেও না। কলকতা বা মফঃস্বলের কলেজ-মেসে ঘরভাড়া বাদ ন্যূনকল্পে ১৫৲ টাকা খরচ পড়ে, তাতে ডাল ভাত আর একটা তরকারী ছাড়া অন্য কিছুর বন্দোবস্ত হয় না। একজন ছাত্রের মোট খরচ ৩৫।৪০ টাকার কমে হয় না! এইরূপে শাকান্ন আহারের ফলে শরীর নিস্তেজ হয়ে গেলে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, আর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক ব্যাধি বুকের উপর পাথর হয়ে চেপে বসে। সার শঙ্করন্ নায়ার বলেছেন, গত কয়েক মাসে ভারতবর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জা ৬০ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। বাঙলাদেশে প্রতিবর্ষে ১২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কাছে বলি হয়।

এ সকলের মূলে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। ডাঃ বেণ্ট্লি বলেন, ম্যালেরিয়া গরীবের রোগ। অনেকদিন ধরে পুষ্টিকর আহারের অভাবে লোকে বারবার এই রোগে আক্রান্ত হয়। কলকাতায় যক্ষ্মা রোগ বেড়ে চলেছে; শিশু যতগুলি জন্মায় তার এক-তৃতীয়াংশ এক বৎসর বয়স হবার আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত পাঁচ বছরে কলকাতায় বাড়ীভাড়া শতকরা ২০০৲ টাকা বেড়েছে। এদিকে সাধারণ গৃহস্থের আয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। কাজেই এঁদো গলিতে অন্ধকার বাড়ী ভাড়া করে থাকতে হয়; স্যাতসেঁতে মেজে, অষ্টপ্রহর দরজা বন্ধ, পাছে আবরু নষ্ট হয় বা ছেলে গাড়ী চাপা পড়ে। বাতাস রৌদ্র ও আলোক, যা গরীবের প্রতি বিধাতার দান, কলকাতায় ক'জন বাঙালীর ভাগ্যে তা জোটে? এ "যজ্জীবনং তন্মরণম্, যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ" মরণ হলেই বিশ্রাম। শিশুকে চাম্চে করে মেলিন্স্ ফুড্ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এরাই ত ভবিষ্যতে বংশবৃদ্ধি করে। কাজেই জাতটা যে ক্রমে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে তা আর বিচিত্র কি। আমাদের পিতৃপিতামহ ৭০।৮০ বৎসর বেঁচে থাকতেন। এখন আমরা? ইংরেজের আয়ু গড়ে ৪৬ বৎসর। আমাদের মাত্র ২৩। দারিদ্র্য ও মহামারী আমাদের বুকের রক্ত শুষে বার করে নিচ্ছে। এদের তাড়াবে কে?

বিপদ যখন একবার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবন-সংগ্রাম যখন ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে উঠছে, চারিদিকে সমস্যাগুলি যখন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে আসছে, তখন আমরা কি করছি? প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি। আমরা ভাবি না, বুঝবার চেষ্টা করি না। উপায় নির্দ্দেশ হলেও কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হবার উৎসাহ বা সাহস আমাদের থাকে না। আমরা সার বুঝেছি চাকরি করা, আর আমাদের ছেলেদের লক্ষ্য হয়েছে এম এ, এম এস-সি পাশ করা, অথবা উকিল হওয়া। এখন একজন গ্রাজুয়েটের বাজার দর কত? এম এ বা এম এস-সি বড় জোর ১০০৲ পেতে পারেন, বি এ, বি এস-সি ৪০৲ থেকে ৫০৲ টাকা। কিন্তু এর সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে যে একটা পদ খালি হলে তার জন্যে পাঁচশ দরখাস্ত পড়ে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হয় যে, গড়ে গ্রাজুয়েটের বিশেষ কোন সুবিধা পাবার জো নেই। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে A. B. C. D. আরম্ভ করে ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া ও নানা রোগের অত্যাচারে

উৎপীড়িত হতে হতে ভগ্নস্বাস্থ্য বাঙালী যুবক যখন স্কুল কলেজ পার হয়ে ডিগ্রী নিয়ে সংসারের সম্মুখে এসে দাঁড়ান তখন দেখেন পুঁথিগত বিদ্যা জীবন-সংগ্রামে কোথাও তাঁকে বিশেষ কোন সাহায্য করবে না। এ কি ভীষণ সমস্যা। আবার যিনি গ্রাজুয়েট হয়েছেন তিনি ভাবেন আইন পড়তে না গেলে মহা অপরাধ হবে, আর জিজ্ঞাসা করলে বলবেন "পাশটা করে রাখি।" আজকাল জেলার সদরে বা মহকুমায় উকীলরা কি রোজগার করেন, তাঁদের কজন অন্ন পান এবং কজন গাছতলায় কেরোসিনের বাক্সর উপর বসে দিন কাটান এরূপ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তরটা কানে কানে দেবেন—কারণ সেটা সাধারণের বড় প্রীতিকর হবে না। স্যর্ আশুতোষ প্রতিভাশালী পণ্ডিত, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অনেক করেছেন—এ সবই স্বীকার করি। কিন্তু আইন কলেজ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বন্‌ল না। আমায় যদি কেউ একদিনের জন্যও সর্ব্বময় কর্ত্তা (Dictator) করে, তবে 'ল-কলেজ'টাকে আমি আগে ভূমিসাৎ করি ; অন্তত দশ বছরের জন্যে আইন পড়া উঠিয়ে দিই। কারণ তা হলে উপোষী উকীলদের অন্ন হতে পারে। আর ব্যাধির শেষ কি এইখানে ? এ দেশের ছাত্র বি এল পাশ করে ভাবেন এম এল হবেন। যেন বিধাতা তাঁদের সৃষ্টি করেছেন শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে পরীক্ষা পাশ করতে এবং যম-সদনে যেতে।

৬০।৭০ বৎসর আগে কলকাতায় হৌসের বাঙালী মুৎসুদ্দী ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ ললিতমোহন দাস, গোরাচাঁদ দত্ত প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। তাঁরা মাসে আট দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করতেন অর্থাৎ এখনকার প্রায় বিশ হাজার টাকা। কিন্তু আজকাল সে-সব উপন্যাসের কথা হয়ে গেছে! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় প্রথম কারবার করেন বাঙালীর সঙ্গে। বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্য তাঁরা বাঙালীর নিকট কিনতেন। তখন ব্যবসা ছিল বাঙালীর হাতে। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙালীর সাহায্য ব্যতীত ইউরোপীয় সওদাগরগণ তাঁদের কার্যসিদ্ধি করতে পারতেন না। এই জন্যই রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রভৃতি ক্রোড়পতি হয়েছিলেন। কিন্তু এখন ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে বাঙালী হটেছে, বিতাড়িত হয়েছে। বর্তমান কলকাতার জনসংখ্যা যত তার অর্দ্ধেকও বাঙালী নয়,

অথচ কলকাতা বাঙলার প্রধান সহর। এই সহরের যে-সব স্থানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয় সেখানে বাঙালীকে কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়! অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়! এদেশে ইংরেজী শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—সহজে চাকরি জুটবে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাঙালী যে পরিমাণে ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হতে লাগল চাকরির মোহ তার সেই পরিমাণে বেড়ে গেল। তারপর যখন ডেপুটি-কালেক্টরী মুন্সেফী প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হল এবং গবর্মেণ্ট অফিসে অল্পাধিক বেতনের কেরাণীগিরির দ্বার উন্মুক্ত হল, তখন দশ পনেরো বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এক চরম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল, শীঘ্র শীঘ্র পাশ করে এইরূপ একটা পদ লাভ করা। ক্রমে ইংরেজী-নবীশ বঙ্গ যুবকেরা কেরাণী, উকীল, মাষ্টার, ডাক্তার হয়ে উত্তর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, মনে ভাবলে এই নূতন শিক্ষা দীক্ষা ও সাহেবিয়ানার চকচকানি নিয়ে তারা না জানি কোন্ দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েছে! কিন্তু কেউ তখন বুঝলে না যে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এদিকে অবসর বুঝে তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বিশেষতঃ মাড়বার থেকে একদল লোক 'লোটাকম্বল' মাত্র সম্বল করে কলকাতায় এসে আপন পুরুষকারের বলে, অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য হস্তগত করে নিলে। বাঙালীর মুখে তখন ইংরেজী বুলি আর অন্তরে মাড়োয়ারীর প্রতি ঘৃণা,—তারা অসভ্য ছাতুখোর! কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ছাপ এক্ষেত্রে বাঙালীকে রক্ষা করতে পারলে না। বাঙালী হটে গেল; ব্যবসা গেল, বাণিজ্য গেল, হৌস গেল; তারপর চাকরিও আর মেলে না। প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য রইল না—পাশ-করা ছেলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, কিন্তু সে পরিমাণে অজস্র চাকরি সৃষ্টি হল না। তাই বাঙালী এখন দরিদ্র, রোগগ্রস্ত; মধ্যবিত্তের আজ অন্ন-সমস্যা, অস্তিত্ব-সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু মোহ ঘুচেছে কি? বাঙালী যুবকের বুদ্ধি, কল্পনা ও কর্ম্মশক্তি আজ এমনই আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে যে কেরাণীগিরি, মাষ্টারী বা ওকালতি ছাড়া দুনিয়ায় যে অন্যপথ আছে একথা সে ভাবতে পারে না, ভাবতে গেলে অনিশ্চিতের আশঙ্কায় সে

অতিমাত্রায় ভীত হয়ে ওঠে। তাই তারা আজও কলেজে পড়ছে আর পাশই করছে!

শিক্ষা সকলেরই চাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে আপামর সাধারণের মধ্যে যে প্রকার শিক্ষার বিস্তার হয়েছে তার তুলনায় আমরা যে কোথায় পড়ে আছি তার স্থিরতাই হয় না। কিন্তু শিক্ষার অর্থ কি শুধু ডিগ্রী নেওয়া? বিলাতের ম্যাট্রিকুলেশন এ দেশের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার প্রায় কাছাকাছি। সেখানে ম্যাট্রিক পাস করে শতকরা ১০।১৫ জন ছাত্র কলেজে প্রবেশ করে। বাকী যায় কোথা? তারা অবশ্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে না অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় না। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নানারূপ শিক্ষানবিশী আরম্ভ করে এবং হাতে-কলমে কাজ শিখে ভবিষ্যতে প্রায় সকলেই কাজের লোক হয়ে ওঠে। কিন্তু এদেশে ম্যাট্রিক পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পারলে যুবকগণ ভাবেন জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। তারপর আই এ পাশ করলে বি এ পড়তে হবে, আই এস-সি পাশ করলে বি এস-সি; নইলে উপায় নেই। এমার্সন বলেন "University makes a havoc of originality!" দলে দলে ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগে পাশ করানো যেন কল থেকে ১, ২, ৩নং সুরকী বার করা; এখানে ভালো পোড়ের ইট আমা-ঝামার সঙ্গে পেষাই হয়ে গিয়ে সুরকীতে পরিণত হয়। যার স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি যেমনই হোক না কেন সকলকেই যেতে হবে সেই এক গোল গর্ত্তের মধ্য দিয়ে। এতে মানুষের মৌলিকতা বড় নষ্ট হয়ে যায়। কথাগুলি খুব সত্য; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সহজ সত্যগুলি আমরা এত সহজে অস্বীকার করি যে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে এই একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে। দু'চারজন যাঁরা ক্ষণজন্মা তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ধার ধারেন নি; যেমন—কেশব সেন, প্রতাপ মজুমদার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনবিহারী সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ডিগ্রী নিয়ে হাইকোর্টে প্রবেশ করলে গীতাঞ্জলি পাওয়া যেত কি না সন্দেহ! ব্যবসাক্ষেত্রে যে ক'জন বাঙালী কৃতী হয়েছেন স্যর রাজেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তাঁর ডিগ্রী কি? Calendar খুঁজলে

পারেন না। সেটা বড় শুভক্ষণ যে তিনি বি ই হন নি—হ'লে বড় জোর গবর্মেণ্টের অধীনে মোটা মাহিনার একজন ইঞ্জিনিয়র হয়ে থাকতেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ; তাঁর মধ্যে মানুষ হব একটা জিদ ছিল। মূলধনের অভাব বা অন্য কোন প্রকার অভাব তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। এখন একটা Capital-এর (মূলধনের) কান্না শোনা যায়। কিন্তু পাশকরা ছেলের পক্ষে এটা শোভা পায় না; কারণ এম এ তে ফাষ্ট ক্লাস পেয়ে রিসার্চ করেছেন এমন কোন যুবককে দশ হাজার টাকার তোড়া দিলে ছ'মাসে তা খরচ করে তিনি আর দশ হাজার টাকা ধার করে বসবেন। তাই বলছি, ব্যবসাক্ষেত্রে প্রধান জিনিষ হ'ল প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা, কোন অসুবিধাতেই দমে না যাওয়া এবং অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে কোন চলতি কারবারে শিক্ষানবিশী করা। মিষ্টার জে, সি, ব্যানার্জ্জি কলকাতার একজন খুব বড় কণ্ট্রাক্টর। তিনি দুবার ওভারসিয়ারী ফেল করে কলেজ থেকে তাড়িত হবার পর শুধু আত্মচেষ্টায় অতি সামান্য অবস্থা থেকে কত বড় হয়েছেন! এমন যুবক নেই যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে কৃতকার্য্য হতে না পারেন। এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

আমাদের দেশের লোকে শ্রমের মর্য্যাদা (Dignity of Labour) বুঝেন না; একটা ইলিশ মাছ কিনে মুটে খোঁজেন, নইলে সন্ধ্যার পর এদিক ওদিক চেয়ে মাছটা হাতে করে লুকিয়ে বাড়ী আসেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস যখন খোলা হয় তখন আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু আড়ালে ঔষধ তৈরী করে আড়াল থেকে বেচতে পরামর্শ দেন। যা হোক শ্রমের মর্য্যাদা আমাদের এখন স্বীকার করতেই হবে। এখন ব্যবসা চাই, অন্ন-সংস্থানের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত না করলে আর চলবে না, নাস্তি গতিরন্যথা।

ব্যবসা সম্পর্কে বাঙলাদেশে পাটের কথা আগে মনে হয়। পাট জন্মায় শুধু বাঙলায়। সিরাজগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাটের খুব বড় বড় আড়ৎ আছে। কিন্তু আমরা সেদিকে তাকাই না। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য থেকে সেই দেশের লোকে যে সহজে টাকা রোজগার করতে পারে এ

ধারণা আমাদের স্পষ্ট হয় না। আমরা অপদার্থ; ছেলে পাশ হবার পর চাকরির জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে nomination চাই। তাঁকে শত অনুনয় করি, তাঁর পায়ে খাঁটি (তাও আর মিলে না) সরিষার তৈল মর্দ্দন করি। পনেরো টাকার নকল-নবিশীর জন্য সাহেবের বড় বাবু ও তাঁর অফিসের পেয়াদার খোসামুদি করে ছ'মাস কাটাতে আমাদের লজ্জাবোধ হয় না। এদিকে আমাদেরই জমিতে কে এসে দাদন দিয়ে পাটের কারবার একচেটে করে নেয়? সে মাড়োয়ারী, আর্ম্মেনিয়ান, আর ইংরেজ। ইংরেজ সোজা চাষীর বাড়ী যায়, মিষ্টি কথা বলে, তার ছেলেপুলের সঙ্গে খেলে ও তাদের খেলনা দেয় আর স্বকার্য সাধন করে আসে। জমিদাররা কি চেষ্টা করে এত বড় ব্যবসাটা আপন হাতে রাখতে পারেন না? একেবারে কিছু রেলী ব্রাদার্স হওয়া যায় না; কিন্তু আত্মচেষ্টায় আস্তে আস্তে হতে পারা যায় ত বটে। পাটের সময় অনেক নিরক্ষর চাষী বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাট নিয়ে নিকটবর্ত্তী আড়তে জোগান দিয়ে এসে, তিন চার মাসের মধ্যে ১০০০/১২০০ টাকা রোজগার করে নেয়।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দুরবস্থার কথা আর কি বলবো। যাঁরা পূর্ব-বাঙলার খবর রাখেন তাঁরা জানেন সেখানে মাছ কিনতে গেলে জেলেরা বলে—"বাবু সন্ধ্যার পর ঝড়তি পড়তি নিয়ে যাবেন।" দুর্দ্দশার এক শেষ! ঈর্ষার কথা বলছি না, মাড়োয়ারী যদি লোটা ছাতু সম্বলে আপন অমিত শক্তিবলে লক্ষ লক্ষ টাকা আনেন, বাঙলার পাট থেকে রোজগার করে যদি ইংরেজ কলওয়ালা টাকার আণ্ডিলে গড়াগড়ি দেন, তা হলে বাঙলায় জন্মগ্রহণ করে বাঙলার আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে বাঙালী আমরা কিছু করতে পারি না?

আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করি। পদ্মায় অজস্র ইলিশ মাছ জন্মায়; কিন্তু দাদন দিয়ে জেলেদের নিকট থেকে সেই মাছ সংগ্রহ করবার এবং বরফ ঢাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠাবার ভার বিদেশীর হাতে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাসুখ ভোগ করছি আর লাভের টাকা অপরে লুটছে। এইরূপে সকল দিকে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর গুটিয়ে আসছে। টাকা ত পড়ে আছে, কিন্তু আমাদের নেবার শক্তি নেই। কি দারুণ লজ্জা!

বজবজ থেকে আরম্ভ করে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার দুধারে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১টি পাটের কল আছে ; কলের মালিক সবাই ইংরেজ। তাঁরা শতকরা ১০০ থেকে ১৫০ টাকা ডিভিডেণ্ট (dividend) দিচ্ছেন। এক একটা পাটের কলের মূলধন ২৫।৩০ লাখ টাকা হবে। তবেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক পাটের কল ২৫।৩০ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। আমাদের বর্দ্ধমানের মহারাজার আয় অধিকাংশ পত্তনী বিলি হওয়ায় ১২ লক্ষ টাকার বেশী হবে কিনা সন্দেহ। শুনেছি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ২৫।৩০ লাখ টাকা আয় হবে ; অর্থাৎ এক একটি পাটকলের আয় আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদারের আয়ের সঙ্গে সমান। এই কয় বৎসরে সমস্ত পাটের কলে বৎসরে ১০।১২ কোটি টাকা রোজগার করে কলওয়ালারা বিদেশে নিয়ে গেছেন। এ লাভের কারবারে এদেশীদের কোন হাত নেই,—সব বিদেশীর। ভারতবর্ষের লোকেরা পাট-কলের কুলি। পাটকলের আশেপাশে বস্তির মধ্যে তারা কি জঘন্য অবস্থায় দিন কাটায় তা সকলেই জানেন।

কলকাতায় দশ হাজার ভাটিয়া আছেন। তাঁদের সকলেরই কারবার আছে। সবাই অবস্থাপন্ন, তাঁদের মধ্যে কেরাণী নেই। কলকাতায় মাড়োয়ারীর সংখ্যা ৯০,০০০ থেকে ১০০,০০০ মধ্যে। সকলেই সঙ্গতিপন্ন। যাঁর খুব কম আয় তিনি মাসে ১০০ টাকা রোজগার করেন। আর কলকাতার লক্ষপতিরা যে অনেকেই মাড়োয়ারী একথা কারও অবিদিত নেই। ছেলে নকুরী (চাকরি) করবে এরূপ ভাবতে মাড়োয়ারী অপমান বোধ করেন। দিল্লীওয়ালা কলকাতায় অনেক আছেন। মুরগীহাটায় তাঁদের বড় বড় দোকান। আমড়াতলার গলিতে প্রকাণ্ড দ্বিতল, ত্রিতল বাড়ী তাঁরা হাজার দেড় হাজার টাকায় ভাড়া করেছেন। সেখানে বিস্কুট, ওষুধ, দিয়াশলাই প্রভৃতি জিনিস বোঝাই করা আছে। এ সব বিদেশী মালের এঁরা একমাত্র এজেণ্ট। পূর্ব্ব বাঙলা, সুদূর দিল্লী ও রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে এঁরা পাইকারী হিসাবে মাল পাঠান। এঁদের আয় যথেষ্ট। দিল্লী-ওয়ালা মুসলমান ব্যবসা বোঝেন। বাঙালী মুসলমান বোঝেন না। তাঁরা হিন্দুদের চেয়ে এই বিষয়ে নির্জ্জীব ও উপায়হীন।

তারপর আমাদের যৌথ কারবার (Joint Stock Company) নেই

বললেই চলে। এরূপ কারবার এদেশে চলে না; কারণ আমরা পরস্পর বিবাদ করি, হিংসা করি, আপনাদের বিশ্বাস করি না। কাজেই আমাদের অর্থ, শক্তি ও কৌশল সম্মিলিত হবার সুবিধা ও অবকাশ পায় না। যৌথ কারবারে ইংরেজ সফল হয়, আমরা হই না।

ব্যবসা-ক্ষেত্র থেকে এমনি করে সব দিকে হটে গেলে আমাদের অন্ন-সমস্যার মীমাংসা হবে না; অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইংরেজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা—যাঁরা কলকাতায় সকল প্রকারের ব্যবসা একচেটে করেছেন—তাঁদের চরণতলে বসে ব্যবসার প্রথম পাঠ আমাদের শিখতে হবে। তাঁরা যে উপায়ে কৃতী হয়েছেন আমাদেরও সেই উপায় অবলম্বন করতে হবে। আলস্য ও বিলাস ছাড়তে হবে। প্রথম ব্যবসা আরম্ভ করে মাড়োয়ারী কাপড়ের বস্তা পিঠে নিয়ে ফিরি করেন, গাছতলায় বিশ্রাম করেন। তাঁরা রেল গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীতে চড়েন। পাঁচ লক্ষ টাকা না হলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠেন না। কিন্তু আমরা—বাবুরা "দেড়া কেরায়াকা" গাড়ীতে উঠি, এদিকে পেটে অন্ন নাই। ব্যবসাক্ষেত্রে দাঁড়াতে হলে উদ্যম অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায় এঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে—একথা যেন আমাদের শিক্ষাভিমানী পাশকরা ছেলেরা কখনও বিস্মৃত না হন। কারণ সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষানবিশীর একটা মূল্য আছে। ভুঁইফোঁড় বা না পড়ে পণ্ডিত হবার মত ভয়ঙ্কর জিনিষ আর কিছুই নেই। বিশেষতঃ ব্যবসা-ক্ষেত্রে উত্থান পতন অতি ভয়ানক; এরূপ গভীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দেবার আগে একটু শিক্ষার দরকার একথা বুঝিয়ে বলতে হবে না। অনভিজ্ঞ লোকের ব্যবসায়-চেষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই নিষ্ফল হয়ে গেছে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সুতরাং এ শিক্ষানবিশীকে আমাদের যুবকগণ যেন কখনও উপেক্ষার ভাবে না দেখেন।

যুবকগণের প্রতি আমার নিবেদন, ফেল হলে তাঁরা যেন জগৎ অন্ধকার না দেখেন এবং ক্ষোভে ও দুঃখে শেষে আত্মহত্যা করে না বসেন। আর তাঁদের অভিভাবকদের হাত জোড় করে বলছি যে, ছেলে ফেল হলে তাঁরা যেন হা-হুতাশ না করেন, পোড়া কপাল, দুরদৃষ্ট বলে নিজেকে ও পুত্রকে ধিক্কার না দেন। আমাদের ছেলেরা পরীক্ষা পাশ করতে না পারলে যেন

মহাপাতকী দস্যুর চেয়েও বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। কি দুর্দশা! যে ক'জন বাঙালী পাটের দালাল আছেন তাঁরা সব ফেল-করা ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয় দ্বার বন্ধ করলে কি টাকা পয়সা বা মনুষ্যত্বের দ্বার বন্ধ হয়? আমি আজীবন ভেবেছি। নব্য বঙ্গের সব ছেলেদের আমি জানি। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে জীবনে সফলতা লাভ করবার জন্যে গ্রাজুয়েট হবার কোন দরকার নেই। কিন্তু তাই বলে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা নেই আমি এমন কথা বলছি না। লেখাপড়া চাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উচ্চ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ও লোকশিক্ষার নানা প্রকার বন্দোবস্ত আছে। তারা লেখাপড়া শিখে শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি নানা কাজে লেগে যায়। তারা জানে Knowledge is power, জ্ঞানই শক্তির উৎস। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বর্তমান যুদ্ধের ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা চাই, কিন্তু চাই না কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, যা জীবন-পথে কখনও আমাদের সম্বল হয় না।

আমাদের দেশের প্রদর্শনী উন্মুক্ত হবার পর কান্না পায়, দেখতে পাবেন দেখবার মত যা কিছু আছে তার সবই ইউরোপীয়-চালিত কারখানায় প্রস্তুত। তবু প্রদর্শনী চাই। প্রদর্শনীতে গিয়ে আমরা আমাদের দারিদ্র্য ও অভাব আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারব। বাঙালী যুবকের মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ আছে। এখন পরীক্ষা ফেল করে জীবনটা বৃথা হল একথাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে। আজ এই ভীষণ অন্ন-সমস্যার দিনে আমাদের যুবকগণ কি শুধু পাশ ফেল গণনা করে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাগ নষ্ট করে ফেলবেন? চাকরি হল না বলে জগৎ অন্ধকার দেখবেন? এ মোহ ছাড়িয়ে উঠতেই হবে। আমাদের এমন একটা সবল জীবন্ত যুবক-সমাজের দরকার হয়েছে যাঁরা গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটুও ভয় পাবেন না, পাশ-ফেলের হিসাব না রেখে যাঁরা আপনার তেজে আপনি দীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড কর্ম্ম-চেষ্টা প্রকট করে দেখাবেন। যাঁরা রাজ্য গঠন করেছেন—আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ, হায়দর আলি, ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রভৃতি—তাঁদের কেউই স্কুল-কলেজে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পান নি। পরহিতব্রত কার্ণেগী ৯০ কোটি টাকা মূল্যে তাঁর লোহার কারখানা

বিক্রয় করেছিলেন ; তিনি জীবন-সংগ্রামের প্রারম্ভে রাস্তায় খবরের কাগজ বেচ্‌তেন। লর্ড রবার্টস্ সামান্য সৈনিক থেকে নিজের চেষ্টায় ক্রমে ফিল্ড মার্শাল হয়েছিলেন। লর্ড কিচ্‌নারও তাই। টাটা, দামোদর ঠাকুরসে, ফজুলভাই করিমভাই, লিপটন, এই কলকাতার গোয়েনকা, ঝুনঝুনওয়ালা, হরদিৎ রায় চামারিয়া, অথবা আয়রনসাইড্ বার্কমায়ার এঁরা অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির কোন ধারই ধারেন নি। তাই বলে এঁদের অশিক্ষিতও বলা চলে না। এঁরা সম্পূর্ণ শিক্ষিত ; এঁদের শিক্ষার মূলে স্বাবলম্বন। এঁরা পাঠাগারে বসে বই পড়েন,—"নোট" পড়েন না। আমাদেরও নিজের চেষ্টায় শিখতে হবে ও আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবেশ করতে হবে। শিল্পের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে, নইলে অস্বাস্থ্য ও অন্নাভাবে অচিরে বাঙালী জাতির অর্দ্ধেক ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানে আমরা সামান্য-ভাবে কলকারখানা স্থাপন করতে ও নানা প্রকার ব্যবসার কাজে প্রবৃত্ত হতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু কোথাও রীতিমত সফলতার মুখ দেখতে পাই নি। এই কারণে অনেকে একটা আত্মঘাতী চীৎকার আরম্ভ করেছেন, বাঙালীর দ্বারা কিছু হবে না। কিন্তু আজ ইউরোপ যে ব্যবসায়ক্ষেত্রে একাধিপত্য লাভ করেছে তা পাঁচশ বছর বা ততোধিক কালের বংশপরম্পরালব্ধ অভিজ্ঞতার ফল,—এই কথাটা মনে রাখলে আমরা কারও গঞ্জনাবাক্যে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ব না। আর আপনাদের চেষ্টায় কলকারখানা স্থাপন করতে না পারলে, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হতে অনেক বাঙালী যুবক শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান নিয়ে দেশে ফিরে আসছেন সে জ্ঞান কর্ম্ম-ক্ষেত্রের অভাবে সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে। বিদেশ থেকে কোন একটা শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে ফিরে এলেই ত হবে না—তাকে কাজে লাগাবার জন্যে ক্ষেত্র রচনা করতে হবে। অতএব বিশেষ অনুধাবন করে দেখুন ; আজ আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা উপস্থিত। চাকরি চাকরি করলে আর চলবে না ; এ পথ ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পথ, স্বাবলম্বনের আত্মনির্ভরতার পথ ধরতেই হবে। আমি বাঙলার তথা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি। দেশে যাতে বিজ্ঞানচর্চ্চা হয় এবং নব্য যুবক চাকরির উমেদারী না করে শিল্পো-ন্নতির কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন সর্ব্বত্রই আমার এই নিশান।*

* বক্তৃতাটি 'প্রবাসী' ১৩২৬, মাঘ সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে এই বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় হাওড়া শিল্পপ্রদর্শনীর উল্লেখ আছে।

অন্ন-সমস্যা ২

'অন্নচিন্তা চমৎকারা',—তাই আজ আমাদের জাতি বুদ্ধিহারা হয়েছে। কঠিন অন্ন-সমস্যার মীমাংসা করবার উদ্দেশ্যে বাঙালী পিতামাতা পুত্রকে মাট্রিকুলেশন পাশের পর ছুটিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মুখ ক'রে ; এল্ এ, বি এ, পাশ করে ডিগ্রী নিয়ে ছেলে আঁচলা বেঁধে টাকা আনবে এই একটা মোহের ঘোরে। আশায় আনন্দে সুখের স্বপন দেখতে দেখতে সাত আট বৎসর কাল এই আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে খুব জাঁকাল রকম ডিগ্রী নিয়ে বাঙালী যুবক যখন কলেজ, অধ্যাপক, আর্টস, সায়ান্স প্রভৃতির হাওয়া থেকে এসে একেবারে শক্ত মাটির পৃথিবীতে দাঁড়ান তখনই বুঝতে পারেন যে, এই বস্তুর হাটে তিনি নিতান্তই নিঃসম্বল—এ বাজারে কেনাবেচা করতে হলে যে যোগ্যতার দরকার মল্লিনাথের টীকায় বা এম এ ক্লাসের অধ্যাপকের পাশ করানো নোটের কোথায়ও তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। জীবন-পথে পা দিয়েই এই যে একটা ধাক্কা লাগে, সারা জীবনে অনেকেই তা সামলে উঠতে পারেন না। একটা নৈরাশ্যের ছায়া এইখানেই ঘনীভূত হয়। তারপর কেরানী মাষ্টার বা উকীল হয়ে গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসতে ভাসতে অভাবের পেষণে স্বভাব নষ্ট হয়, আর জীবনটা ক্রমে নৈরাশ্যপূরিত অন্তঃসারশূন্য হয়ে অকালবার্দ্ধক্যে মুষড়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের ভুল কোথায়? কি উপায়েই বা ভ্রান্তির অপনোদন হতে পারে?

আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় রসায়নের পরীক্ষাগার থেকে বাহিরে এসে উৎকট অন্ন-সমস্যা সম্বন্ধে যদি আলোচনা আরম্ভ করে থাকি তবে আপনারা জানবেন সে নিতান্তই প্রাণের দায়ে। বাঙালীর আজ পেটের দায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "আগে পেট ভরে ভাত খাও, তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম হবে।" হিন্দু আমরা—খুব আধ্যাত্মিক—সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অনুশীলন করতে চাই। কিন্তু বাতাস খেয়ে ধর্ম্ম পালন হয় কি? স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি, উৎসাহ, অধ্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে যথেষ্ট আহার চাই। কিন্তু আমরা অভাবে, অস্বাস্থ্যে, রোগে দিন দিন নিস্তেজ হয়ে পড়ছি, কর্ম্মশক্তি তিল তিল করে

ক্ষয় পাচ্ছে, অন্ন-সমস্যার সঙ্গে অস্তিত্ব-সঙ্কট এগিয়ে আসছে। আজ তাই সমস্ত দেশের ছাত্রদের গলা ছেড়ে ডেকে বিমর্ষভাবে আমায় বলতে হচ্ছে— সাবধান! বিপদ সন্নিকট! ছাত্র তোমরা, দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল। তাই এই সকল অপ্রিয় সত্য তোমাদের কাছে খুব স্পষ্ট করে বলছি। "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—ঠিক কথা নয়। রোগ ঢাকলে চলবে না। রোগ নির্ণয় করে বিধিমত ঔষধের ব্যবস্থা করলে তবেই আমরা বাঁচতে পারব।

আপনারা সকলেই জানেন সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের কথা—যেখানে বাঙালীর ছেলে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী চর্চ্চা আরম্ভ করে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি থেকে বরাবর আজ পর্যন্ত আমরা চলেছি—একভাবে একই বাঁধাপথে। এই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলবার কালে এখন একবার উচ্চ স্বরে বলে উঠতে হবে "থামো!—থামো!" সকলকেই কি সরলরেখাক্রমে একই নির্দ্দিষ্ট পথে যেতে হবে? রেখামাত্র বিচ্যুতি হলে চলে না কি? বাস্তবিক একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে দেখতে হবে ডিগ্রী ও চাকরির মোহে আমরা যে পথে ছুটেছি তার শেষ সীমায় সফলতার আলোক প্রস্ফুট হয়ে আছে অথবা বিরাট ব্যর্থতার অন্ধকূপ আমাদের ডুবিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করছে।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও জীবিকার্জ্জন—এই দুইএর মধ্যে এখন কিরূপ সম্পর্কে দাঁড়িয়েছে তার আলোচনা করবার আগে একটা কথা আমি বলে রাখি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের "ছাপের" মূল্য যাই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে আমি যত কথাই বলি না কেন, প্রকৃত উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করা চাই। লেখাপড়া চাই, গণ্ডমূর্খ হলে কিছুতেই চলবে না। কিন্তু অকর্ম্মণ্য ডিগ্রীধারী হয়ে কোন লাভই নেই, গৌরবও নেই। আমাদের পোড়া কপাল যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ছাপ"কে অন্ন-সংস্থানের একমাত্র উপায়— "নান্যদস্তি" ব'লে জ্ঞান করছি। এই ধারণাটা ভূতের মত আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে—কিছুতেই নামতে চায় না।

এই ধরুন বি এল পাশ করে ওকালতি করা। ছেলেদের ও-একটা বাঁধা গৎ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে যাই—জেলা, মহকুমা, জজ বা ম্যাজিষ্টরের সকল রকমের আদালত—সব জায়গাতেই উকীলের সংখ্যা মক্কেলের দশগুণ,

কোথাও বা বিশগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই উকীল হ'লেও পয়সা রোজগার আর হচ্ছে না। কিন্তু তবুও বি এ পাশ করেই বাঙালী যুবক আইন পড়তে ছুটছেন। পালে পালে, দলে দলে সকালে বিকালে আইন পড়া চলছে। "পাশটা করে রাখা যাক"—আইন পড়বার এই একমাত্র নজীর আছে। কিন্তু যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজনের আড়ম্বরটা অধিক, সেখানে আয়োজন যে অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হবে এ ত স্বতঃসিদ্ধ কথা।

"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"—আইন পড়ো না, আর দরকার নেই—এমন কথা বলি না। কিন্তু এই কথা বলি—যার কাটতি নেই, আদর নেই, গুমোর নেই, যা গুদামজাত হয়ে পড়ে থেকে পচে, সে জিনিষের আবাদ যেমন বন্ধ রাখা ভাল, আইন পড়াও সেই যুক্তিরই বশে স্থগিত রাখা বা বহুল পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া দরকার নয় কি? আইনজ্ঞেরা আমার শত্রু এমন উৎকট অদ্ভুত কথা আমি বলিনি। বাঙলার ব্যবহারজীবিদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, ডবলিউ সি ব্যানার্জ্জী, আনন্দমোহন বসু, প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃগণ, কলকাতা সায়ান্স কলেজের প্রাণস্বরূপ স্যর তারকনাথ ও স্যর রাসবিহারী, এবং মনস্বী জষ্টিস চৌধুরী, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ও সি, আর, দাশ প্রভৃতি ব্যবহারজীবিগণ বাঙলার সকল শুভকার্য্যে অগ্রণীস্বরূপ। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিজ্ঞ ব্যবহার-জীবের স্থান কোথায়—মহামতি বার্ক তা অতি সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন। কিন্তু ছোট বড় সকল প্রকার আদালতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েও যাঁরা উপোষ করে থাকতে বাধ্য হন, বার লাইব্রেরীর চাঁদার পয়সাটা যাঁরা দিয়ে উঠতে পারেন না এবং স্থল বিশেষে এক ছিলিম তামাক পেলে যাঁরা কয়েক পাতা নকল করে দিতে পারেন, এমন উকীলরা কি ওকালতি ব্যাপারটার মর্যাদাহানি করছেন না! তাই বলছিলাম উকীল তৈরী করবার কলটা যদি বেশ কয়েক বৎসর বন্ধ থাকে তবে গোবেচারী উপোষ-কারীর দল বেঁচে যেতে পারে। প্রয়োজন ও আয়োজনের মধ্যে অসামঞ্জস্য কত বেশী হ'য়ে পড়ছে বিবেচনা করে দেখা উচিত। তাহলে আর দফে দফে উকীল তৈরী করে তাদের দফা রফা করবার প্রবৃত্তি হবে না।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর সন্তান ডিগ্রী পেলেই জীবিকা সংস্থান করতে পারবে আর ডিগ্রীর অভাবে চারদিক অন্ধকার দেখবে এটা কত বড় ভুল আজ তা নিঃসংশয়ে বুঝে নিতে হবে। বৎসর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তকমা নিয়ে যে গ্রাজুয়েটের দল জয়পতাকা উড়িয়ে বেরিয়ে আসছেন তাঁদের বাজার দর আজকাল কত? একটা কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখলে এক ঝুড়ি দরখাস্ত পড়ে—তারপর তার মধ্যে একজন নির্ব্বাচিত হন। কাজেই বি এ ৪০৲ টাকা, আর এম এ ৭০৲ টাকা পেলেও ঐ মাহিনায় চাকরি পাবার সম্ভাবনা গ্রাজুয়েট-সাধারণের পক্ষে কত অল্প তা বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই—শুধু একটু ভেবে দেখার ওয়াস্তা। সকলেই হা অন্ন! হা অন্ন! ক'রে বেড়াচ্ছেন। এম এ পাশ করবার পর যখন কাজকর্ম্ম জোটে না তখন মনের দুঃখে বাঙালী যুবককে বলতে শুনেছি—ফেল হলে ভাল হত—তবু আর এক বৎসর দুশ্চিন্তার হাত হতে নিস্কৃতি পেতাম। চাকরির বাজার আগে ছিল ভাল বটে। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে ইংরেজী শিখে বাঙালী চাকরিই করছে। শিক্ষিত যুবক আগে মুন্সেফ, ডিপুটি হতে পারতেন,—গবর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী অফিসে নানাপ্রকার কর্ম্ম জুটত। ইংরেজ যখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব ও বর্ম্মায় রাজ্যবিস্তার করলেন, তখন বাঙালীও সেখানে গেল চাকরি করতে, আর মাড়োয়ারী, বোম্বেওয়ালা প্রভৃতি গেলেন ব্যবসা করতে। ডিগ্রী থাকলে চাকরির বড় সুবিধা হত; তাই তখন ডিগ্রীর একটা অকৃত্রিম মূল্য হয়েছিল। আর সেই কারণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরিই এক ধ্যান এক জ্ঞান হয়ে উঠলো। কিন্তু এখন শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এত চাকরি জুটবে কোথা থেকে? অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য করতে না পারলে ঘটনাচক্রের পেষণে মরতে হবে আমাদেরই। সুতরাং চাকরির পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরতে হবে।

এইস্থানে আমাদের বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর একটু আলোচনা করে দেখতে হবে। আমি বলেছি যে, আমরা চাকরির জন্য ডিগ্রীর চেষ্টা করি। আবার ডিগ্রীর জন্য এক টাকা মূল্যের পুস্তকের পাঁচ টাকা মূল্যের নানা-রকম নোট কিনে থাকি। এ যে সেই বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। কেবল নোট মুখস্থ আর গৎ আওড়ান। কাজেই বিদ্যা আমাদের পুঁথিগত।

ডিগ্রী লাভের এইরূপ চেষ্টায় মৌলিকতা নষ্ট হয় এবং প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। পাশ-করা ছেলে কার্য্যক্ষেত্রে নেমে হাতড়ে বেড়ায়—কোথাও কূল পায় না। ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্টে অনেক বিশেষজ্ঞের মত আছে। সেই সকল মতের সমালোচনা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন—

"The present system is like a soul-destroying machine. If the young Indian of ability passes through it, he will lose all his soul and half of his reasoning capacity in the process....... Our University system instead of encouraging the love of learning, kills it. The Universities of India are but factories where a few are manufactured into graduates, and a good many more wrecked in the voyage of their intellectual life....... The education that is imparted in the colleges, gives a very narrow outlook to their alumni and fails to stimulate any healthy intellectual curiosity in the majority or to develop the powers of initiative when thrown on their own reasources, of accurate observation and independent thinking and of applying the knowledge gained."

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী মানুষের অন্তরকে পিষে ফেলবার যন্ত্র বিশেষ। এতে জ্ঞানলিপ্সা উদ্দীপ্ত হওয়া দূরে থাক একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়; ছাত্রের মন সঙ্কুচিত হয়ে অসাড় ও কৌতূহলশূন্য হয়; কোন কাজ আরম্ভ করবার অথবা লব্ধজ্ঞান কার্য্যে প্রয়োগ করবার সাহস বা ইচ্ছা থাকে না। ঐ রিপোর্ট থেকে আর দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করছি—

"Matriculation is the key which unlocks the door to all the colleges attractive to the respectable classes of Bengal and at that door the crowd grows larger every year."

"Pupils at present look upon their school or college-life as nothing but a preparation for University examinations," writes Mr. Jogendranath Bhattacharya, "their horizon is circumscribed as they have no higher aim than to pass examination. When a certificate is the chief aim

and end, any subject that does not lend itself to the test, becomes neglected. This oppressive system also affected the method of instruction. Teachers are only too careful to teach those things that will be set in the final examination. The number of passes being the goal, the spirit of enquiry in the pupil is smothered, cram lessons and 'keys' receive encouragement."

"Teaching is being unduly subordinated to examination," writes Mr. Akshoykumar Sarkar of Chittagong, "the teachers' success depends upon the number of students he has made to pass. Some school authorities have taken teachers to task for failing to pass a high percentage of students. Students themselves say that they come not to learn but to pass the examination. Teachers also give way to this view very often. The guardians of students generally endorse this view."

"The very large majority of the schools I have seen in East Bengal," writes Mr. J. W. Gunn, "are cram establishments pure and simple, where everything is subordinated to the immediate requiremets of the Matriculation Examination."

মাট্রিকুলেশন পাশ করলে সকল কলেজেরই দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই মাট্রিকুলেশনে ছাত্রের সংখ্যা প্রত্যেক বৎসরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বৃদ্ধিমাত্রেই কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? দেশে জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়ছে এই ভেবে অনেকেই আশ্বস্ত হন। কিন্তু এ কি স্বাস্থ্যকর তৃষ্ণা? অথবা বিসূচিকার তৃষ্ণার মত ভয়ঙ্কর! আমি অনেক সময় পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকি। বাগেরহাট অঞ্চলে গিয়ে দেখেছি সেখানে শুধু কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য নয়, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য বারুইদের মধ্যে লেখাপড়া শিখবার আগ্রহ বেড়ে চলেছে। বেশ কথা। কিন্তু এই জ্ঞানতৃষ্ণাই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন প্রত্যেক মাট্রিকুলেট কলেজে প্রবেশ লাভ করবার জন্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ছুটাছুটি করতে থাকে। কলেজে স্থানাভাব। অথচ মাট্রিকুলেশন পাশ করে

প্রত্যেককে কলেজে পড়তেই হবে—কেন না আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটাকে জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায় বলে ধ'রে নিয়েছি। অন্য কোন উপায়ে যে অন্নসংস্থান হতে পারে এ ধারণা আমাদের নেই বললেই চলে। কাজেই কোন রকমে পয়সাকড়ির যোগাড় করে (দরিদ্রা বিধবা মা-মাসীর গহনা বাঁধা দিয়ে) ছুটে চল ঐ কলেজের দিকে। সেখানে ঠাসাঠাসি ঘেঁসাঘেঁসি ; তবু ছেলেরা ছুটে চলেছে—সম্মুখে গিয়ে বসবে ; ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে কেউ মারাই বা যায়। ৪০ মিনিটে পিরিয়ড! দলে দলে ছেলেরা সকালে বিকালে উপরে নীচে পাতালে, সব জায়গাতে পড়াশুনা করছে। ছাত্রদের জ্ঞানলাভে তেমন কোন আগ্রহ নেই—কোন রকমে নোট মুখস্থ ও পার্সেণ্টেজ রক্ষা করে ডিগ্রী পেলেই ব্যস খুশী। তারা কলেজের পাঠ্য-পুস্তকের অতিরিক্ত কোন বই পড়বে না, কারণ পাশ করবার জন্যে সে-সকল পাঠ করবার কোন আবশ্যক নেই। কোন নূতন কথা নয়, কোন অবান্তর কথা নয়—শুধু নোট দাও আর লাল নীল সবুজ পেন্সিলে সব দাগ দিয়ে নিতে বল। পরীক্ষা পাশ করাটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় শিক্ষা-প্রণালীর এই শোচনীয় দুর্দ্দশা হয়েছে। আবার পল্লীগ্রামের স্কুলে বেশী ছেলে পাশ না হলে বেচারী হেডমাষ্টারকে কর্তৃপক্ষ তাড়া দেন—সে এক বিষম মুস্কিল। কেউ বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন—আমার স্কুলে এতগুলি ছাত্র পাশ হয়েছে, অতএব চলে এস ইত্যাদি। কলেজের দ্বারে এই যে শত শত ছাত্র আঘাত করছে, মাথা খুঁড়ছে, এরা কি প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থী অথবা ডিগ্রীপ্রার্থী মাত্র—উদ্দেশ্য গলাধঃকরণ, উদ্গিরণ ও ডিগ্রীগ্রহণ। আমাদের ছেলে হলে চার বৎসর বয়স হতে বি-এল্-এ ব্লে আরম্ভ হয় আর চব্বিশে চর্ব্বণ শেষ। কিন্তু এতে যে পরিমাণ যোগ্যতা লাভ হয়, সঙ্কটপূর্ণ সংসার-পথে চলবার পক্ষে তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। যে কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যায় যে, সে চায় পাশ করতে—জ্ঞানলাভ করতে নয়। শিক্ষককে ছাত্ররূপ মনিবের মন জুগিয়ে চলতে হয়। কারণ পাশ করবার যা উপযোগী তাই তিনি পড়াবেন। অন্য কিছু দেখবেন না, অন্য কথা কানে তুলবেন না। পঠিত বিষয় আত্মসাৎ করে তা থেকে রসরক্ত সঞ্চিত হলে চিত্তোৎকর্ষ সাধিত হতে পারে। কিন্তু ছাত্র তা চায় না—সে

চায় গ্রামোফোনের মত মুখস্থ বুলি উদ্গিরণ করে ডিগ্রী নিতে। কিন্তু অন্ন-সংস্থানের জন্যে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই—এই ভয়ঙ্কর ভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তিলাভ করে ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-শিল্পের দিকে মনোনিবেশ করলে ছাত্রও বাঁচতে পারে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ও ভার মুক্ত হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-ফেলের অঙ্কপাতে ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভের গণনা না করে যদি আমাদের যুবকগণের আশা উৎসাহ ও বুদ্ধি অন্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয় তবে শুভ ফল হবে—সফলতা লাভ হবে—সন্দেহ নেই। অভাব ও অস্বাস্থ্যের তাড়নায় আমাদের জাতীয় জীবনের এমন একটা সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়েছে যে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক—সকলেরই এই কথাগুলি বিশেষ করে অনুধাবন করে দেখা উচিত।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এদেশে কতকগুলি কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে ডিগ্রীধারীগণ পশ্চাতে ছিলেন; কোন কৃতিত্ব তাঁরা দেখাতে পারেন নি। তাঁরা কলের মত, কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত। বিদ্যাশিক্ষার ফলে তাঁরা কেরানীগিরির যোগ্যতা লাভ করেন—নিজের চেষ্টা, উৎসাহ ও বুদ্ধির বলে কিছু করবার সাহস বা শক্তি ছাত্রজীবনেই তাঁরা হারিয়ে বসেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে সকল বাঙালী সফলতা লাভ করেছেন তাঁদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ধারই ধারেন না। স্যর রাজেন্দ্রনাথ, জে, সি, ব্যানার্জ্জি, কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী এন্, সি, সরকার, রেলওয়ে ট্রাফিকের এস্, সি, ঘোষ—এঁরা উপাধির ধার ধারেন না। জে, সি, ব্যানার্জ্জির কৃতিত্ব বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি স্থানে পৌঁছেচে। সেখানে এখন এক কোটি টাকার কণ্ট্রাকট তাঁর হাতে। বাঙালীর বোম্বাই প্রদেশে এই প্রথম প্রচেষ্টা; আমাদের পক্ষে এ বড় গৌরবের কথা! গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙে, বাঁধা পথ ছেড়ে নূতন পথে পা ফেলে এবং উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে সফলতায় মণ্ডিত হয়ে এঁরা আমাদের যুবকদের সম্মুখে অন্ন-সংস্থান ও দারিদ্র্য-নিবারণের একটা নূতন পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের ছেলেরা পাশ না করতে পারলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে—বলে, হায় হায় জীবনটা মাটী হ'য়ে গেল। আরে, জীবন

মাটী হয় ত ঐখানেই—ঐ একটানা এক বাঁধা পথে, যা বৈচিত্র্যে সুন্দর নয়, যেখানে আশার আলোকপাত হয় না, যেখানে শুধু দারিদ্র্যের অশ্রু, ভাবনা বেদনা ও কর্ম্মপঙ্গুত্ব। ৩০ বৎসরের বাঙালী যুবক সংসার-জ্বালায় জর্জ্জরিত, চক্ষু নিষ্প্রভ, মুখে আনন্দের চিহ্ন নেই; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—মেয়ে সেয়ানা হচ্ছে বিয়ে দিতে হবে, বরের বাজার আগুন। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে যাঁরা সফলতার মুখ দেখেছেন, সেই ইংরেজ ও মাড়োয়ারীকে দেখ—কত স্ফূর্ত্তি, কত আশা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচ বছরে আমাদের যুবকের ডিগ্রী ও চাকরির মোহ ঘুচে যায়। ব্যর্থতা ও বিফলতা তাকে ঘিরে ধরে। অবসাদ হিমে ডুবতে ডুবতে যৌবনেই তার জীবনগ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ে। অকাল বার্দ্ধক্যের চিহ্ন দেখা দেয়। তাই বলি, প্রথম বয়সের আশা উৎসাহ ডিগ্রী নেবার চেষ্টায় নিঃশেষ করে না দিয়ে, আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করে বেরিয়ে পড় দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ প্রকাণ্ড এই দেশে, যেখানে ছয়শত কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রত্যেক বৎসর আমদানী রপ্তানী হচ্ছে। এই প্রকাণ্ড ব্যবসায়-ব্যাপারের সব মুনাফা ইংরেজ, জার্ম্মান, জাপানী প্রভৃতি বিদেশীরা এবং ভারতের ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, মাড়োয়ারী প্রভৃতি বণিকগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়।

বাঙলা দেশের প্রধান সহর কলকাতার বাসিন্দাদের শতকরা ৫০ জন বাঙালী নয়। ইংরেজ, জাপানী, চীনা এবং হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী প্রভৃতি কলকাতার সর্ব্বত্র বসতি বিস্তার করেছেন। ছোটখাট শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত বাঙালীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় মাড়োয়ারী অজস্র টাকা লাভ করেছেন। কলকাতার ব্যবসায়ে তাঁদের কোটি কোটি টাকা খাটছে। উদ্বৃত্ত টাকায় তাঁরা বড় বড় জমিদারী কিনতে আরম্ভ করেছেন; শীঘ্রই মাড়োয়ারী বণিক কলকাতার সব বাড়ীর মালিক হবেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর বাঙলা দেশে বাঙালী আমরা হতাশ হ'য়ে, নিরুপায় হয়ে বসে আছি। আমাদের এখন উঠে প'ড়ে লাগতে হবে, এই ভয়ঙ্কর অন্ন-সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। যে শিক্ষায় শুধু মেরুদণ্ডহীন গ্রাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না, যে শিক্ষা আমাদের 'করে খেতে' শেখায় না, দুর্ব্বল অসহায় শিশুর মত সংসার পথে ছেড়ে দেয়, সে শিক্ষায় প্রয়োজন

কি? তাই আমি জীবনে কঠোরতার আশ্রয় ক'রে বাঙালী যুবককে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-শিক্ষা করতে আহ্বান করছি, কারণ, বাঁচতে হলে বাঙালীকে আগে অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে হবে। এতে যদি কেউ দোষ দেন যে, আমি বাঙলার যুবককে মাড়োয়ারী হতে উৎসাহিত করছি তবে সে দোষে আমি দোষী সন্দেহ নেই। যাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মণ ধান ও পাট উৎপন্ন হয় ও সেই উৎপন্ন দ্রব্য এক হাত থেকে আর এক হাতে তুলে দিয়ে মাড়োয়ারী প্রভৃতি বণিকগণ মাঝ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, সেই দেশের যুবকেরা 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করে কেঁদে বেড়ান! ধিক্ তাদের লেখাপড়াকে! ধিক্ তাদের ইউনিভারসিটীর ডিগ্রীকে! লেখাপড়া কর, মহামনীষিগণ যে সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় লাভ কর, চিন্তা কর, মানসিক শক্তি ও মৌলিকতাকে বিকশিত কর, কিন্তু অন্য শত পথ পরিত্যাগ করে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্যে জ্ঞানশূন্য হয়ে ডিগ্রীর লোভে ঐ ইউনিভারসিটির মুখে ছুটো না।

ইংলণ্ডে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার মধ্যে কতকগুলির নাম করা যেতে পারে যা শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়েছে। যথা ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্ম্মিংহাম, লিড্‌স্, শেফিল্ড এবং লিবারপুল প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। এক একটি ইউনিভারসিটি এক একটি কলেজের মত, হাজার দেড় হাজার ছাত্র সেখানে অতি যত্নে শিক্ষা লাভ করে থাকে; এখানকার মত স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি বা মারামারি করতে হয় না। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৯০ লক্ষ অথবা ১ কোটি টাকা দেওয়া (Endowment) আছে। সেই অর্থ থেকে ছাত্রেরা নানারকমের বৃত্তি পায় এবং সাহিত্য, ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দান করা হয়। বড় বড় কারখানার সন্নিকটে স্থাপিত ব'লে এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে হাতে কলমে শিল্প-শিক্ষা হয়—যে শিক্ষা ক্রমশঃ ছাত্রকে জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত ক'রে সংসারপথে পাঠিয়ে দেয়। এই সকল ইউনিভারসিটিতে শিল্পশিক্ষাই প্রধান স্থান অধিকার করে আছে, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি কতকটা পিছনে পড়ে গেছে। আমাদের দেশে কলকাতায় বাণিজ্য-বিদ্যালয় (Commercial College) স্থাপন করবার কল্পনা চলেছে। কিন্তু

কলকাতায় সেরূপ কলেজ স্থাপিত হলে বড় বেশী লাভ হবে না। কারণ সেখানকার বাঙালী গ্রাজুয়েটরা চাকরিই খুঁজবে আমার এরূপ মনে হয়। বোম্বাই প্রদেশে বড় বড় কারখানার নিকটে শিল্পবাণিজ্য শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হলে দেশের উপকার হবে আশা করা যায়।

অন্নসমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত আছে। একের কথা আলোচনা করবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলির কথা আপনা হতেই এসে পড়ে। কারণ, ঐগুলি একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দিক ছাড়া ত আর পৃথক কিছু নয়। আমাদের সমাজের জাতিভেদ ব্যাপারটি দেশীয় শিল্পের বিনাশসাধনে বড় কম সহায়তা করে নি। এ সম্বন্ধে স্যর গুরুদাসের উক্তি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "The caste system which has done some good has done this harm that notwithstanding its relaxation at the present day, it has created in the higher castes with all their poverty, a prejudice against agricultural, technological and even commercial pursuits,"—যাঁরা উঁচু জাত, দরিদ্র হলেও তাঁরা কৃষি ও শিল্প বা বাণিজ্যের দিকে ঘেঁসতে চান না; সমাজে আভিজাত্য নষ্ট হবে এই একটা কুসংস্কার—আজ জাতিভেদের কঠোরতা কতকটা শিথিল হলেও—এখনও তাঁদের ঘাড়ে চেপে আছে। আপনারা সকলেই জানেন হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা উচ্চ জাতি তাঁরাই অপরের চেয়ে লেখাপড়ায় অধিক অগ্রসর হয়েছেন। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত। মান্দ্রাজে আয়ার ও আয়েঙ্গারগণ এবং মহারাষ্ট্রে তিলক, গোখেল, পরাঞ্জপে, ভাণ্ডারকর, চন্দ্রাভরকর এবং চিৎপবন ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাশিক্ষার আলোক অনেক পরিমাণে লাভ করেছেন। কিন্তু এঁরা সকলেই কেরানী বা শিক্ষক অথবা উকীল এবং ডাক্তার। চাকরির ক্ষেত্রে উঁচু জাতের বাঙালী ও মান্দ্রাজীর মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। বাঙালী গ্রাজুয়েট যদি বা ৩৫৲ টাকা চান, মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট ৩০৲ টাকায় খুসী। বাঙালী শাকের সঙ্গে দুটো চিংড়ী মাছ ফেলে ঘণ্ট করেন, আর মান্দ্রাজী ভাতের সঙ্গে একটু তেঁতুলের জল পেলেই তুষ্ট! আজ চালের

মণ ১১৲ টাকা, মাছের সের ১৲ টাকা। কাজেই উপবাসে আমরা মারা যাচ্ছি। আমাদের যে স্কুলকলেজে লেখাপড়া শেখা, সে শুধু চাকরির জন্যে। উচ্চ জাতির শিক্ষিত লোকেরা ব্যবসায়ে যেতে অনিচ্ছুক—দ্বিধাবোধ করেন। বহুকাল পূর্ব্বে জাপান ও ফ্রান্সে অবস্থা কতকটা এইরূপ ছিল। অভিজাত বংশের কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হতে চাইতেন না। সেদিন তাঁদের কেটে গেছে—আমাদের কিন্তু কাটে নি। আজ ইউরোপ ও জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে চলেছে। তার কারণ শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারলাভ করছে এবং ছাত্রেরা সেই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করবার জন্যে উত্তরোত্তর আগ্রহ প্রকাশ করছে। আর আমাদের দেশেও ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু কারণটা কি? বলা শক্ত। চাকরির ক্ষেত্র ত প্রসারিত হয় নি! আর আমাদের উদ্দেশ্য শিল্প বা বাণিজ্য শিক্ষা—এরূপ ত মনে হয় না। কাজেই শিক্ষালাভের এই আগ্রহকে ঠিক পথে পরিচালিত করলে দেশের উপকার হবে, শুধু চাকরিপ্রিয় গ্রাজুয়েট তৈরী করলে কোন কাজে লাগবে না।

আত্মাভিমানের বশে বাঙালার উচ্চ জাতি শ্রমের মর্য্যাদা ক্রমশঃ ভুলে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কাজ থেকে অবসর নিলেন। এদিকে লেখাপড়া তাঁদেরই একচেটিয়া ছিল। কাজেই সমাজে এক ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হল। শিক্ষাদীক্ষার সহিত ব্যবসা বা শিল্পের আর কোন সম্পর্কই রইল না। আমাদের সমাজে বিদ্যাবুদ্ধি সব উঁচু জাতের। সমাজের নিম্নস্তরে—দলিত জনসঙ্ঘের তাই প্রতিভার বিকাশ হল না। ইংলণ্ডে ষ্টিম্ এঞ্জিন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ব্যাপারে একটা ওলটপালট—একটা যুগ পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। হাতে যারা তাঁত চালাত সেই সব তাঁতীরা প্রথমে কলের তাঁত ভেঙ্গে দিলে। কারণ কলে অল্প পরিশ্রমে অনেক কাজ হতে লাগল। কিন্তু ইংলণ্ড শীঘ্রই সে ধাক্কা সামলে নিতে সমর্থ হল। গোলমাল ক্রমে থেমে গেল। ইংলণ্ডে জাতিভেদ ছিল না—লক্ষ লক্ষ লোককে সেখানে নীচ জাত বলে অসুবিধা ও নির্য্যাতন ভোগ করতে হত না। তাই সেখানে সমাজের সকল স্তরেই প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। তাই ক্রমে দেখা গেল, শিল্প-জগতের সেই পরিবর্ত্তনের যুগে নাপিত আর্করাইট—যিনি এক পেনি পারিশ্রমিক নিয়ে

ক্ষৌরকার্য্য করতেন—তিনি হলেন আবিষ্কারক। আর তাঁতী (Hargreaves) হারগ্রিভ্‌স্‌ও তাঁর নব আবিষ্কারের দ্বারা এই কার্য্যের সহায়তা করলেন। সে দেশে সকলেরই প্রতিভা সকল ক্ষেত্রে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদের দেশে? এখানে উঁচু জাত যেদিন জাত বাঁচাবার জন্যে ৬৪ কলাবিদ্যা একে একে পরিত্যাগ করলেন, সেদিন সার্জ্জন হলেন পরামাণিক, আর বেদেরা হলেন বোটানিষ্ট। তারপর এসব ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ উন্নতির পরিচয় দিয়েছি তার কথায় আর কাজ নেই! বংশগত ভাবে চর্চ্চা হওয়ায় হাতের কৌশল খুব নিপুণ হয়েছিল স্বীকার করি এবং শিল্পও সূক্ষ্ম হয়েছিল। ঢাকাই মসলিন শিশিরসিক্ত হয়ে থাকলে কাপড় ব'লে কেউ বুঝতে পারত না। কিন্তু শিল্প বংশগত হওয়ায় প্রধান ক্ষতি হ'ল এই যে,—আমাদের দেশের আবেষ্টনের মধ্যে দের্কাৎ বা নিউটনের উদ্ভব ভাবে ও কাজে অসম্ভব হ'য়ে উঠল—এই জাতিভেদের আওতায় সমাজে স্বাধীন চিন্তা বা প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব হয়ে উঠল। কাজেই কলকজার রথে চড়ে পাশ্চাত্য দেশে শিল্প যখন আশ্চর্য্য গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগল তখন বাঙলার ফরাসডাঙ্গা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ও অন্যান্য প্রদেশের তাঁতীরা শুধু অবাক্ বিস্ময়ে অসহায় শিশুর মত সেই দিকে চেয়ে রইল—তাদের সঙ্গে সমান গতিতে অগ্রসর হবার কল্পনাও তাদের মনে উদিত হ'ল না। অথচ এই ভারতের তাঁতী কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপের বাজারে উৎকৃষ্ট জিনিষ পাঠিয়ে লাভ করত। যা হোক, এই বাণিজ্য-যুদ্ধে ভীষণ পরাজয় হ'ল বাঙলা দেশের। বোম্বাই আত্মচেষ্টায় ধাক্কা সামলে নিয়ে এখন আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে; খুব স্পর্দ্ধা ও গৌরবের কথা। বোম্বাই প্রদেশের বণিক দেখলেন, সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়; তখন ভাবলেন—বোম্বাই-এ কাপড়ের কল হবে না কেন? তাঁরা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বা ঐ সময়েই কাপড়-কলের কৌশলাদি শিক্ষা করতে লাগলেন। তারপর কল স্থাপন ক'রে প্রথম প্রথম অনেক লোকসান দিলেন। এসব কথা ওয়াচার লিখিত তাতার জীবনীতে পড়ে দেখবেন। তারপর একবার সফলতার মুখ দেখতেই তাঁদের আশা ও সাহস খুব বেড়ে গেল। শেষে বাঙলার স্বদেশী

আন্দোলনের সময় ত তাঁদের একেবারে পৌষমাস! তাঁরা শতকরা ৭০৲।৭৫৲ টাকা লাভ পেলেন। কিন্তু স্বদেশীর উত্তেজনার সময়েও বাঙলা দেশ কিছু করতে পারলে না। বাঙালী কল কিনে বসল ৬ লাখের স্থানে ১২ লাখ দিয়ে। কিন্তু কল চালাতে হয় কি করে তার খবর সর্ব্বাগ্রে না রাখায় সুফল হল না। 'বঙ্গলক্ষ্মী'র (বাঙালী স্থাপিত প্রথম কাপড়ের কল) কি দশা সে সময় হয়েছিল সে কথা অবিদিত নেই। আমাদের তখন শিক্ষা লাভ হল যে, শুধু বক্তৃতার উত্তেজনা বা ভাবোচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করে শিল্পোন্নতি হয় না। যা হোক, এখন সুখের বিষয় এই যে, যুদ্ধের বাজারে তবু 'বঙ্গলক্ষ্মী' একটু মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছেন।

এখন বোম্বাই ও কলকাতা একবার তুলনা করে দেখুন। বোম্বাই-এর ধন বোম্বাইবাসীর; কিন্তু কলকাতার অর্থসম্পত্তি বাঙালীর নয়—ইংরেজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া বা দিল্লীওয়ালা মুসলমানের। মান্দ্রাজের Black Town, কলকাতায় Native quarter—এসব কালা আদমীর পাড়া,—বদ্ধ, অন্ধকার, সাঁতস্যেঁতে,—গলির গলি তস্য গলি, এঁদো গলি। আর শ্বেতাঙ্গ যেখানে থাকেন সে একেবারে ইন্দ্রপুরী। কিন্তু বোম্বাই-এ তা নয়। সেখানে বড় বড় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বোম্বাইবাসী ধনকুবের, ক্রোড়পতি বণিক, কাপড় কলের মালিক প্রভৃতি মহাধনী বাস করেন। মোরারজী গোকুলদাস, স্যর্ বিঠলদাস ঠাকরসে, স্যর্ দোরাব তাতা—এঁরা সব বোম্বাই-এর তথা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন—ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উচ্চশির হয়ে দাঁড়াবার শক্তি এঁদের আছে—বাহাদুরী সেইখানে। ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার সময়—পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে একজন বোম্বাই-এর মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরের মুখের দিকে কয়েক বার চেয়ে দেখবার পর আলাপের সূত্রপাত হল। আমি ইংরেজীতে কথা বললাম। তিনি বললেন "নেহি সমঝ্‌তে"। ইংরেজী তিনি জানেন না। বোম্বাই-এ তাঁর হ্যাটের দোকান—টুপী আমদানী করেন জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি স্থান থেকে। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম ইউরোপে যখনই যে বন্দরে নেমেছিলেন তখন, যাঁদের এজেন্ট তিনি—তাঁদের লোক আপনি এসে তাঁকে আগ বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা হিন্দীতে কথা বলে

কার্য্য নির্ব্বাহ করেছে—কারণ গরজ তাদের! মস্ত বড় ব্যবসায়ী—তাই এত খাতির—ইউরোপের লোক হিন্দীতে কথা বলে! বাঙলা দেশে এমন কোথাও আছে কি?

বাঙালী যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ তার অন্য কারণও আছে। আমাদের সুজলা সুফলা বাঙলাদেশ—তারপর আবার আমাদের ছেলেরা পাখীর ডাকে ঘুমায় আর পাখীর ডাকে ওঠে। বাঙলার স্যাঁতস্যেঁতে হাওয়ার জন্যে মেকলে বলেছিলেন এদেশে ভাপ্‌রা তাপের (Vapour bath) মধ্যে থাকতে হয়। দেশের হাওয়ার দোষ। মিঃ চার্চিল—এখন যিনি একজন প্রধান রাজমন্ত্রী—তাঁর পিতা ভারতসচিব ছিলেন। ভারত ভ্রমণ করে তিনি বলেছিলেন—এদেশে মানুষগুলো জড়ভরত হয়ে আছে—Lulled by the languor of the land of lotus—উলিসিসের বর্ণিত কমলবিলাসী দেশের ঘুমপাড়ানী হাওয়ায় এলিয়ে পড়ে। আমাদের দৌড়ানতে হাঁটা, হাঁটায় বসা, বসায় শোওয়া আর শোওয়ায় ঘুমানো। বাঙলা উর্ব্বরা—একটু চষে বীজ ছড়িয়ে দিলেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই নদীমাতৃক দেশে আবালবৃদ্ধবনিতাকে রৌদ্রে পুড়তে পুড়তে শস্য উৎপাদন করতে হয় না। তারপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে যখন দেশের ভয়ানক দুর্দ্দশা হল, লোকাভাব হল, জমি বিনা আবাদে পতিত রইল, তখন নানা অসুবিধা দেখে লর্ড কর্ণওয়ালিস বললেন—রাজস্বের পরিমাণ বাঁধাধরা হোক্। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সকলেই কিছু কিছু জমিজমা জোগাড় করে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। এই পায়ের উপর পা দিয়ে 'বসে খাওয়া' কথাটি এখনও দেশে চরম সুখের পরিচায়ক। কিন্তু সবাই মিলে বসে খেতে চাইলে চলবে কেন? যেমন ইউরোপের কলকারখানা এসে আমাদের জোরে ধাক্কা দিল অমনিই বসে খাবার সুখ ঘুচে গেল, আর বসে খাওয়ার প্রবৃত্তিজনিত অলসতা আমাদের সর্বনাশ করলে। আবার যাঁদের টাকা জমেছে তাঁরা হয় কোম্পানীর কাগজ বা মহাজনী করবেন, নয় জমিদারী কিনবেন এবং বংশানুক্রমে তা ভোগ করবেন; এছাড়া টাকা খাটাবার অন্য কোন মতলব নেই। কাজেই বাঙালীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্তি হয়নি। বরং এই সকল কারণে আমাদের মধ্যে অলসতা

শ্রমবিমুখতা ও বিলাসপরায়ণতা প্রভৃতি দোষ প্রবেশ করেছে। বাঙলার বার ভুঁইঞা জমিদার ছিলেন। জমিদারী ও চাকরি নবাবী আমল থেকে বাঙালীর রক্তে ও ধমনীতে। কিন্তু এখন আর ওপথে গেলে চলবে না। ডিগ্রী ও চাকরির মোহ, জলহাওয়া ও অভ্যাসের দোষ, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের বলে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। অনেকে অভিযোগ করছেন—আমি লেখাপড়া ঘুচিয়ে দিয়ে বাঙালীর ছেলেকে মাড়োয়ারী হতে বলছি। বড় বড় ইউরোপীয়ান বণিক—তাঁরা কি গণ্ডমূর্খ? তাতা, বিঠলদাস, ইব্রাহিম করিমভাই এরা কি গণ্ডমূর্খ? লেখাপড়ার অভাবে মাড়োয়ারী এঁদের মত হতে পারেন নি, মাড়োয়ারী ব্যবসা শিখলেও শিল্প-প্রতিষ্ঠায় কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। লেখাপড়া ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরস্পর বিরোধী নয়। আমি মাড়োয়ারীকে বলব—ব্যবসার সঙ্গে লেখাপড়া শেখ; আর বাঙালীকে বলব—ব্যবসা কর, চাকরির মায়া ছাড়।*

* বক্তৃতাটি "প্রবাসী" ১৩২৬, ফাল্গুন সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে এই বক্তৃতা দেন।

অন্ন-সমস্যা ৩

দেশের অন্নসমস্যা দিন দিন কঠিন হ'তে কঠিনতর হয়ে উঠছে, অথচ যার বলে 'ক'রে খেতে' পারা যায় এমন কোন শিক্ষার বন্দোবস্ত শীঘ্র হয়ে উঠবে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইউনিভারসিটি ডিগ্রীর প্রসাদে কায়ক্লেশে ৪০।৫০ বা ৬০৲ টাকা আসতে পারে; কিন্তু তার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচে যাবার কোন আশা কারও মনে উদিত হচ্ছে না। চাকরির দুর্দ্দশার কথা অনেকবার বলেছি—সেই সম্পর্কে আর একটা কথা বলি। বাজারে চাকরি এখনও মেলে জানি, ১৫।২০ বা ২৫৲ টাকা মাহিনা—কিন্তু এও মেলা ভার হ'য়ে উঠছে। আগে পাশ করলে চাকরি হ'ত। এখন অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে চাকরির উমেদারী ক'রে হার মেনে গিয়ে একজন গ্রাজুয়েট রেল-কোম্পানীর সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টকে কুলী-লাইসেন্স পাবার আশায় দরখাস্ত লিখেছেন। সে দরখাস্ত আমার হাতে এসেছিল। ব্যাপার এই! এর উপর আর কিছু বলতে হবে কি? আজ অন্ন-সমস্যার মীমাংসা সম্বন্ধে দুচারটা কথা বলব। কোন পথ অবলম্বন করলে আমরা এই পেটের দায় থেকে নিস্তার পাব তা আমি ইতিপূর্ব্বে কতকটা নির্দ্দেশ করবার চেষ্টা করেছি। আজ সেই কথাই আরও স্পষ্ট ক'রে বলব। তাই বলে, যেন কেউ মনে করবেন না যে আমি এমন একটা সোজা বা বাঁধাপথ দেখিয়ে দেব যা অবলম্বন করলে সহজে এই মরা-বাঁচার প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে যাবে। তা নয়! সমস্যা যেমন জটিল, আমাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায় তেমনই প্রচণ্ড হওয়া চাই।

আমাদের দেশের অনেক যুবক বিদেশ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রং-করা, চামড়া-কষ-করা প্রভৃতি শিখে আসছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারছি কৈ? শুধু রং বা চামড়া বা অন্য কিছুর কার্য্য শিক্ষা করলেই ত চলবে না। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করবার জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই। তাই বলছি আমাদের বড় বড় কারখানা খুলতে হবে। কারখানা থেকে একদিকে যেমন উৎপন্ন দ্রব্য আমরা দেশ-বিদেশে পাঠাতে

পারব, অন্যদিকে তেমনি শিল্পশিক্ষার দ্বার যথার্থভাবে উন্মুক্ত হবে। কল্পনা অনেক দূর ছুটেছে বটে কিন্তু এই সব কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতেই হবে যদি আমাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার সাধ থাকে। এই দেখুন, মিঃ জি সি সেন—ইংলণ্ড থেকে ইনি Dyeing বা রং করা শিখে এসেছেন। কিছুদিন ইনি বঙ্গলক্ষ্মী মিলে কাজ করলেন। কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মীতে কাজের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। সেখানকার কাজ এত বড় নয় যে ঐরূপ একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। একজন চলনসই লোক থাকলেই সেখানে চ'লে যায়। কাজেই তাঁকে ঘুরে ফিরে গবর্মেণ্টের চাকরি নিতে হলো। এত কষ্ট স্বীকার ক'রে শিল্প সম্বন্ধে যে বিদ্যাটুকু তিনি বিদেশ থেকে নিয়ে এলেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে সে বিদ্যার কোন ব্যবহারই হলো না। সেইরূপ এ সি সেন, এস কে দত্ত প্রভৃতি। শরৎকুমার দত্ত জার্ম্মানিতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে এসে দেশে কোন কাজ যোগাড় করতে না পেরে শেষে জার্ম্মানির যে কারখানায় শিখেছিলেন সেইখানেই ফিরে গেলেন। তিনি এখন সেইস্থানে খুব উচ্চ পদ অধিকার করে আছেন। এদেশে বড় কারখানা থাকলে তিনি শক্তির পরিচয় দিতে পারতেন সন্দেহ নেই। এখানেও অনেক ছাত্র রসায়নে এম এ, বা এম এস-সি পাস ক'রে ইউরোপীয়নদের কারখানায় চাকরি নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আফিসে যেমন বাবু-কুলী থাকে, এঁরাও কেমিক্যাল-কুলী—দেশ থেকে অর্থ শোষণ ক'রে নিতে ইউরোপীয়ানদের সাহায্য করছেন। তাই বলছিলাম—আমাদের কারখানা খুলতে হবে। ফলিত বিজ্ঞানের (Applied Science) সাহায্যে আমাদের বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান খাড়া ক'রে তুলতে হবে।

কিন্তু শিল্পোন্নতির আগে চাই সাধারণ কেনাবেচার মধ্য দিয়ে ব্যবসা করা। ব্যবসা আরম্ভ ক'রেই কিছু সফল হওয়া যায় না। চেষ্টা চাই, ধৈর্য্য চাই। কেমিষ্ট্রী বা রসায়ন শিখতে হলে যেমন পরীক্ষাগার (Laboratory) চাই, ব্যবসা শিখতে হ'লেও পরীক্ষাগারের তেমনি দরকার। ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ক্যানিং ষ্ট্রীট, বড়বাজার, এজরা ষ্ট্রীট—এই সব স্থান হচ্ছে ব্যবসা-শিক্ষার পরীক্ষাগার। এই সব রাস্তায় চোখ চেয়ে ঘুরে ফিরে বাজারের হালচাল বুঝতে হবে। কোনো মাড়োয়ারী বা ইউরোপীয়ানদের দোকানে স্থবিধা

পেলেই কাজ শেখবার জন্যে ভর্ত্তি হতে হবে। কারণ ব্যবসায়-কার্য্যে শিক্ষানবিশীর বড় প্রয়োজন! এ সব ক্ষেত্রে ভুঁইফোড়ের স্থান নেই, হাতে কলমে কাজ শিখতে হবে, একথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি।

আমাদের দেশে ৬০০ কোটি টাকার মাল আমদানী রপ্তানী হয়। এই আমদানী রপ্তানীর কাজ এগিয়ে দিয়ে কলকাতায় কত ইউরোপীয়ান ও মাড়োয়ারী মাঝে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে নেয়। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাট হয়! কিন্তু ক্ষেত থেকে পাটকলে পৌঁছাবার আগে এই পাট অনেক হাত ঘোরে। এই সব middle-man হচ্ছেন ইউরোপীয়ান বা মাড়োয়ারী বা আরমিনি (পূর্ব্বে বলেছি)। এক হাত থেকে জিনিষ নিয়ে অন্য হাতে তুলে দিয়ে এঁরা মাঝ থেকে অর্থ উপার্জ্জন করে থাকেন। কিন্তু যে জমিদার মহাশয়ের জমিতে পাট জন্মায় তিনি ছেলের একটা বড় চাকরির জন্যে ম্যাজিষ্টর সাহেবের দ্বারে ধন্না দিয়া প'ড়ে থাকেন—একবার ভুলেও চেয়ে দেখেন না যে, এরূপে দালালগিরি করলে তার পুত্র কয়েকটা বড় চাকুরে অপেক্ষা বেশী টাকা আনতে পারেন। এরূপ শুধু পাট নয়—ধান, সরিষা, তিসি, ছোলা, গম, যব প্রভৃতি নানাবিধ ফসল মাড়োয়ারী ও ইউরোপীয়ানদের হাত দিয়ে চলে যায়। এই সব কাজ যদি বাঙালীর নিজের হাতে থাকত তবে অন্ন-সমস্যা আজ এত কঠিন ও জটিল হয়ে উঠতো না।

তারপর চামড়া, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি জিনিষের আমদানী রপ্তানী আছে। কলকাতা হ'তে ১০।১৫ কোটি টাকার চামড়া রপ্তানী হয়। ক্যানিং ষ্ট্রীট দিয়ে নাক বন্ধ করে চলবার সময় চামড়ার কথা খুব ভাল রকমই বোঝা যায়। বাঙালীর কিন্তু যেন প্রতিজ্ঞা—ও সব ছুঁতে নেই! তাই ইংরেজ ও মুসলমান চামড়ার ব্যবসা একচেটে করেছেন। আর ২৫৲ টাকা মাহিনায় নৈকষ্য কুলীনের সন্তান মুসলমান প্রভুর আদেশমত কোথায় কত চামড়া পাঠাতে হবে নাকে কাপড় দিয়ে কুলীর দ্বারা গুনিয়ে দিচ্ছেন। এই সব চামড়া-ব্যবসায়ীরা ক্রোড়পতি! আর এই চামড়া ধান-সরিষার মত পল্লাগ্রাম থেকেই আসে—আমরা কেউ সন্ধান লই না। কাষ্টমস্ হাউসের (Customs House) ত্রৈমাসিক রিপোর্টে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী

দ্রব্যের কথা পড়ে দেখলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কিন্তু আমরা তা চাই না—উপন্যাস আমাদের বড় ভাল লাগে।

আবার ইলিশ ও অন্যান্য মাছের ব্যবসাও খুব লাভজনক। নদীর ধার থেকে বরফ ঢাকা দিয়ে মাছ চালান করা হয়। অনেক হাত ঘুরে মাছ যখন কলকাতায় পৌঁছায় তখন ৸৵০ বা ১৲ টাকা সের। এরূপ চালানের কাজে বেশ লাভ আছে। তারপর পুকুরে পোনামাছ ছাড়তে হয়—নোনা জলে নদীর নোনা মাছ জন্মাবার চেষ্টা করতে হয়। এই সব মাছ বড় হলে অর্থাগমের বেশ একটা উপায় হয়। চমকে উঠো না—আমি তোমাদের মূর্গী ও শূওরের চাষ করতে বলি—যাকে বলে Poultry Farm। নিজে দাঁড়িয়ে লোকের দ্বারা কাজ করাবে। এ কাজেও অর্থোপার্জ্জন বেশ হয়। আর কত নাম আমি করব? তোমরা স্কুল-কলেজের ছাত্র। বৎসরে ছয় সাত মাস ছুটী পাও। ছুটিতে ছেলেরা সবাই দেশে যায়। আমিও আমার দেশে যাই। দেশে গিয়ে দেখি ছুটী পেয়ে ছেলেরা এলিয়ে পড়ে। রাত্রে ৮।১০ ঘন্টা ঘুম দেবার পর আবার মধ্যাহ্নে বারোটা থেকে তিনটা পর্য্যন্ত নিদ্রা। আর বাকী সময়টা তাসপাশা ও আড্ডায় কেটে যায়। অলস হলে লক্ষীছাড়া হতে হয়। এই নিদ্রা ও চপলতায় যে সময়টা নষ্ট হয় সেই সময়টার সদ্ব্যবহার করবার দায়িত্ববোধ জন্মান দরকার। নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ করে ছাত্রেরা দেশের নানাস্থান দেখে শুনে সময়টা কাজে লাগাতে পারে। এরূপে দেশের সকল স্থানে ও সকল প্রকার লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ হয়, আর কোথায় কি ভাবে কত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কত লোকের হাত দিয়ে কত প্রকারে ঐ সকল উৎপন্ন দ্রব্য নানাস্থানে চ'লে যায় তার সন্ধান পাওয়া যায়। বেশ সুনিপুণভাবে এই সকলের সংবাদ রাখলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হবে এবং চাকরি ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা' এই ভ্রম ঘুচে গিয়ে অন্ন-সংস্থানের অনেক নূতন পথ চোখের সুমুখে খুলে যাবে। এই সব অনুসন্ধানের ফলে দেশের কোথায় কোন্ বিদেশী বণিক টাকা দাদন দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্য কৌশলে হাতে এনে ফেলছেন তারও যথার্থ খবর নিশ্চয়ই আসবে।

আমার অনেক ছাত্র রসায়ন শাস্ত্রে এম এ, বা এম এস-সি, পাশ

করেছেন। তাঁদের মধ্যে চারি পাঁচ জনে মিলে চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি কোম্পানি নাম দিয়ে একখানা পুস্তকের দোকান খুলেছেন। সে দোকান আজ বেশ চলেছে। এঁরা বাধা কি আর পাচ্ছেন না? খুবই পাচ্ছেন। কিন্তু এঁদের জিদ আছে—প্রতিজ্ঞা খুব দৃঢ়। এঁরা বলেন, "আমরা কৃতকার্য্য হবই হব।" তাই আজ শুধু বই নয় অন্যান্য অনেক বিষয়ে এঁদের লোক নূতন নূতন ব্যবসার পত্তন করছেন। এ-সকল স্বপ্নের কথা নয়—অনেকেই উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করে এইরূপ কৃতকার্য্য হয়েছেন।

ব্যবসায়ে চাই কি? চাই ধৈর্য্য, চাই সাধুতা। আরম্ভ সামান্যভাবে হবে বটে, কিন্তু এই সামান্যের মধ্যে সফলতার বীজ নিহিত আছে। একবারেই কেহ খুব বড় হয়ে উঠতে পারে না; আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া সম্ভব নয়। কার্নেগী বাল্যকালে সর্ব্বপ্রথম রাস্তায় খবরের কাগজ বেচতেন। স্যর দোরাবজী তাতা—যাঁর লোহার কারখানায় আজ লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হচ্ছে—তিনি একবার বলেছিলেন যে তাঁর ম্যানেজার মিঃ তুৎউইলার সংসার-পথে প্রবেশ করে প্রথমে নিগ্রো জুড়ীদারের সঙ্গে এঞ্জিনে কয়লা ঢালতেন। আর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বলে আজ তিনি কত টাকা উপার্জ্জন করছেন! মাড়োয়ারী এক পয়সার ছাতু খেয়ে পিঠে কাপড়ের বস্তা ফেলে ব্যবসায়ে প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করেন। পরে তাঁরাই লক্ষপতি হয়ে দাঁড়ান। আর একটা দোকান করতে গেলেই তোমাদের প্রথমে চাই বড় বড় আলমারি টেবিল। ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি তখন কুলীর মত খেটেছিলাম। কয়েক বৎসরের মাহিনা থেকে ৮০০৲ টাকা জমিয়ে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি—আজ তার মূলধন ২৫।২৬ লক্ষ টাকা।

তারপর বাঙালী কখনও অংশীদারীতে কাজ করতে পারে না। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে, যদি সে অংশীদার নিয়ে কাজ আরম্ভ করে তবে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়—কাজ শিখে নিয়ে অংশীদার পালায়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে যৌথ কারবারেও বাঙালীর চেষ্টা সফল হয় না। এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় দোষ। কোন গ্রাজুয়েটকে অংশীদার হবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি আগে বলেন—'কত মাহিনা

দিতে পার?' বাঁধা মাহিনা আমাদের চাইই। কাউকে যদি বলা যায়—৫০৲ মাহিনা দিব আর সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খাটতে হবে—সে একেবারে মহা খুশী হয়ে যায়। ঘড়ি ধ'রে ১২ ঘণ্টা কলের মত কাজ করে যায়। কিন্তু এমনি ক'রে চাকরিকে আঁকড়ে না ধরে যদি সে প্রথম কয়টা বৎসর কোন ইংরেজ, মাড়োয়ারী বা বাঙালীর দোকানে শিক্ষানবিশী করে এবং বাজার ঘুরে নানা তথ্য সংগ্রহ করে, তবে ভবিষ্যতে সে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বেশ কাজের লোক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম পয়সা কড়ি হয়ত আসবে না। কিন্তু বি এ, বা এম এ, ও তৎপরে বি এল, পাশ করতে যে ৬।৭ বৎসর সময় লাগে সে সময়েও ত ছেলে বাড়ীর খায়, আর বাড়ীর টাকা খরচ করে পড়াশুনা করে। এখন ডিগ্রীর প্রভাবে যখন অতি সামান্য চাকরি ছাড়া আর কিছু মেলে না, তখন ম্যাট্রিকুলেশনের পর বাড়ীর খেয়ে ছেলে ত ২।৩ বৎসর ইউনিভার্সিটিতে না গিয়ে কলকতার ক্যানিং ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার প্রভৃতি স্থানে একটা নূতন শিক্ষা লাভ করতে পারে। তবে এই শিক্ষা পাবার সুবিধা করতে হ'লে কোনো দোকানে শিক্ষানবীশ হয়ে প্রবেশ করতে হয়। এইরূপ প্রবেশ লাভের সুবিধার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা উচিত। ভবিষ্যতে এসব চেষ্টার সার্থকতা আছেই।

আমরা একে ত মিলেমিশে কাজ করতে পারি না, তার উপর আমাদের অনেকে প্রথম উদ্যমে ব্যবসায়ে প্রবেশ ক'রে অল্পদিনের মধ্যে সফলতা লাভের জন্য অধীর হয়ে উঠেন। আর যদি প্রথমে কিছু লোকসান হয় ত অমনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে হা চাকরি হা চাকরি ক'রে বেড়ান। কিন্তু স্থিরভাবে লেগে থাকতে না পারলে ব্যবসা-ক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। তাঁরা বোঝেন না যে লোকসান দিয়ে তাঁরা বরং দক্ষ হলেন। আসল মাঝি সেই, যে পদ্মা পার হয়েছে, মাথার উপর দিয়ে যার অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে। ঝড়-ঝাপটা না পোহালে কোন কাজই হয় না। কাজ আরম্ভ করবে, আর 'আপ্‌সে' অবাধে সহজে সিদ্ধিলাভ হবে, এসব মূর্খের সুখস্বপ্নমাত্র। হতাশ হওয়া একেবারেই ঠিক নয়। তোমরা হতাশ হয়ো না—তাহলেই লোকসান যাকে বলছ তার মধ্যে লাভ দেখতে পাবে!

পাঁচবার ধাক্কা খেয়ে তবেই শিক্ষালাভ হয়। আবার আমরা যদি একবার শুনি, অমুক ব্যবসায়ে অমুক খুব লাভবান হয়েছে অমনি যে যেখানে আছি সকলেই ছুট দিই সেই দিকে। যেন সেই ব্যবসাটা না করলে আর লাভ হবে না। আবার অনেকে এক জায়গায় কিছুদিন কাজ শিখে বলেন ভাল লাগে না—অমনি আর একটা ধরতে যান। এমনি ক'রে এটা নয় ওটা করতে করতে শেষে বাঁধা পড়তে হয় সেই চাকরির খোঁটায়। তাই বলি বিবেচনা ক'রে একটা দিক ঠিক করে ধর, আর সেই দিকেই লেগে থাক। অনেক অসুবিধা হবে, অনেক আশাভঙ্গ হবে। কিন্তু আন্তরিক চেষ্টার ফলে শেষে সব শ্রম সার্থক হয়ে উঠবে।

শিক্ষানবিশীর কথা অনেকবারই বলেছি। আর একটা কথা সেই সঙ্গে বলতে চাই—সেটা হচ্ছে শ্রমের মর্য্যাদা। এই জ্ঞানটা আমাদের বড় কম। 'পরিশ্রম করলেই ছোটলোক হল' এরূপ একটা ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমি সেই যুবকটিকে ধন্যবাদ দিই যিনি বলেন কুলীগিরি করব ;—এঁর বাহাদুরী আছে। 'বসে খাব' বা কারও স্কন্ধে চেপে খাব এ বড় লজ্জার কথা—বড় জঘন্য কথা। এরূপ লোককে কিছু বললে রাগ করবেন, কারণ কাজ করতে হলে এদের মানের লাঘব হয়। কিন্তু 'বসে খাব'—এই চিন্তার স্থানে 'করে খাব'—এই চিন্তাই ভাল। ইউরোপ শ্রমের মর্য্যাদা বোঝে। বাইবেলে আছে—"You shall not eat except by the sweat of your brow." মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পরিশ্রম করে, ভোগে অধিকার তারই আছে। যে অলস, যে পর-ভাগ্যোপজীবী—তার বেঁচে থাকবার অর্থ নেই। যে কেউ সৎপথে থেকে আপন পরিশ্রমে আপনি উপার্জ্জন করে, সেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র—সে ছোটলোক নয়—ভদ্রশ্রেষ্ঠ—এই কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে।

আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে টাকার অভাব তত নয় যত অভাব উপযুক্ত মানুষের। কোন সভাসমিতিতে ভলন্টিয়ারের অভাব হয় না—কিন্তু যথার্থ কষ্টস্বীকার করে যেখানে কাজ করতে হয় সেখানেই আমরা লোকাভাব দেখি। আমাদের উৎসাহ খড়ের আগুনের মত—দপ্ করে জ্বলে ওঠে,

কিন্তু আবার খপ্ করে নিভে যায়। এরূপ ভাবোচ্ছাস কর্ম্মপঙ্গুত্ব আনয়ন করে। স্বদেশীর সময় গোলদীঘির ধারে অনেক ভাবোচ্ছাস হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসার কার্য্যে শিক্ষানবিশী চাই, অক্লান্ত চেষ্টা চাই—ভাবোচ্ছাস কি ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি হতে পারে? ভাবপ্রবণ হও, খুব বড় কল্পনা কর, ভাবুকতার বলে গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেল, নূতন পথে এগিয়ে চল কিন্তু দেখো পঙ্গু ভাবুক হয়ো না;—ভাবকে কর্ম্মে আকার দাও—কর্ম্মে ভাবের প্রতিষ্ঠা কর। চরিত্রবান হও। বাঙালী বড় অলস, সুখ চায়। কিন্তু সুখ খুঁজলেই কি আর সুখ মিলবে? অলসতা ও সুখপ্রবণতাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা। এসব ত্যাগ করে আমাদের এখন একনিষ্ঠ সাধনা করতে হবে—তবেই এ অস্তিত্ব-সঙ্কট থেকে রক্ষার উপায় হবে। আমাদের এখন আত্মবিশ্বাস চাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস চাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া চাই। আমাদের চরিত্রে গলদ কোথায় খুঁজে বার করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে এক একটি দোষ পরিহার করে তার স্থলে গুণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের এখন শ্রমশীল হওয়া চাই, অদম্য উৎসাহ চাই, সাহস ও ধৈর্য্য চাই—মোটের উপর খাঁটি ও শক্ত মানুষ হওয়া চাই। নচেৎ ফিনফিনে ধুতিপরা, পাঞ্জাবীর আস্তীন গায়ে, থলথলে গোলগাল নাদুসনুদুস নন্দদুলাল—এই ধরণের অকেজো পুতুল নিয়ে এই সঙ্কটকালে আমরা কি করব? কঠিন সমস্যা সকলের মীমাংসা করবার ভার আমাদের হাতে—আমাদের কি দুর্ব্বলচিত্ত, চাকরিপ্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হতে হবে, দৃঢ়ব্রত হতে হবে, মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া আজ আমার অন্য কিছু বলবার নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে আমাদের স্পৃহা নেই—প্রবৃত্তি নেই। এই প্রবৃত্তি আগে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই স্পৃহা মনে তীব্র হলে নূতন পথে চলবার সাহস হবে। তাই এত কথা বলছি।

ছাত্র যাঁরা তাঁদের বিশেষ করে বলছি। প্রতিকারের উপায় তাঁদেরই করতে হবে। লেখাপড়া শিখতে বারণ করছি না—লেখাপড়া চাই। লেখাপড়ার অভাবে মাড়োয়ারীর টাকা অন্নছত্র বা পিঞ্জরাপোল ছাড়া দেশের

অন্য কাজে লাগছে না। কিন্তু দেশের অভাব আজ কত বেশী তা কি বলে জানাতে হবে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বড় দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার!
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট!............"

আমার সাধের রসায়নশাস্ত্র চর্চ্চা ফেলে কেন আমি এসব কথা তোমাদের কাছে বলতে এসেছি? আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করবে। যে দেশে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেছেন, গোখলে ও গান্ধীর মত আদর্শ ত্যাগী যে দেশের সন্তান, যে দেশের রামানুজম্ ও পরাঞ্জপ্যের প্রতিভায় আজ পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ, সে দেশের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল আমি বিশ্বাস করি। বাঙলা দেশে আমরা আমাদের অনেক দোষ ও দুর্ব্বলতা পরিহার করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে নানা প্রকারের আলোচনা ও কার্য্য আরম্ভ করেছি—কিন্তু এই অন্ন-সমস্যাই বাঙালীর আশা, উৎসাহ ও স্বাস্থ্যনাশ করে সর্ব্বনাশ করতে বসেছে। তাই তোমাদের বলছি—তোমরা ভাব, বোঝ এবং কাজে লেগে যাও। পৃথিবীতে আমাদেরও দাঁড়াতে হবে—মানুষের মত উচ্চশির হয়ে দাঁড়াতে হবে।

* বক্তৃতাটি 'প্রবাসী' ১৩২৬, চৈত্র সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে এই বক্তৃতা দেন।

অন্ন-সমস্যা ও বাঙালীর নিশ্চেষ্টতা

মহামতি গোখলে একদিন বাঙালীর ললাটে গৌরবটীকা দিয়ে বলেছিলেন,—"What Bengal thinks to-day, the whole of India will think to-morrow"—ভারতবর্ষে বাঙালীই নব নব চিন্তার প্রবর্ত্তক। বাস্তবিক একদিন ছিল, যখন বাঙালী কি ভাবে, বাঙালী কি বলে, বাঙলার চিন্তা কি নূতন সত্য আবিষ্কার করছে, বাঙালী জাতীয় উন্নতির কি নূতন পথ প্রদর্শন করছে, এই সব জানবার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক বাঙলার দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকত। কিন্তু সে গৌরব বাঙালী আজ হারাতে বসেছে। যে ছিল সকলের অগ্রগামী, সে আজ জীবনের নানাবিধ ক্ষেত্রে সকলের পশ্চাতে পড়েছে। ডিগ্রীপ্রিয়, চাকরিপ্রিয় বাঙালী বিলাসের আরাম-শয্যায়, আলস্যের নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন দেখছিল, আজ বড় দুঃখেই তার ঘুম ভাঙ্গছে। বুদ্ধির অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে সে জীবন-সংগ্রামে ফাঁকি দিয়ে এসেছে,—তাই আজ প্রকৃতির এই নির্ম্মম প্রতিশোধ।

প্রথম বয়সে, যৌবনের প্রারম্ভে বাঙালীর ছেলে যখন কলেজে প্রবেশ করে, তখন তার আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত মুখখানি দেখেছি; কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করে সে যখন জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করে, তখন সেই আশার আলো বিষাদের অন্ধকারে ডুবে যায় কেন? সেদিন যে হেসেছিল আজ সে কাঁদে কেন? বাঙ্গালীর অক্ষমতার বোঝা সরিয়ে দিয়ে তার বিষাদের অশ্রুধারা কে আজ মুছিয়ে দেবে? নবীন আশার সঞ্জীবনী বাণী দিয়ে কে আজ তার শৈবালাচ্ছন্ন জীবনস্রোতে নূতন প্রবাহ এনে দেবে?

এই দুঃখ দূর করবার ভার বাঙালী যুবককে আপনিই গ্রহণ করতে হবে। প্রথম লক্ষ্য করতে হবে, বাঙালীর সমাজদেহে কতদূর পর্য্যন্ত অক্ষমতা-ব্যাধি বিস্তার লাভ করেছে। তাহলেই বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা যাবে। তখন বাঙালী যুবক স্পষ্ট বুঝতে পারবে, একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা আত্মচরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন

উপায়েই এ সমস্যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। আজ শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল যাবৎ শিক্ষকতা করে আমি বাঙালী ছাত্রের নাড়ী-নক্ষত্র সবই বুঝেছি এবং জীবন-সংগ্রামে তার এই শোচনীয় পরাজয় লক্ষ্য করেছি। তাই আমি যখনই তাদের লক্ষ্য করে কিছু বলি, তখন সেই একই কথা বলি—তত্ত্বকথা নয়, কাব্যকথা নয়, সেই একই কথা—অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, জীবন-সমস্যা,—কি উপায়ে খেয়ে পরে বেঁচে থেকে সুস্থদেহে বাঙালী যুবক উন্নততর জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করবে। একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ সেদিন দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যাবলী বিচার করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ঐ সভার সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে মান্দ্রাজবাসী আজ সকলের অগ্রণী, বোম্বাই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছেন এবং বাঙালী তৃতীয় ও সর্বনিম্নে পড়ে রয়েছেন। এই ব্যাপারের সঙ্গে মহামতি গোখলের বাঙালীর সম্বন্ধে উক্তি তুলনা করে বাঙালীর অবনতির বিষয় উপলব্ধি করুন। বাঙলার সে গৌরব-রবি আজ মেঘাচ্ছন্ন না চিরতরে অস্তমিত ?

তারপর জীবন-সংগ্রামের এক একটি প্রধান দিক লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালী সকল দিকের সকল ক্ষেত্র হতে পরাজিত হয়ে পশ্চাৎপদ হচ্ছে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ধরে উন্নতির সকল প্রকার পথ হতে বিতাড়িত হলে, অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হতে বাঙালীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এরূপ আশঙ্কা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষ যদি খেতে না পায়, পরতে না পায়, রোগজীর্ণ দুর্ব্বল দেহে যদি স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেক দিন ধরে আস্বাদ না করে, যুবকের মুখের হাসি না ফুটতেই যদি মিলিয়ে যায়, তবে বিষাদক্লিষ্ট দেহভার সে আর কতদিন বহন করতে পারবে ? তাই আজ বাঙলার চারিদিকে হাহাকার। এই দেশব্যাপী করুণ আর্ত্তনাদেও যদি বাঙালী যুবকের মোহ না ঘুচে, এই ঘোর দুর্দ্দিনেও যদি সে ডিগ্রী ও চাকরির মায়ায় এবং উৎকট ভোগের অনাচারে মজে থাকে, তবে তার সে দুর্ভাগ্য বর্ণনা অপেক্ষা নীরব অনুভূতির দ্বারা সমধিক বুঝতে পারা যাবে।

ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে বাঙালী একরূপ সুখে ছিল। গোলাভরা ধান,

গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, ঘরে ঘরে চরকা—বাঙালীর অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ ছিল না। তখন বাঙালী ছিল বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য—জীবন-সংগ্রামে কঠিন প্রতিযোগিতার প্রবল আঘাত তখন বাঙলায় লাগে নাই। তারপর অবস্থার পরিবর্ত্তন হতে লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী আপন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করতে পারল না। সেই যে পরাজয় আরম্ভ হল, আজও সেই পরাজয়েরই পালা চলছে। দেশে রেলপথ বিস্তৃত হল, বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হল, বাঙালী কৃষকদের দেহের রক্ত জল করে উৎপন্ন-করা ফসলে বিদেশী বণিক প্রচুর অর্থলাভ করে সম্পদে স্ফীত হয়ে উঠল। আর বাঙালী অবাক বিস্ময়ে আপন শোচনীয় অধঃপতনকে বিধিলিপি বলে স্বীকার করে নিয়ে, মুখটি বুজে, হাতটি গুটিয়ে চুপ করে রইলো। তার পর অন্নপূর্ণার দেশে হল অন্নাভাব। আজ শুধু কলকাতায় নয়, পল্লীগ্রামেও খাঁটি দুধের সের অনেক সময় আট আনা, আজ মাছ বলে আমরা যা খাই, তাতে বস্তুত কিছুই নেই, হোমিওপ্যাথিক মাপে খাওয়া, সে কেবল মনকে প্রবোধ দেবার জন্য। কোন রকমে ঘাসপাতা খেয়ে আজ আমরা জীবন ধারণ করছি—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কোনমতে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সমর্থ হচ্ছি না—আর আমাদের দুর্গতির সকল দোষ আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলছি—"ইংরেজ এই সুজলা সুফলা বাঙলা দেশের ধনধান্য লুটে নিয়ে যাচ্ছে।"

আজকাল রব উঠেছে—বিহার বিহারীদের, আসাম আসামীদের, উড়িষ্যা উড়িয়াদের। কিন্তু বাঙলা সকলের—সকলেরই জন্য বাঙালী ঘরের দ্বার খুলে দিয়ে দিব্য আরামশয্যায় পড়ে আছে, কেন না, বাঙালী বড় পারমার্থিক জাতি, বিশ্বকে আপন করতে চায়, তা সে জন্য যদি অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়, সেও স্বীকার। বাঙলার দ্বার সব সময়েই খোলা। কলকাতায় চৌরঙ্গী, একস্‌চেঞ্জ যে স্থানেই যাবেন, দেখবেন, আমরা পুরাকালের দধীচি মুনির মত কেমন নিঃস্বার্থভাবে নিজের অস্থি পরোপকারায় অকাতরে দান করছি। রেলী, গ্রাহাম, গিলিনডারস, টারনার মরিসন প্রভৃতি বিদেশী বণিকের উপকারার্থ আমরা অম্লান বদনে,

সকল লজ্জার পারে গিয়ে কেরাণীগিরি করছি। আবার আর একদিকে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া. দিল্লীওয়ালা ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্য অন্য ক্ষেত্র করতলগত করছে—আমরা তাদের হিসাব লিখে, মাস-মাহিনা নিয়ে পরমানন্দে পান চিবিয়ে কলম পিষছি—আর অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কারের ডাকে আকাশ ফাটিয়ে বলছি,—হুঁ, ওরা ছাতুখোর, খোট্টা, অসভ্য!" ঠিক কথাই ত! যারা আপন পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অক্লান্ত চেষ্টায় বিপুল ধনের অধীশ্বর হচ্ছে—তারা ত অসভ্য বটেই; পরন্তু যারা ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরে, পাম্পস্থ পায়ে দিয়ে, মাথায় টেরী বাগিয়ে তাদের ফারমে ২৫।৩০।৪০ টাকা মাহিনায় চাকরি করছেন, তাঁরা সভ্য বটেনই —বাবু বটেনই! বড়বাজার ত মাড়োয়ারীর একচেটিয়া হয়েছে—এদিকে হ্যারিসন রোডের দুই পার্শ্বের বাঙালীটোলা মাড়োয়ারীর হস্তগত হয়েছে; —ক্রমশঃ কলকাতার অন্যান্য স্থানও তাদের হস্তগত হচ্ছে। বাবুকে কাবু হয়ে এবার যে বড় বড় ভাড়াটিয়া বাড়ীর এক এক অংশে পায়রার খোপের মত ২।৩টি ছোট ছোট ঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিতে হবে, সে ভাবনা সভ্যবাবু ভাবছেন কি?

কেরানীর ত এই দশা। বাঙালী শ্রমজীবীর দশাও কিছু ভাল নয়। প্রায় ৫০ বৎসর হতে দেখে আসছি, প্লামবার (Plumber) সব উড়িয়া; জল, ড্রেন, গ্যাসের কার্য্য এরাই করে। পাচক "ব্রাহ্মণ" হয় উড়িয়া, নয় ত হিন্দুস্থানী। পল্লীগ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে দেখেছি উড়িয়া "বামুন" ও হিন্দুস্থানী "বেয়ারা"। বাঙলা দেশের ধনধান্য কি এতই অপর্য্যাপ্ত, প্রত্যেক বাড়ীতেই কি মাটীতে লোহার সিন্ধুক প্রোথিত, অন্নভাবের কি এতই অভাব যে, বাঙালীর কারও মুটে, মজুর, বেহারা হবার দরকার নেই?

৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখেছি, জুতা ব্যবসায়ী চীনারা বেন্টিক ষ্ট্রীট দখল করেছে। এখন দেখছি, লালবাজার, ফৌজদারী বালাখানা প্রভৃতি স্থানও তারা অধিকার করেছে। জুতা ব্যবসায়ী প্রায় সবই চীনা; এক আধ জন ভারতীয় অবাঙালী। আবার কলকাতায় ও মফঃস্বলের সহরে ছুতারের কাজ চীনারা একচেটিয়া করে নিয়েছে, আর বাঙালী

ছুতার একবারে "জাত-ব্যবসা" ত্যাগ করছে। বাঙালী ছুতার আজ প্রায় নিরন্ন। চীনা ছুতারের অনেক গুণ, তারা ফাঁকি দেয় না—তাদের উপর কাজের ভার দিয়ে ভরসা পাওয়া যায়। দৃষ্টির আড়াল করলে এরা হাত গুটিয়ে হুঁকা নিয়ে ফাঁকির আসর জমায় না। চীনাদের মজুরী বেশী, কিন্তু সস্তার তিন অবস্থা দেখে লোক বেশী মজুরী দিয়েও তাদের কাজ দেয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙলায় বড় বড় কাজ চীনা ছুতার কনট্রাক্ট নিচ্ছে। তারা সমবেত হয়ে কাজ করে আপন আপন অবস্থার উন্নতি করছে। বাঙালী ঝগড়া করতে জানে, সমবেত হতে জানে না—কাজেই হটে যাচ্ছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলকাতার সব কাঠের গোলার মালিক ছিল বাঙালী ; এখন চাঁপাতলা অঞ্চলে গিয়ে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়, চীনা মিস্ত্রী কাঠের গোলার মালিক হয়েছে। আর তাদেরই সাবেক মনিবগণ সেই সব গোলায় কেরানীর কাজ করছে। এই অশিক্ষিত চীনারা পিকিং, হ্যানকিন, ক্যান্টন হতে বিনা মূলধনে এদেশে এসে আমাদের মুখের অন্ন গ্রাস করছে, আর আমরা চক্ষু মুদে বসে ধ্যানস্থ হয়ে আছি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অন্য জাতি প্রবেশ লাভ করে সব অধিকার করে নিচ্ছে, আর আমরা তিল তিল করে মরণের পথে অগ্রসর হচ্ছি। চীনারা আমাদের ভাষা জানে না, কথা বুঝে না, অথচ বাঙলার কেন্দ্রস্থলে এসে বড় বড় কাঠের ব্যবসা গড়ে তুলছে, আর আমরা একেবারে চুপ, যেন জড়ভরত।

রেল-ষ্টেশনে, ষ্টীমার-ঘাটে, কুলী, মজুর সবই হিন্দুস্থানী। রেল-ষ্টেশন হতে আধ ক্রোশের মধ্যেই বাঙালীর গ্রাম আছে। ইচ্ছা করলে ট্রেনের বাঁশী শুনে ষ্টেশনে এসে মাল উঠানামা করে বাঙালী চাষী অক্লেশে দৈনিক আট আনা উপার্জ্জন করতে পারে। কিন্তু তারা জমির মালিক ; তারা কি এই ঘৃণিত কুলীগিরি করতে পারে? এতে যে ইজ্জত নষ্ট হবে! এদিকে দারিদ্র্যের ত শেষ নেই,—ঋণে ডুবু ডুবু ;—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলে দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, মহামারী ত চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রেল-ষ্টেশনের ধারে ধারে হিন্দুস্থানীদের উপনিবেশ হয়েছে। তারা খেটেখুটে দু পয়সা উপার্জ্জন করছে।

এইরূপ আলস্য ও শ্রমবিমুখতা আমাদের সকল দুর্গতির কারণ। শ্রমের মর্য্যাদাজ্ঞান আমাদের আদৌ নেই বললেই চলে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে কোন কার্য্যোপলক্ষে আমতার নিকটস্থ কোন গ্রামে যেতে হয়েছিল। গন্তব্য স্থান রেল-ষ্টেশন হতে কয়েক ক্রোশ দূরে। বৃষ্টি হয়েছে, অনেক কষ্টে পাল্কী জুটল ত বেহারা জুটল না। সে স্থানে গরীব চাষীর ত অভাব নেই; কিন্তু দিন গুজরাণ অসাধ্য হলেও পাল্কীবহা! সে কি হয়? সে যে অসাধ্য! মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেও দেখতে পাই, কোথাও কোথাও একটা ইলিশ মাছ কিনে মুটে খুঁজেন কিংবা সন্ধ্যার আঁধারে এদিক ওদিক করে লুকিয়ে আনেন—যেন চুরি করছেন। আত্ম-মর্য্যাদা সম্বন্ধে এই বিষময় ধারণা আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

এদিকে বড় সাধের কেরানীগিরিও যেতে বসেছে। মান্দ্রাজী এসে বাঙ্গালীর স্থান দখল করছেন। বাঙ্গালী যায় কোথায়? নিরামিষাশী মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ ভাতের সঙ্গে একটু তেঁতুলজল পেলেই খুসী—আর চাকরিতেও—বাঙ্গালীর তুলনায় কম মাহিনায় কাজ করতে পারেন—আর তাঁদের বাসা—চ্যাটাইঘেরা বারান্দায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর হটে যাবার লক্ষণ সপ্রকাশ হয়েছে।

আমাদের যুবকরা ডিগ্রী ও চাকরির মোহ ছাড়িয়ে উঠতে না পারলে এ দুর্দ্দশার অন্ত নেই। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি ব্যবসা ও শ্রমের মর্য্যাদা বুঝেন এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে একত্র সম্মিলিত হয়ে দাঁড়াতে শিখেন, তবে তাঁদের উদাহরণ দেখে অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল গুণের আদর করতে শিখবে। তাঁদের বিলাসের বীজ আজ সমাজের নিম্নস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে;—চাষী আজ রেলী গ্রাহামের মিহি কাপড় খুঁজে, মোটা কাপড় আর পরতে পারে না, তার কারণ, সমাজের উচ্চ স্তরের লোকরা সৌখীন ও বিলাসী হয়ে উঠেছেন। আমি শিক্ষক বটে, কিন্তু ব্যবসায়ীর নিকট ব্যবসায়ী। ৭।৮টি ব্যবসায় ব্যাপারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কৃতী স্যর রাজেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণের সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার আলোচনা করে

তাঁদের এই মত জেনেছি যে, জাতীয় চরিত্রের দোষক্রটি সংশোধিত না হলে আমাদের অন্ন-সমস্যা দূর হবার কোন আশা নেই।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীরাও অতি সামান্য কার্য্য হতে ব্যবসায় শিক্ষা করেছেন। কার্ণেগী প্রথম ছিলেন Telegraph boy. ব্যবসায় হতে তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁর কারবার ক্রয় করবার জন্য ৯০ কোটি টাকা মূলধনের একটা Syndicate বা সঙ্ঘ গড়তে হয়েছিল। Empire of Business (ব্যবসায় সাম্রাজ্য) নামক তাঁর একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সেই পুস্তকের এক স্থানে তিনি বলেছেন,—"ব্যবসায় শিক্ষা করতে হলে আফিস ঝাঁট দেওয়া হতে আরম্ভ করতে হবে।" শিক্ষাভিমানী, বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালী যুবককে এ কথা বললে তাঁর যে-সৌখীন প্রাণটি বিধাতা শুধু 'দখিণ হাওয়ায় দোদুল' দোলবার জন্য গড়েছেন, সেই প্রাণটি আঘাতে শিউরে উঠবে? ক্রমাগত ব্যবসায়ের কথা প্রচার করায় অনেকে অভিযোগ করেন যে, আমি দেশের যুবকদের মাড়োয়ারী হতে উপদেশ দিচ্ছি। আমি নিতান্ত গণ্ডমূর্খ নহি, এখনও সকালবেলা ৯টা হতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমাকে বিজ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত থাকতে হয়। আমি "লেখাপড়া ছেড়ে দাও" একথা কদাচ বলি না। আমি বলি, শিক্ষিত হও—কিন্তু ডিগ্রী ও চাকরির ব্যাধিমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা সংস্থানের উপায় নির্ধারণ কর।

Empire of Business নামক পুস্তকে বারংবার একটি কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়,—শিক্ষার্থীকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সর্ব্বনিম্ন স্তর হতে আরম্ভ করতে হবে। হীনতা স্বীকার করে সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করে কৃতিত্ব অর্জ্জনের প্রয়াস আমাদের যুবকগণের মধ্যে দেখা যায় না। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে আমাদের যুবকগণ এক মাস বা দেড় মাসে সকল দিকে একবার তাড়াতাড়ি দৃষ্টিপাত করে বলেন, "সব শিখে নিয়েছি—এইবার টেবিল, চেয়ার ও বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া দিয়ে আমাকে একটা বিভাগের কর্ত্তা করে দিন। আমি হ্যাট, কোট, টাই এঁটে একবার কাজে লেগে যাই।" এইরূপ ধৈর্য্যহীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সকলেই কল্পনা করতে পারেন।

ইংরেজীতে ফার্ষ্ট ক্লাস এম এ—সেক্সপীয়র, মিল্টনের গৎ আওড়াতে

পটু—মাড়োয়ারীর দোকানে কেরানী হয়ে তার নাগরীর তর্জ্জমা করছেন। তাই বলি, ঘোড়া বেকুব না সওয়ার বেকুব? বুদ্ধিমান কে? যে চালায়, না যে চলে? রামযশ আগরওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা হলে কথাবার্ত্তা হল হিন্দী ভাষায়। তিনি প্রথমে সামান্য ফেরিওয়ালা ছিলেন, তারপর মুদীর দোকান করেন। এখন তিনি ক্রোড়পতি—বড় বড় কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী। শীতলপ্রসাদ খড়্গপ্রসাদ বারাণসীর রাজা মোতিচাঁদের ফারমের এত বড় ব্যাঙ্কার যে, এক টুকরা তুলট কাগজের কোণ ছিঁড়ে একটু লিখে দিলেই সেই দেবনাগরী অক্ষরে অদ্ভুত লিখার জোরে চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক হতে টাকা মিলে। এত বড় অর্থ-প্রতিষ্ঠান যাঁরা চালিয়ে আসছেন, বুদ্ধিমত্তা তাঁদের নয়, আর বুদ্ধি তাঁদের যাঁরা পাশ করে উপবাস দিচ্ছেন।

আমরা দোকান করে ফেল মারি। কেউ কারও অংশীদার হয়ে ব্যবসা করতে জানি না; এরূপ ব্যবসা আরম্ভ করলেই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করি। আর তিন মাস অসুখ হলে বা অন্য কারণে চক্ষুর আড়ালে থাকলে অংশীদারকে দিব্য ফাঁকি দিয়ে ফেলি; ধর্ম্মবুদ্ধি, ন্যায়বুদ্ধি তখন রসাতলে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর বাস্তবিক আমরা যে বুদ্ধির বড়াই করি, সে কেবল পাশ-করা বুদ্ধি—তার মধ্যে প্রীতি উদারতা, আত্মবিশ্বাস কিছুই নেই; সে কেমন একটা বিশ্রী ধার—যা কেটে খণ্ড খণ্ড করতে পারে, কিন্তু যুক্ত করে গড়তে পারে না। আর আমরা অনুকম্পাবশে যাদের নির্ব্বুদ্ধি বলে থাকি সেই ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, নাখোদা প্রভৃতি ইংলণ্ড, জাপান, নিউইয়র্ক, উগাণ্ডা, কেনিয়া ও অন্যান্য স্থানে যৌথ-ভাবে ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপন করে ক্রোড় ক্রোড় টাকা উপার্জ্জন করে ঘরে আনেন। ছাতুখোর এঁরা, আর আমরা সব মাথাওয়ালা! আমাদের মগজে ঘি আর এঁদের মগজ গোবরভরা! হায় হায়, এ ভুল কবে কাটবে?

প্রকৃত কথা, কেতাবী বুদ্ধির দৌড় কতটুকু, তা আমি অনেকদিন হতেই বলে আসছি। ভূগোল জানতে হবে না, ইতিহাসের প্রয়োজন নেই—অবাধে গ্রাজুয়েট হওয়া চলবে। বিজ্ঞানের গোড়ার কথা না

জেনেই ফার্ষ্ট ক্লাশ এম এ হওয়া আটকাবে না। এমনও দেখেছি, নূতন নিয়মে I. C. S. পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু Italian War of Independence (ইটালীর স্বাধীনতা সমর) অথবা American Civil War (আমেরিকার অন্তর্বিদ্রোহ) সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ! একটু ভট্টি, একটু Paradise Lost ঠুকরে, আর মল্লিনাথ, তারাকুমারের স্মরণ নিয়ে যে বিদ্যা হয়, তার কাছে স্বয়ং মা সরস্বতীকেও বুঝি হার মানতে হয়! ভারতে যাঁরা রাজ্য গঠন করেছেন, সেই আকবর, শিবাজী, হায়দার আলি, রণজিৎ সিংহ—কেউ কেতাবী বিদ্যার ধার ধারতেন না—প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কীৰ্ত্তিকথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে। মন্ত্রীদের সাহায্যে আকবর সেনা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির কি অদ্ভুত সুবন্দোবস্ত করেছিলেন, তা আজ সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। আকবর নিজে বিহঙ্গ-তত্ত্বের অনুশীলনে আনন্দ অনুভব করতেন। আমাদের দেশে অনেক মহিলার প্রতিভার কথা বিশ্ব-বিশ্রুত। কিন্তু এঁরাও পুঁথিগত বিদ্যায় বিদুষী ছিলেন না। বই না পড়েও যে আত্মোন্নতি করা সম্ভব, তা অহল্যাবাই, রাণী ভবানী, ভূপালের বেগম প্রভৃতির জীবনকথা হতে জানা যায়। ভূপাল রাজ্যে মহিলারা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হন, একথা কোবিদ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি তাঁর Subjection of Women নামক গ্রন্থে একথার উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, তাঁরা অসাধারণ প্রতিভা সহকারে রাজ্যশাসন করছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর কোথাও একটা মস্ত বড় গলদ রয়ে গিয়েছে। পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালী ছাত্র যাহা শিখে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশগুণ শিখা উচিত। 'সিলেবাস'-এ (syllabus-এ) নাই, পরীক্ষায় কাজে লাগবে না; অতএব পড়ব না—এই একটা ভয়ানক ব্যাধি। জ্ঞানার্জন হউক বা না হউক, শুধু পাশ করতে পারলেই হল। আর মুখস্থ কণ্ঠস্থ করে পাশ করবার বিস্তৃত আয়োজনে ব্যাপকভাবে বুদ্ধির বিকাশ হবার অবসর হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে পাশকরা বুদ্ধি প্রায়ই "অকেজো" হয়ে দাঁড়ায়। বাবু সুন্দরমল গিরিডি অঞ্চলে খুব বড় অভ্র

খনির মালিক। এঁর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস-সি পাশকরা ছেলেরা Chemist Babu (কেমিস্ট বাবু) হয়ে নকরি করতে যাবেন। সুন্দরমল Chemistry (রসায়ন শাস্ত্র) বা Geologyর (ভূতত্ত্ব) ধার ধারেন না। কিন্তু এঁদের "কেজো" বুদ্ধি এমনই চমৎকার, বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধি করবার শক্তি এতই সুপরিস্ফুট যে, কোথায় কিরূপ অভ্র পাওয়া যাবে সহজেই বুঝতে পারেন এবং সেই সমস্ত স্থান মৌরসী নিয়ে অভ্রের খনির কার্য্য আরম্ভ করেন। আমাদের পাশকরা ছেলেদের কখনও এই সমস্ত বিষয়ে বুদ্ধি খুলে না। তাঁরা চলতি কারবারে চাকরি করতেই জানেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা বি এ পড়েন, তাঁদের বৎসরে ৬ মাস ছুটী, আর যাঁরা বি এ-র পরে অন্য পড়া পড়ছেন, তাঁদের ছুটী ৭ মাস। এই ছুটীর মাসগুলি ছাত্ররা দেশে গিয়ে কি ভাবে কাটিয়ে দেয়, আমি সন্ধানী লোক রেখে তার সকল সংবাদ সংগ্রহ করেছি। এই সব ছাত্রের দিন যাপন করবার প্রধান অবলম্বন তাস, পাশা, দাবা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা আর ইচ্ছামত দিনের বেলা ঘুম; আড্ডার অতি সুবিস্তৃত আয়োজন। একজন সবল সুস্থ যুবক যে কেমন করে বহুমূল্য সময় এইরূপে নষ্ট করে, তা আমার বোধগম্য নয়। ৬০ বৎসর বয়সের আফিমখোর সম্বন্ধে এই দিবানিদ্রা সত্য হতে পারে। কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান এই দিবালোকে বলিষ্ঠ যুবক চক্ষু মুদ্রিত করে অন্ধকারের সৃষ্টি করে, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! কত কাজ করবার আছে ঐ পল্লীগ্রামে, কত নিরক্ষরতা, কত অস্বাস্থ্য, কত অজ্ঞতা, উন্নতিশীল চলন্ত জাতিসমূহের কত পশ্চাতে কোন্ অন্ধকারে অবস্থান, —তবুও শিক্ষিত সম্প্রদায় এই হতভাগ্য জাতির সেবায় পরাঙ্মুখ; আপন দেশভাইকে ভাই বলতে, ভালবাসতে পারে না। প্রাসাদোপম হোষ্টেলের আড্ডা, থিয়েটার, বায়স্কোপ আর পাশের নেশা দেশের শিক্ষিত যুবকের মধ্যে কি যে বিষম বিষ ঢেলে দিচ্ছে, কে তার সম্যক উপলব্ধি করে? এই অভিশপ্ত জাতির উদ্ধার-চেষ্টায় পল্লীই যে আমাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, শিক্ষাভিমানী বিলাসী যুবক কবে সে কথা অকপটে গ্রহণ করে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন?

ইংরেজ বালক মাতৃ-ক্রোড়েই কত কথা শিখে! তার পর স্কুলকলেজে

তার জ্ঞানস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভ্রমণকাহিনী, বীরত্বকাহিনী প্রভৃতি পাঠ করে তার চিত্ত প্রসার লাভ করে। মাঙ্গোপার্ক, লিভিংস্টোন প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পর্য্যটকের আফ্রিকা ভ্রমণের কথা, রবিনসন ক্রুশোর অসমসাহসিকতার বিবরণ পাঠ করে, বাল্যকালেই তার চিত্তবৃত্তিসকল একটা গতি পায় এবং বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে বালকের মনও যেন আনন্দহীনতায় অসাড় হয়ে পড়ছে। এই ত সেদিন হিমালয়ের দুরধিগম্য শৃঙ্গে আরোহণ করবার কত চেষ্টা হল; কিন্তু কয়জন যুবক তার রীতিমত সংবাদ রাখে? এই সেদিন কয়জন বিমানচারী কলকাতা হতে রেঙ্গুন যাত্রা করে পথিমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কি দশা হয়েছে, তার সংবাদ জানতে কয়জন যুবক কৌতূহলী হয়েছিলেন? আমাদের জীবনটা যেন দিনগত পাপক্ষয়। অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার বা অচেনাকে চেনবার উল্লাস আমাদের কোথায়? শুধু আলস্যের আরাম-শয্যায় শয়ন করে আমরা পদে পদে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননা করছি।

ফাঁকি দিয়ে পাশ করলে শুধু ফাঁকে পড়া ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে? ডাক্তার জনসন্ কত বড় পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু পাঠাগারে তাঁর শিক্ষণ—এক একটা লাইব্রেরীর সকল পুস্তক তিনি পাঠ করে ফেলতেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, Lightning conductor-এর প্রবর্ত্তক এবং আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন জীবনের প্রথম দশায় একজন বালক মুদ্রাকর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক এডিসন কয়েক মাস মাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মত আবিষ্কারক জগতে খুব কমই আছে। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া "নোট" মুখস্থ করে পাশ করলে বিদ্যার দৌড় আর কতটুকু হবে?

আজ বাঙালীর পরাজয় পদে পদে। বাঙালী কেন পারে না? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—বাঙালী অধ্যবসায়হীন, বাঙালীর মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতা নেই; "উড়ু উড়ু" মন—কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহা সাধন করবার জন্য বাঙালী দৃঢ়ভাবে "লেগে পড়ে" থাকতে পারে না। আজকাল কলেজের ছাত্রদের যদি জিজ্ঞাসা করি,—"ওহে ল (আইন) পড়ছ না কি?" অমনই

কৈফিয়তের সুরে উত্তর হয়—"আজ্ঞে হাঁ,—পড়ছি, কিন্তু ওকালতি করবো না।" "দু'মনা" হয়ে এইভাবে চলবার অভ্যাসে প্রথম বয়সের চেষ্টা, উৎসাহ সবই শিথিল হয়ে পড়ে। কিন্তু মাড়োয়ারী প্রথম বয়সের উৎসাহ ও চেষ্টায় কৃতী হয়ে ওঠে। সে অতিবুদ্ধি নয়, তাই তার পশ্চাতে দড়ি-বাঁধা নেই। আবশ্যক হলে তার ঝাড়ু দিতে বা আধ মণ মোট বহন করতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাঙালীবাবুর "প্রেষ্টিজ" জ্ঞানটা খুব টনটনে!

ইংরেজের অফিসের একজন বাঙালী কর্ম্মচারী সেদিন আমাকে তাঁর লজ্জার কথা বলছিলেন। আফিসঘর থেকে একটা জিনিষ স্থানান্তরে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। বেহারা নিকটে নেই, কাজেই তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন; এমন সময় "সাহেব" এসে আস্তিন গুটিয়ে যখন কাজে লাগলেন, প্রেষ্টিজের ধোঁয়া তখন তাঁর চোখের সুমুখ হতে সরে গেল। তিনি লজ্জায় পড়লেন। বাস্তবিক ব্যবসা করে সাফল্যলাভ করতে হলে শ্রমের মর্য্যাদাজ্ঞান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। নিজের হাতে পাল্লা ধরতে হবে। নইলে বেহারা কর্ম্মচারী রেখে নিজে সাক্ষীগোপালের মত বসে থাকলে ব্যর্থতা তার ফল দান করবে। ব্যবসায় শিক্ষা করতে হলে, কার্য্যের খুঁটিনাটি সবই সর্ব্বাগ্রে রীতিমতভাবে জানা চাই। এক লম্ফে কেউ ব্যবসার পরিচালক হয়েছেন, এমন কথা কখনও শুনা যায় নি। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। জীবনে বিফলতা আসেই। বাধা অতিক্রমের চেষ্টাতেই মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে। যে মাঝি ঝড়ের দিনে পদ্মা পার হয় নি, তার পরীক্ষা বাকি আছে। জীবনে যারা ভাঙ্গতে পারে, তারাই গড়তে পারে—সাহস করে যারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, উদ্ধারের পথ তারাই পায়—জয়ী তারাই হয় যারা অনিশ্চিতকে বরণ করে নিতে পারে। আর যারা কেবল আগু-পিছু ভাবে, আর প্রতি পদক্ষেপে নিক্তির ওজনে হিসাব করে লাভক্ষতি খতায়, তারা অচল জড়পিণ্ড হয়ে যায়।

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের Chemical Examiner ডাক্তার হ্যানকিন প্রণীত Mental Limitations of the Expert নামক পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা টোলের পণ্ডিতের মত দুনিয়ার সব বিষয়ে অজ্ঞ। ঘটত্ব-পটত্ব আলোচনায় মগ্ন হয়ে বিশেষজ্ঞ এক গ্রাম থেকে অন্য

গ্রামেই চলে গেলেন—খেয়াল নেই। ফুটন্ত ডালে তৈল ঢেলে শান্ত করবার কৌশল দেখে স্ত্রীকে দেবী ভ্রমে স্তুতি করা পণ্ডিতেই সম্ভব। মধ্যযুগে ইউরোপে Duns Scotus-এর শিষ্যগণ এইরূপ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের Dunce বলা হত। তাঁদের পাণ্ডিত্যের জোরে Dunce কথাটার অর্থের কিছু গোলমাল হয়ে এখন যা দাঁড়িয়েছে, তা গুরুর পক্ষে নিশ্চয়ই তৃপ্তিকর হবে না। কেতাবী বিদ্যাও অনেক সময় এই প্রকার অজ্ঞতার পরিচায়ক হয়ে পড়ে। ছেলেবেলা হতে b-l-a ব্লে মুখস্থ করতে করতে বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে ছাত্র যখন পাশ-করা হয়ে দাঁড়ায়, তখন দেখা যায়, তার কার্য্যকরী বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানটুকু ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

এদেশে সব স্কুলকলেজে ছাত্র আকৃষ্ট করবার জন্য বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—৯৩ জন স্কলারসিপ পেয়েছে, ৫৩ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে—শিক্ষার বিপুল আয়োজন—"আয়-আয়-চলে-আয়, খদ্দের!" তার পর বিদ্যার দৌড় ওই পাশ করা পর্য্যন্ত—পাশ করলেই দীপনির্ব্বাণ—ব্যস্। বৃত্তি-পাওয়া ছেলের তারপর আর কোন খবর পাওয়া যায় না, তার নামও কেউ শুনে না। Senior Wrangler-গণের দুই এক জন ছাড়া অন্য কারও নাম শুনা যায় না। এই সব কৃতী ছাত্রের শতকরা ৯৫ জন স্কুলকলেজে মাষ্টারী করে চুপচাপ জীবন কাটিয়ে দেন—তাঁদের জীবনে গতি বা কর্ম্মের উৎসাহ থাকে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন তাঁর পরীক্ষাগারে পাশকরা ছেলে নিতেন না। হারবার্ট স্পেনসর বলেন যে, উচ্চ অঙ্গের এন্‌জিনিয়ারিং কৌশলের যাঁরা অধিকারী দেখা যায়, তাঁরা কেতাবী বিদ্যার ধার ধারেন না। স্যর বেঞ্জামিন বেকার Forth bridge নির্ম্মাণ করেন। এই পুলটি পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু স্যর বেঞ্জামিন কোন কলেজে রীতিমত এন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করেন নি। যাঁদের বিদ্যা পুঁথিগত, তাঁদের সর্ব্বত্রই initiative (প্ররোচক শক্তির) অভাব—তাঁরা নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে আপন বুদ্ধিবলে কোন কিছু নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন না। সিসিল রোডস বলেন, যাঁরা অক্সফোর্ড কেমব্রিজের উচ্চ ডিগ্রীধারী, তাঁরা babies in financial matters—আর্থিক ব্যাপারে শিশুর মত অজ্ঞ।

এই কেতাবী বিদ্যার বোঝা বহন করে আবহমান কাল সকলকেই যে

এক পথে চলতে হবে, একথার অর্থ কি? বাপ উকিল—অতএব ছেলেকে উকিল হতে হবে; কেন না বাঁধা ঘর আছে—তা সে ছেলের আইন শিক্ষায় রুচি থাকুক আর নাই থাকুক! শিক্ষার মধ্যে এই সব জিদ আর ফরমাইস থাকায় ছাত্রের বৈশিষ্ট্য বা নৈপুণ্য বিকাশের অবসর পায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যত অধিককাল থাকা যায়, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে অকর্ম্মণ্যতা ততই বাড়ে। আমার কাছে কেউ পরামর্শ নিতে এলে আমি প্রথম জিজ্ঞাসা করি, "গ্রাজুয়েট হয়েছ কি না?" যারা গ্রাজুয়েট, তাঁদের বলি, "তোমাদের সকল পথ রুদ্ধ হয়েছে।" ইনকাম ট্যাক্স অফিসে মোটা মাহিয়ানার কয়েকটি চাকরি খালি হওয়ায় ৬।৭ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল। আবার এদিকে Civil Service-এর চার ফেলা হয়েছে—সমস্ত ভারতবর্ষে ১০।১২টি চাকরি—Chance and Probability হিসাব করে দেখলে এই সব চাকরি পাবার সম্ভাবনা এক একজনের পক্ষে কতটুকু? সম্ভাবনা নেই বলে, কোন কলেজ এই সব চাকরিতে মনোনয়ন করবার অধিকার পেলেও কর্ত্তৃপক্ষের আহ্লাদে আটখানা হবার ত কারণ দেখি না।

বাঙলা অবাঙালীর হয়ে গিয়েছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মাড়োয়ারী পাট, তিসি, সরিষা, ধানের দাদন দিতে আরম্ভ করেছে। আর আমাদের পাশ-করা যুবকগণ Civil Service-এর সুখস্বপ্নে খুসী হয়ে আছেন। আবার এই Civil Service-এর ভিতরের কথা জানেন ত? একটা কথা এই স্থানে বলি। খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় Civil Service-এর ফাইল দোরস্ত কাজের নমুনা বেশ পাওয়া গিয়েছে। দুর্ভিক্ষ-তদন্তের হুকুম ম্যাজিষ্ট্রেট হতে নানা প্রভুর মধ্য দিয়ে নিম্নতম পেয়াদায় এসে পৌঁছল। তারপর তথ্য সংগৃহীত হয়ে সরকারী খবর প্রকাশিত হল—দুধ চাহিবামাত্রই পাবে। আর মাছের কথা? —সে ত যথেষ্ট আছে—ধরে খেলেই হয়। File ভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটরা চলেন না—আর ফাইলের মহিমা ত এই! এ হেন Civil Service-এর জবরদস্ত শিক্ষা ছাড়া নাকি কলকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানী করা চলে না। অফিসিয়াল চশমা যাঁর নাকের উপর উঠেছে, তাঁরই কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়—ধরা বাঁধা রাস্তায় চলে বিদ্যাবুদ্ধি বাঁধা পড়ে।

কার্ণেগীর লৌহের ব্যবসা ক্রয় করতে ৯০ কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য যে

সঙ্ঘ গঠিত হয়, মর্গান তার গঠনকর্ত্তা। বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে মর্গান বলেন, "আড়াই শত ডলার মাহিনা দিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের নিকট হতে আড়াই লক্ষ ডলারের কাজ আদায় করতে পারা যায়।" আমাদের দেশেও সুন্দরমল প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ীরা আড়াই শত টাকা মাহিনার বিশেষজ্ঞের দ্বারা কত লক্ষ টাকার যে কাজ করিয়ে থাকেন, তা ঠিক করে বলা যায় না। বিশেষজ্ঞ চলেন, "কলুর চোকঢাকা বলদের মত"; ব্যবসায়ী কলু এঁদের দ্বারাই তৈলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেন। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদি বি ই পাশ করে বিশেষজ্ঞ হতেন, তাহলে মস্ত লোকসান হত। আজ হয় ত তাঁকে একটা জেলার এঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকতে হত। আর প্রমোশনের দরখাস্ত হাতে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে হাঁটাহাঁটি করতে হত। মিষ্টার জে. সি. ব্যানার্জি, রেলওয়ের শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। Associated Press-এর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় প্রথমে হিন্দু হোষ্টেলে সামান্য কাজ করতেন। আজ তাঁর ক্ষমতা এত যে, মধ্যরাত্রিতে বড় লাটকে টেলিফোন করে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। কিন্তু এঁদের কেহই ইউনিভারসিটির বিশেষজ্ঞ নহেন।

পূর্ব্বে বলেছি, অনেকে অভিযোগ করেন, "তবে কি আপনি আমাদের মাড়োয়ারী হতে বল্‌ছেন?" আমি বলি, "না—তা নয়।" ভুল বুঝবার বালাই অনেক। স্যর হিউ এ, স্যর আলেকজাণ্ডার মারে, স্যর এডওয়ার্ড আয়রণসাইড—এঁরা অক্সফোর্ড কেমব্রিজে পড়েন নি বলে কি অশিক্ষিত মাড়োয়ারীর সঙ্গে তুলনীয়? Fiscal Commission-এর সভাপতি হলেন স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। ইনি ক্রোড়পতি কলওয়ালা। কোন বাঙালী Golden Medalist এই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করতে আহূত হয়েছিলেন? এদেশে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর এম এ-র ত অভাব নাই। তবুও ঐ কমিটিতে তাঁদের কেউ বসতে পেলেন না; কিন্তু আমার বন্ধু ঘনশ্যাম দাস বিরলা তার সভ্য হলেন। বোম্বাই-এর মিষ্টার দালাল Reverse Council-এর কুফল সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তার সকলি ফলে গেল, কিন্তু অর্থনীতিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ কয়জন তা বুঝতে পেরেছিলেন? স্যর সাপুরজি

ব্রোচা শেয়ার মার্কেটের হর্তাকর্তা। স্যর জেমসেদজি তাতা নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে বাঙ্গালোরে Institute of Science-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। Chemistry, Geology না জেনেও তাতা অত বড় লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাতার ম্যানেজার বড় লাটের বেতনেরও অনেক বেশী বেতন পেয়ে থাকেন। এঁদের প্রধান পরামর্শদাতা পেরিন বৎসরে দুই তিন মাস এদেশে থেকে আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে যান। যাঁরা এত বড় বড় ব্যবসার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁরা নিজেদের শিক্ষার জন্য নিজেরই উপর নির্ভর করেছিলেন; স্কুলকলেজের নোট বা ইউনিভারসিটির ডিগ্রীর মুখ চেয়ে থাকেন নি।

ভিনিস নগরীর স্বাধীনতা স্থাপিত করেছিল তার বাণিজ্যজীবী সন্তানগণ। ডচ্ সাধারণতন্ত্রের (Dutch Republic) ইতিহাসের মূলে ঐ একই তত্ত্ব আছে। আসল কথা, যে স্থানে স্বাধীন চিন্তা ও অবাধ বাণিজ্যোন্নতি, স্বাধীনতাও তথায় অবশ্যম্ভাবী। হল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক ভাগ সমুদ্র তলের নিম্নদেশে অবস্থিত। বাঁধ বেঁধে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে সেই দেশের লোককে জীবনধারণ করতে হয়। বাণিজ্যজীবী ডাচ্‌রা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম জানে; উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ফিলিপের মত নৃপতির সঙ্গে তারা অবহেলে যুদ্ধ করতে পেরেছিল।

আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। শত অভাবের আনন্দহীনতার মধ্যে বৃহৎ কল্পনা, বৃহৎ আশা জাতির চিত্ত অধিকার করতে পারে না। দেশের আশাস্থল যুবকগণকে গৃহের শত দৈন্যের চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে অকালে উদ্যম উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে হয়—জাতির পক্ষে ইহা কত বড় অকল্যাণ, তা ভাবলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। স্যাড্‌লার বলেছেন, তিনি বাঙালী যুবককে হাসতে দেখেন নি। দারিদ্র্যের মধ্যে আনন্দের হাসি ফুটবে কিরূপে? এদিকে সামাজিক কুপ্রথা ঘাড়ে চেপে বসে আমাদের দিব্য বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমরা একটি ঘোর আধ্যাত্মিক জাতি। রাস্তায় কুষ্ঠরোগী দেখে আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন আমরা তার রোগ-যন্ত্রণাকে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপের ফল বলে চুপ করে থাকি, আর জড়বাদী ইউরোপীয় তাদের জন্য কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করে অশরণের শরণস্থল হয়। তারাই আবার সাঁওতাল

পরগণার অরণ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করে সাঁওতালদের শিক্ষার আলোক দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন, "আমাদের অধ্যাত্মিকতা (Spirituality) অকর্ম্মণ্যতার অজুহাত মাত্র।"

যাক্—নিরাশার কথার আর কাজ নেই। আজ দেশে দিকে দিকে জীবনের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! এ ত যথার্থই আশার কথা। এই প্রসঙ্গে যুবকদের নিকট স্বর্গীয় বরেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করি। ইনি যুবকমাত্র ছিলেন। পিতার বহু চেষ্টা ও তাড়না সত্ত্বেও লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। কিন্তু অল্প বয়সেই বোম্বাই অঞ্চলে কাপড়ের কল স্থাপন করে কৃতী হয়েছিলেন। যুবকগণের মধ্যে এইরূপ লোকের আবির্ভাব দেখলে বাস্তবিকই আশায় বুক ভরে ওঠে। আজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, নূতন আশায় নবীন কর্ম্মোৎসাহে বাঙালীর জীবন ভরে উঠুক, বাঙালী আপন অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পেয়ে, প্রকৃত শিক্ষার বলে আত্মনির্ভরশীল হয়ে, আপন শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনীয়তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলুক।*

* বক্তৃতাটি 'মাসিক বসুমতী' ১৩২৯ ফাল্গুন সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে এই বক্তৃতা দেন।

সমাজ-সমস্যা

এখন ও তখন

আজ আমরা মহাযুগসন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি। ইউরোপীয় মহাসমরের পর শান্তি স্থাপিত হয়ে জগতে একটা নবযুগ আসছে—অনেকেই সেই আশায় উৎফুল্ল হয়েছেন। আমরাও যে আশামুগ্ধ হয়ে এই পরিবর্তনের দিকে চেয়ে দেখছি না এমন নয়। কিন্তু শুধু চেয়ে দেখায় লাভ কোথায় যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে আমরা নবযুগকে বরণ করে নিতে না পারি? তাই আজ বিবেচনা করে দেখতে হবে আমাদের জীবন যেপথে চালিত হয়েছে তা এখন এই সামঞ্জস্য স্থাপনের নূতন উদ্যমপ্রকাশের অনুকূল অথবা প্রতিকূল।

আপনারা স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "সেকাল ও একাল" নামক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ পাঠ করে থাকবেন। সে প্রবন্ধে তিনি নানাদিক থেকে সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করে দেখিয়েছেন। সেকালে ইংরেজী শিক্ষা করবার কি অদ্ভুত চেষ্টা দেখুন;—কখন কবিতা, কখন বা গানের আকারে ইংরেজী শব্দের বাঙলা অর্থ বলিয়ে তখন ছাত্রদের মুখস্থ করান হত; যথা —

পম্‌কিন্ লাউকুমড়ো, কুকুম্বর শশা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, প্লৌমেন চাষা॥

বসু মহাশয়ের "সেকাল ও একাল" থেকে আর একটা বড় মজার কথা উদ্ধৃত কর্‌ছি।—একবার রথের দিন এক সরকার অফিস কামাই করে। পরদিন সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, "কাল আস নি কেন?" সরকার তো ভেবে আকুল। রথের ব্যাপার বুঝিয়ে দেয় কি করে? তারপর বলে উঠল "চার্চ্চ, চার্চ্চ স্যর" (Church)। কিন্তু রথ চার্চ্চের মত হলেও ইটের তৈরী নয়। তাই সে পরক্ষণেই বললে "চার্চ্চ চার্চ্চ স্যর" "Wooden Church" অর্থাৎ কাঠের গির্জ্জা। ক্রমে আরও ব্যাখ্যা, নচেৎ মনের কথা মনেই থেকে যায়! তাই—"Three stories high", "God Almighty (জগন্নাথদেব) sit upon", "Long long rope", "Thousand men catch", "Pull

pull, run away, run away", "হরি বোল, হরি হরি বোল"। দেখুন তবে, সেকালের ইংরেজীনবীশ রথের কোনখানটা বুঝিয়ে দিতে বাকী রাখলেন ? কিন্তু এই 'সেকাল' ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের আগেকার কাল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর যে কাল এল, সেই হচ্ছে বসু মহাশয়ের 'একাল'। কিন্তু তাঁদের একাল আজ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমাদের কাছে পুরাকাল হয়ে গেছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল আমাদের দেশে এক মহা পরিবর্ত্তনের যুগ বললেই চলে। এ যুগে ভাবে চিন্তায় ধর্ম্মে কর্ম্মে নূতন আদর্শের পরিকল্পনায়, দেশে নানা দিকে নূতন স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এ যুগে সামাজিক রাজনৈতিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। দেশ বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছে। আজ তাই "পঞ্চদশ বৎসরে রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি"-র কথা না বলে আমাদের জাতীয় উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে মাত্র দু'এক কথার আলোচনা করছি। ব্যবসায়ী এক বৎসর অন্তর হিসাব-নিকাশ করে নূতন খাতা করেন। জাতির জীবনের হিসাব-নিকাশ এত সহজ ব্যাপার না হলেও ৫০ বৎসর পরে আজ আমরা সকলেই একবার সেই উদ্দেশ্যে চেষ্টিত হয়ে আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছি।

পরিবর্ত্তন অনেক হয়েছে। বড় কথা ছেড়ে প্রথমে এই একটা সাধারণ কথা ধরা যাক। এই ধরুন মহানগরী কলকাতার অবস্থা। তখন কলকাতার রাস্তার দু'ধারে বড় বড় পগার ছিল, সাঁকোর উপর দিয়ে তা পার হতে হত। ধাক্কাধাক্কিতে গাড়ি কোচোয়ান কখন কখন সব একসঙ্গে পগারস্থ হত।—ঘোড়া টেনে তোলা যেত না। আর সে পয়ঃপ্রণালীতে যে জলধারা প্রবাহিত হত, তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে আজকালকার কলকাতাবাসীকে অস্থির হয়ে উঠতে হবে। পিতার কাছে শুনেছি—মেথর তখন গঙ্গায় ময়লা ঢালত। কথা শুনে হয়ত এখন অনেক "সুকেশিনী সামন্তিনী" প্রাতঃস্নানের নামে চমকে উঠবেন। কলের জল তখন সেই প্রথম আরম্ভ হয়েছে। সহরে মহা আন্দোলন পড়ে গেল। নলের মুখে Stop cork চামড়া দেওয়া আছে, তাই গোঁড়া হিন্দুর দল কলের জল ব্যবহার করবেন না বলে মহা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেন। যা হোক কালধর্ম্মে

বাদ-বিচার এমন বদলে গেল, যে আজ তাঁরাই আবার কলের জল বন্ধ হলে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেন, রাগে ফুটে ওঠেন। সেকালে দুচারটা ইংরেজী বুলি জেনে আমলারা বড় বড় কাজ চালিয়ে দিতেন; যে যতগুলি ইংরেজী বাক্য মনে রাখতে পারত তার বিদ্যার দৌড় তত বেশী ধরা হত। কিন্তু একালে এম এ পাশ করা যুবককে চাকরির বাজারে কি বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় তা সকলেই জানেন।

আমরা যে আজ সামাজিক ও আর্থিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ঘূর্ণীর মধ্যে পাক খাচ্ছি, তার সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের মত আর আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নই; আজ এই বাষ্প ও তড়িৎ-শক্তির যুগে, এই রেল, টেলিগ্রাফ ও জাহাজ প্রচলনের দিনে, নানাজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে আমরা আঘাতের পর আঘাত পাচ্ছি। এই ঘাত-প্রতিঘাত এখন চলতেই থাকবে, এর বিরাম নেই। আমরা বেশ শান্তিতে ছিলাম। দেশের মাটিতে সোনা ফলত, আনন্দ ও প্রাচুর্য্যে দিনগুলো বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই কয়েকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী জাতি বুদ্ধি, কৌশল, রাজনীতি, কূটনীতি প্রভৃতি অবলম্বন করে আপনাদের চলন্ত ও ছুটন্ত জীবনের বিপুল চাঞ্চল্য ও অদ্ভুত সঙ্ঘশক্তির উদ্দাম গতিবেগ নিয়ে অতি নির্ম্মমভাবে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমরা এখন ত্রাহি ত্রাহি করে সামলাবার পথ খুঁজছি। এই সামলাবার চেষ্টায় আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত, জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতি ও বিকাশ। সমাজদেহের এক অঙ্গের পরিচালনা হলে মাত্র সেই অঙ্গেরই সৌষ্ঠব হবে; অপরগুলি পঙ্গুত্বে নেমে গিয়ে অসাড় ও অচল হয়ে থাকবে। এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামের দিনে যদি আমাদের চেষ্টা ও উৎসাহ তদনুরূপ ভয়ঙ্কর না হয়, যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ প্রাণ অনন্যকর্ম্মা হয়ে এই মহাসমস্যার মীমাংসায় নিয়োজিত না হয়, তবে পরাজয়ই আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত এবং এ-পরাজয়ের অর্থ জাতির মৃত্যু। পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে বুদ্ধি কৌশল ও প্রাণশক্তির বলে যারা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে, জীবন-সংগ্রামে তারাই টিকে যায়; আর

নূতন নূতন ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যারা অক্ষম হয়, কালে তাদেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভূস্তর খুঁড়ে এমন অনেক অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেছে যাদের বংশধর পৃথিবীতে আর নেই। জীবন-সংগ্রামে টিকতে না পেরে এদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে গিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এমন কতকগুলি আদিম জাতি ছিল, যারা প্রবল ইউরোপীয় জাতির আঘাতে ও আওতায় দুর্ব্বল হ'য়ে ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামও আমাদের পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর কথা; এর ফলাফলের উপর আমাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। সুতরাং আমাদের এখন এমন কর্ণধার চাই যাঁরা সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পাকা হাতে হাল ধরে আমাদের সামাল করে নিয়ে যেতে পারবেন! জাতি সকল দিকেই আগুয়ান হয়ে চলবে—এই তাঁদের মূলমন্ত্র হবে।

একটা লোকহাসানো কথা আছে :—

লঙ্কায় রাবণ মলো।
অহল্যা শোকে ডুবিল॥

কিন্তু এই হাসির কথা আজ পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ যে একটা মহা আবর্ত্তনের সৃষ্টি হয়েছে, সব জাতিই তার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তাই ইউরোপে অন্নাভাব হওয়ায় ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে টান পড়েছে। তাই ইউরোপে যুদ্ধ হল আর ভারতবাসী মারা গেল—সত্য কথা হয়ে গেছে। ভাত-কাপড়ের টানাটানি এমন আর কোনোকালে হয়েছিল কি? Nature abhors vacuum—একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতি রাজ্যে কোথাও যদি একটু বায়ু কোনো উপায়ে নিষ্কাশিত করে দেওয়া যায়, তবে তখনি অপর স্থানের বায়ু এসে তার স্থান পূরণ করে। মানব সমাজ সম্বন্ধেও আজ সেই নিয়ম খাটছে। একের অভাব অন্যে পূরণ করছে। কিন্তু এই পূরণের কাজ যে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নি, যাকে নিজের ঘরের ভাত বাধ্য হয়ে অথবা বুদ্ধির দোষে অপরের মুখে তুলে দিতে হচ্ছে, দুর্দ্দশা আজ তারই। সমস্ত পৃথিবীতে আজ ঘটনাচক্র এমন আশ্চর্য্য বেগে ঘূর্ণ্যমান যে এর ভিতরে অবস্থান করে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে,

বিগত একশত বৎসরে আমরা যে-সব কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে রীতিমত আয়াস স্বীকার করি নি, আজ তা এক বৎসরে সেরে নিতে হবে, নইলে রক্ষা নাই। ম্যাঞ্চেষ্টার আগে ৪০।৫০ কোটি টাকার কাপড় উৎপন্ন করে এ দেশে বিক্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দিত। আজ সেখানে মাত্র ১০।১২ কোটি টাকার কাপড় তৈরী হচ্ছে। অবশিষ্ট অংশের কতটুকুই বা বোম্বাই পূরণ করতে পারছে? ধাক্কা সামলাতে হলে আমাদের এখন একদিনের নোটিশে অনেক কাজ এগিয়ে নিতে হবে।

স্বদেশে বিদেশে এখন শোনা যায় যে—আমাদের একটা জাতীয় জাগরণ হয়েছে। এটা খুব বড় কথা—খুব লম্বা চওড়া কথা। কিন্তু জাগ্রত জাতি মাত্রেই যে সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাপন শক্তি নিয়োজিত করছে আমাদের সে কর্ম্মক্ষেত্র কোথায়? আমরা কি জাগরণের উপযুক্ত কাজ করতে প্রস্তুত আছি? আমরা কি নিজের পায়ে ভর দিয়ে সংসার-পথে নির্ভয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করেছি। অথবা জাগরণের পর শুধু কুম্ভকর্ণের দুর্দ্দশা আমাদের জন্যে গোপনে অপেক্ষা করছে! এ পৃথিবীতে একেবারে বেঁহুস হয়ে আমরা অনেকদিন কাটিয়ে দিয়েছি। বেঁহুসের এ ঘুমভাঙ্গা কি সত্য ঘটনা? এ জাগরণে সত্য আছে—আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কোথায় কতটুকু জেগেছে, এ জনসংঘ কোথায় কি পরিমাণে সাড়া দিয়েছে তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। শুধু—জেগেছি, জেগেছি, বলে চীৎকার ক'রে আত্মপ্রতারণা করলে চলবে না। সক্রেটিস বলেছেন,—কোন বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ করতে হলে—passion, prejudice, sloth—এই তিনটি বর্জ্জন করে অনুসন্ধান আরম্ভ করতে হবে। মনের যে দিকে বিশেষ ঝোঁক, আমাদের চিন্তাপ্রণালী যদি বিচার বিবেচনা না করে সেই ঝোঁকের মুখে প্রবাহিত হয়, যদি আমরা আলস্য ও অন্ধ সংস্কার বর্জ্জন করে আমাদের আলোচনার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত না করি, তবে সকল বিষয়ের অন্তরের সত্যটুকু আমাদের কাছে চিরকাল গোপন থাকবে, আমরা কখনই তা উদ্ঘাটন করে দেখতে সমর্থ হব না। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ভালমন্দ যা কিছু সবই সাবধানে বিশ্লেষণ করে পরিবর্ত্তিত ঘটনা-পরম্পরার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করতে হবে এবং ভবিষ্যতের গতি-নির্দ্দেশ এই সকল বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ—সবদেশে মানুষমাত্রেই আবহমানকাল প্রচলিত প্রথার দাস। সমাজমাত্রই স্থিতিশীল। কিন্তু আমাদের conservatism-এর বিশেষত্ব আছে; পূর্ব্বপুরুষগণ যা করে গেছেন, বর্ত্তমানে লোকে তাই মেনে চলতে ইচ্ছা করে, তা থেকে এক চুল তফাৎ যেতে সাধারণতঃ তার ভরসা হয় না। আমরা কয়েক বৎসর ধরে ঠিক একই পথে চলেছিলাম। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের চিন্তা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি। তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতা তার চিন্তা ও কর্ম্মের সকল রকম উপকরণ নিয়ে এসে সকল দিক থেকে আমাদের ধাক্কা দিলে। সে ধাক্কায় আমরা সাড়া দিলাম। আমাদের ঘুম ভাঙ্গতে আরম্ভ হল। চোখ চেয়ে দেখলাম, সারা জগৎ জুড়ে বিবিধ ঘটনাপুঞ্জ আশ্চর্য্য গতিতে ছুটে চলেছে এবং তার ফলে সব দেশের মানুষের চিন্তায়, কর্ম্মে ও সমাজে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটছে। এই সকল আন্দোলনের তরঙ্গ একে একে আমাদের সমাজের উপর এসে পড়ছে। এখন আমাদের সামলাতে হবে; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। আদালতের মত এরা নোটিশ দিয়ে আসে না, হঠাৎ এসে পড়ে। তাই এখন আমাদের যত শীঘ্র সম্ভব স্থির করে নিতে হবে, পুরাতনের কোনটা আমরা বর্জ্জন করব এবং নূতন থেকে কি কি অর্জ্জন করে নেবো।

হিন্দুর মত খেতে শুতে উঠতে বসতে, জন্মাতে মরতে এমন বাঁধাবাঁধির মধ্যে আর কোনো জাত আছে কিনা জানি না। জন্ম হতে আরম্ভ করে জাতক্রিয়াদি সংস্কার ইত্যাদি ধরে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পরেও কেবল শাস্ত্রের দোহাই। এ কাজ কর, ও কাজ কর, এটা মনু বলেছেন, ওটা যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, এগুলি পরাশর বা বৃহস্পতি আদেশ করেছেন; এখন বারবেলা, তখন কালবেলা; আজ বাহিরে গেলে সর্ব্বনাশ—কারণ ওই রাক্ষসী তারা দুটো অশ্লেষা আর মঘা; ওই হাঁচি টিকটিকি, গিরগিটি! চলা ফেরা, ওঠা বসায় এ কি দারুণ বিড়ম্বনা! কিন্তু এত আগলেও আমরা সামলে রাখতে পারছি কই? যমালয়ের দ্বার একেবারে খুলে গেছে। আর যমদূতগুলো নানা রোগের মূর্ত্তি ধরে এসে আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবার দেখুন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে যে সব বিদেশীরা এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য

করে সিন্দুক ভরে টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে, তাদের ওঠা-বসা, যাওয়া-আসায় বারবেলা ও তিথিনক্ষত্রের কোনো শাসন নেই, তারা প্রত্যেক ব্যবহারেই স্ব-স্বাধীন, তাই সর্ব্বত্র তারা স্বাধীন। নানাপ্রকার অদ্ভুত লোকাচারের চাপে আমরা পঙ্গু হয়ে আছি, অথচ বার বার তাদেরই মেনে চলছি! কিন্তু সেই সাগর-পারের লোকেরা কেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দগতি, অবাধ ও আত্মনির্ভর।

ভগবান বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমাদের মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং এ-সব কথা একবার আমাদের নিজে ভেবে দেখা উচিত। দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সমাজদেহের আধখানা ত অসাড় গতিহীন হয়ে পড়ে আছে। আবার পুরুষদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, লোকসংখ্যার অনুপাতে তারা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক যদি জীবনযাত্রাকালে কোথাও জীবনের পরিচয় না দিয়ে, সর্ব্ববিষয়ে পুরাতনের চাবুক খেয়ে পথ চলেন, তবে সে পথ তাঁদের মরণ পর্য্যন্তই পৌঁছে দেবে। কিন্তু মরতে ত আমরা চাই না। তাই সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি—সকল বিষয়েই যে-সব অন্ধ-সংস্কার বহুযুগ ধরে আমাদের হাড়ে হাড়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে তাদের উপড়ে ফেলে, প্রাচীনের মধ্যে যেখানে প্রাণ ছিল তার পরিচয় লাভ করতে হবে এবং সেই প্রাণের ধারাকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিচিত্র বিবিধ রসে ও অভিনব গন্ধে ফুটিয়ে তুলতে হবে। জীবন-বাঁশীতে জাগরণের সুর তুলে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন যুগের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করবার ভার যাদের উপর, কি দুঃসাহসে বুক বেঁধে, কোন দুরাশায় মুগ্ধ হয়ে, কোন্ সে দুর্গম পথে তাদের ছুটতে হবে—হে তরুণের দল, সে কথা যদি একবার শুদ্ধ সমাহিত চিত্তে চিন্তা করে দেখ, তবেই বুঝতে পারবে যে, সে নূতন পথে পথিকের পাথেয় হচ্ছে অন্তর ও বাহিরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। বিশ্বাসের হোমানল অন্তরে জ্বেলে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির স্বচ্ছন্দ আহুতিদানে যিনি বাহিরকে উজ্জ্বল প্রকাশমান করে নিতে পারবেন, তিনিই সে পথের যাত্রী। যারা কপটাচারী, যাদের মন মুখ এক নয়, সে পুণ্যপথে চলা দূরে থাক, তার সন্ধানই তারা পাবে না।

অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধা দেয়। আমাদের দেশের আচার-

ব্যবহার বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি যা কিছু সবই ভাল—এরূপ বিশ্বাসের দিকে যাঁদের মনের খুব ঝোঁক, কোনপ্রকার সংস্কারের কথায় তাঁরা কখনও আমলই দেবেন না। আমাদের দেশে জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, অনেকেই মনে করেন যে, আমরা আর্য্যঋষিদের সন্তান; অতএব অন্য কোন জাতির চিন্তা বা কর্মপ্রণালী থেকে আমাদের গ্রহণ করবার কিছুই নেই,—আমরা সবজান্তা, আমাদের সমাজ সকল দিকেই পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। এরূপ সংস্কার অথবা কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে আমরা এমন কূপমণ্ডুক হয়ে পড়েছি এবং আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি এমন বিলুপ্ত হয়েছে যে, সনাতন ধর্ম্মেরই দোহাই দিয়ে দেশের অনেক দুষ্কর্ম, কুরীতি ও কুপ্রথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু মানুষের ভাবরাজ্য হতে বিবেক ও বিচারশক্তিকে তাদের সিংহাসন থেকে নামিয়ে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিলে, মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনুষ্যত্বকে কি সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত করা হয় না? ইউরোপের ধর্ম্মরাজ্যে "ধর্ম্মগুরু পোপ"-এর অহঙ্কার যখন আকাশ স্পর্শ করার স্পর্দ্ধা করছিল, ধর্ম্মের নামে যখন মানব-মনের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ গতি অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, তখন ইউরোপ হয়েছিল মূর্চ্ছিত। তারপর যখন মার্টিন লুথার পোপের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, স্বাধীন চিন্তাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করে দিলেন, তখন তাঁর অদ্ভুত মনীষার সোণার কাঠির স্পর্শে মূর্চ্ছিত ইউরোপ চক্ষুরুন্মীলন করল, বিশাল বিশ্ব তার কাছে নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হল, হৃদয়ে তখন সে নূতনের আনন্দ-নৃত্য অনুভব করল। তাই বলি, পৃথিবীতে বাঁচতে হলে আমাদেরও বিবেক ও বিচারশক্তিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে চিরাগত অনেক বিষয়ের মূলে কুঠারাঘাত করে জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্য কোন পথে শ্রেয়ের সন্ধান মিলবে না।

এখন দেশের হাওয়া ক্রমে ফিরছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি হেয়ার স্কুলে পড়ি, তখন কেশব সেন বিলাত গিয়েছেন; দেশের শিক্ষিত মহলে তখন একেশ্বরবাদের আলোচনা চলছে। রাজনৈতিকদল তখন ছিল না বললেই চলে। সে সময় ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল মুন্সেফি বা ডেপুটিগিরি। কিন্তু এখন আমাদের আশা অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমরা "রিফর্ম" পাচ্ছি। কয়েক বৎসর আগে গভর্ণর-জেনারেলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায়

(Imperial Executive Council) একজন ভারতবর্ষীয় সভ্য গ্রহণ করা হবে, এরূপ স্থির করা হয়। লর্ড মর্লি তাঁর "জীবন-স্মৃতি"-তে এই ঘটনাকে A breach in bureaucracy বলে উল্লেখ করেছেন। এখন ঐ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় ভারতীয় সভ্যের সংখ্যা একের স্থলে তিন হয়েছে। ব্যবস্থাপক সভায়ও সভ্যের সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে। যোগ্য ভারতবাসী ঐ সকল সভায় সভ্য হবেন এবং ক্রমে তাঁরা 'মিনিষ্টারের' পদে উন্নীত হতে পারবেন এমন আশা থাকবে। আবার শাসন-ব্যাপারে কতকগুলি কার্য্য সম্পাদনের ভার বিশেষভাবে তাঁদেরই উপর এসে পড়বে (Transferred subjects)। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁদের কার্য্যের প্রসার যথেষ্টই হবে। আমাদেরই একজন—লর্ড সিংহ আমাদেরই এক প্রদেশের গভর্ণর হয়ে আসছেন। এই রিফরম্ ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার আমি করছি না। রাজনৈতিক দলের মধ্যে আমি কেউ নই; আমি বৈজ্ঞানিক মাত্র। আমার কথা শুধু এই যে, নানাদিকে দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে; জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অনেক দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হয়ে পড়ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এখন আমাদের সমানে পা ফেলে চলতে হবে এবং তার জন্যে নানাদিকে আমাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে—এই আমাদের প্রধান বক্তব্য।

দেশে নূতন যুগ আসছে। তাই আমাদের নূতন আয়োজনে অভিনব শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। বাঙলা দেশে আমাদের একটা সাংঘাতিক দোষ এই যে, আমরা সহজে ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিতে চাই;—রীতিমত একটানা পরিশ্রম করে কার্য্য সম্পাদন করতে হলে আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। দেশের সহস্র কাজ আজ অসম্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এখন শুধু চালাকির দ্বারা এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হবার কোনো আশা আছে কি? সফলতার তো কোনো বাঁধা পথ নেই। "আলালের ঘরের দুলাল"-এর ঠগচাচার মত "ও

মুই তুড়ি দিয়ে কেল্লা ফতে করব" ভাবলে কেল্লা ফতে হওয়া ত দূরের কথা, কর্ম্মের পথে এক পা অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হবে না। সম্ভব যা হবে সে শুধু কথার ফাঁকা আওয়াজ—যা আমাদের দুনিয়ার সামনে ঘাড় আরও হেঁট করে দেবে মাত্র—মিঞা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বেঁধে লড়াই করবার সাধে যে অবস্থা হয়েছিল। এখন চাই কাজ ;—চীৎকার বা চালাকিতে আর চলবে না ; মুখে ছিপি এঁটে কথা বন্ধ করে স্থিরচিত্তে কাজের জন্য দম নিতে হবে। "Everything great was achieved in solemn silence"—লোকচক্ষুর অন্তরালে স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে প্রকৃত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। আমরা বাঙালী বড় ভাবপ্রবণ জাতি। কিন্তু ভাবের মধ্যে গভীরতা নেই বলে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তা কলেজ স্কোয়ারের গলাবাজিতেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ;—শিল্পোদ্ধারকল্পে একটাও আসল কাজের রীতিমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ১৮ লক্ষ টাকা নিয়ে "বঙ্গলক্ষ্মী" কি করেছে ? কিন্তু এদিকে যুদ্ধের সুযোগে বোম্বাই কলওয়ালারা শতকরা দু তিন শ' টাকা লাভ দেখিয়েছেন। নাগপুরে "এম্‌প্রেস্ মিল" টাটার এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। কিন্তু বি এ,—এম এ পাশ করে যাঁরা চীৎকার করেন—তা বাঙালীই হন আর মাদ্রাজী বা মারাঠীই হন—তাঁদের ঐ ৪০৲, ৫০৲ টাকার চাকরিই সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে অবসাদের কারণ নেই। কতকগুলি বিষয়ে আমরা যে নিঃসন্দেহে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি, এইটেই আশার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমরা যত কটাক্ষই করি না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিদ্যাশিক্ষার ফলে দেশে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হচ্ছে। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে স্বাধীন গবেষণা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে সম্মান লাভ করা শুধু মুখস্থ বিদ্যার কর্ম্ম নয়,—একথা অবশ্য আজ কারও অবিদিত নেই। স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্রমে এমন সব তত্ত্ব বাহির হচ্ছে, যা আমরা সগৌরবে অন্য দেশের সুমুখে দাখিল করতে পারি। নানা ঘটনা-পরম্পরার সমবায়ে দেশে জাতীয় ভাব পুষ্টিলাভ করছে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতি ক্রমে ফুটে উঠছে। পাঞ্জাবের দুর্দ্দিনে ভারতের সকল স্থান থেকে

১৮।২০ হাজার শিক্ষিত লোক অমৃতসরে সমবেত হয়ে তাঁদের বেদনায় আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের দুঃখকে আপন দুঃখ বলে বরণ করে নিয়েছেন। তোমরা ও আমরা আজ সেই একই ভারতমাতার সন্তান—এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে জাতীয় জীবন বিকাশলাভ করছে। আবার দুর্ভিক্ষ বন্যা ও ঝঞ্ঝাপীড়িত হতভাগ্য দেশবাসীকে নানাভাবে সাহায্য করে সমাজসেবার আকাঙ্ক্ষা দেশের যুবকগণের মধ্যে জেগেছে। মহা সংক্রামক রোগ বা মহা বিপদ উপস্থিত হলে যখন সবাই আর্ত্তকে ফেলে পালায়, তখন এমন লোকও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যারা হাসিমুখে অকাতরে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলছে। প্লেগ-রোগ, বর্দ্ধমানে বন্যা ও পূর্ব্ববঙ্গে ঝড় তার প্রধান সাক্ষী। এই সেবাব্রত দেশে একটা খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। তাই আজ মনে হয়, আমরা ধীরে ধীরে খাঁটি ও আসলের আদর করতে শিখছি। অনেক চিন্তা ও ভাব-বিপর্য্যয়ের পর আজ দেশের সাধনা ক্রমে অন্তর্মুখী হচ্ছে এবং দেশের চিন্তাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই সকলই আশার কথা।

এই সূত্রে মাদ্রাজে "অব্রাহ্মণদের আন্দোলনে"র কথা মনে পড়ছে। ব্রাহ্মণই অব্রাহ্মণকে বরাবর ঘৃণা করে এসেছেন। তাই "রিফরম্ বিল" পাশ হবার সময় থেকে অব্রাহ্মণ খুব সাবধানে আছেন—পাছে এই সামান্য রাজনৈতিক সুবিধার সবটুকু ব্রাহ্মণ একচেটে করে ফেলেন। কুপ্রথা হজম করে আসতে আসতে আমাদের সমাজে এতটা নৈতিক অবনতি হয়েছে যে, সামাজিক কুরীতির পরিবর্জ্জন সম্বন্ধে বুদ্ধির সায় (Intellectual assent) থাকলেও অন্তরের সাহসে আর কুলায় না। "পারিয়া অস্পৃশ্য"—একথা যুক্তি ও তর্কের দ্বারা শতবার অস্বীকার করলেও, কার্য্যতঃ আচরণে আমরা একথা শতবার স্বীকারই করেছি। তাই অন্যের কাছে আপনাদের রাজনৈতিক অধিকার ভিক্ষা করলেও, আপন দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ জনসাধারণকে আমরা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। বিদেশীর নিকট আমরা যে অধিকার ভিক্ষা করি, স্বদেশবাসীর ঠিক সেই রকম জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়ে তার উপর অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হই না। যাহোক, এই রিফর্ম্ম-সূত্রে সকলশ্রেণীর লোককে ক্রমে মিলতেই হবে।

Creation of Electorate হচ্ছে রিফর্মের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব! ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যসংখ্যা এখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের সকল স্থানের লোকেরই আপন আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করার ক্ষমতা থাকবে। কাজেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, শূদ্র সকল জাতির প্রতিনিধিকেই এখন ব্যবস্থাপক সভায় পাশাপাশি বসতে হবে। এখন আর জাত ছুঁৎ মানলে চলবে না। আমরা এক দেশমাতার সন্তান সবাই এক—আজ পর্য্যন্ত যাদের অবজ্ঞা করে এসেছি তাদের কোলে টেনে নিতে হবে; যাঁরা এতদিন দূরে সরে ছিলেন তাঁদেরও জোর করে বাধা-সঙ্কোচ ঠেলে এগিয়ে আসতে হবে। তার পরিণামে যদি সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয় সেও ভাল। এমার্সন বলেছেন—"Heroism consists not only in facing cannon ball but also in facing social ostracism"—"কামানের গোলার মুখে দাঁড়ানোই কেবল বীরত্ব নয়, সমাজে একঘরে হওয়ার ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোও সমান বীরত্ব।"

বাঙালীর সুখ্যাতি গোখলে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"What Bengal thinks today, India thinks tomorrow"—বাঙলা আজ যা চিন্তা করে, সারা ভারতবর্ষ কাল সেই চিন্তা গ্রহণ করে। বাঙালীর পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়। কিন্তু লাট-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে মান্দ্রাজ ও মহারাষ্ট্র দেশের কাছে বাঙলা হার মেনেছে। গোখলে ঐ সভার সভ্য ছিলেন; শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বর্ত্তমানে সভ্য আছেন। এঁরা ধনী নন, কিন্তু জ্ঞানী ও কর্ম্মক্ষম। বাঙলা থেকে উপস্থিত যে-সকল প্রতিনিধি লাট-সভায় গিয়েছেন তাঁদের ধন আছে, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে কোনো গুরুতর ব্যাপারে আলোচনা করার শক্তি তাঁদের কম। বাঙলায় রাজা-রাজড়া না হলে মেম্বার হয় না; কিন্তু মাদ্রাজে তা নয়। বাঙলা এইখানে পশ্চাতে।

বাঙলায় এক অন্নসমস্যাই মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙলায় স্বাস্থ্যহানি, উৎসাহহীনতা, কর্ম্মবিমুখতা—এ সবের মূলে ঐ অন্নসমস্যা। পেট ভরে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে না পেলে বাঙালী ক্রমে কাজের বাহির হয়ে পড়বে; ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। তাই বলি,

আজ আমাদের কড়া ও ঝাঁজালো বক্তৃতা ছেড়ে কাজের হাতেখড়ি হওয়া চাই। আর কথা নয়—এখন শুধু কাজ। কিন্তু যে-কাজ সম্পাদন করতে পারলে বাঙলায় মহাসমস্যার মীমাংসা হবে, সে কাজের প্রেরণা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে আসা চাই। বাঙালীর আত্মার জাগরণ চাই। আত্মিক শক্তির বলেই বাঙালী তার জীবনপথের সকল বাধাগুলি ঠেলে দিয়ে জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। তাই আজ আত্মার মধ্যে আমাদের শক্তির কেন্দ্র খুঁজে বার করতে হবে—সে কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে, সেইখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ হবেই হবে।*

* বক্তৃতাটি প্রবাসী ১৩২৭, আশ্বিন সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত।

জাতি গঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের

আজ এই নব-জাগরণের দিনে বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী কি এক অপূর্ব্ব স্বরে বেজে উঠেছে। আশায়, আনন্দে, উৎসাহে বাঙালী এখন একটা জাতি বলে পরিগণিত হয়ে জগতের সমক্ষে দাঁড়াতে চায়। শুধু বঙ্গে নয়, একটা প্রাণ-মাতানো নতুন হাওয়া সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ভারত দিনে দিনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে। কিন্তু এই উদ্বোধনে কি কি উপকরণ চাই? জাতি-গঠনের উপাদান কি? সমষ্টির দেহে কোন্ শক্তি সঞ্চারিত হলে জাতি সুপুষ্ট ও মেরুদণ্ডবিশিষ্ট হয়ে গর্ব্বোন্নতশিরে আপন দেশে দাঁড়াতে পারবে? আমাদের এখন চাই কি? অভাব কোথায়?

আপনারা মান্দ্রাজের স্যর টি মাধব রাও-এর নাম শুনেছেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বিজ্ঞ দূরদর্শী পুরুষপ্রবর স্যর সালার জঙ্গের পর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। ইনি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন! মৃত্যুর পূর্ব্বে এঁর খেদোক্তি ভারতবাসী মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। আমরা নিম্নে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:—

"The longer one lives, observes and thinks, the more does one feel that there is no community on the face of the earth that suffers less from political evils and more from self-inflicted or self-accepted or self-created and therefore avoidable evils than the Hindu."

'মানুষ যত বেশী দিন বাঁচে, দেখে, ভাবে, ততই সে অনুভব করে যে ধরণীপৃষ্ঠে হিন্দুজাতি ছাড়া আর এমন কোনো জাতি নেই, যারা পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনৈতিক কারণ-জনিত দুঃখের চেয়ে আত্ম-অর্জ্জিত বা আত্ম-সৃষ্ট সুতরাং অপরিহার্য্য নয় এমন দুঃখই বেশী ভোগ করে।'

ভারতবাসী "স্বখাদ সলিলে" ডুবে মরছে, আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারছে। কোথায় তার অভাব, কোথায় তার দোষ, সমাজের নিষ্ঠুর মুষ্টি

কোথায় তার গলা টিপে ধরে শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে,—এ-সকল কথা বিচার করে বুঝে আপনার উদ্ধারের পথ আপনিই নির্দ্ধারণ করতে হবে। অন্তরের দেবতা না জাগলে শুধু উত্তেজনার জ্বালায় এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারা যাবে কি? ছটফটানির একটা গতি আছে, কিন্তু তার দৌড় বেশী দূর নয়।

মানুষের উন্নতির পথে যে বাধা—তা হয় ভিতরের, নয় বাহিরের। আমাদের জাতীয় প্রতিভা বিকাশের পক্ষে ভিতর ও বাহির দুই দিকের বাধাই প্রবল শক্তিতে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অন্তর যার বাধা-নির্ম্মুক্ত তার কাছে বাহিরের বাধা কখনও সাংঘাতিক হয় না। বাহির যে অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। অন্তরে সত্যের আলোকে যা গড়ে ওঠে, বাহিরে তার প্রতিষ্ঠা হবেই—সে কোন বাধা মানবে না। তাই আজ কঠোর আত্ম-পরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। অন্তরে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে বাহিরের অধীনতা ঘুচবেই।

ভারত আজ দুঃখের অতলস্পর্শ সাগরে ডুবে আছে, উঠতে পারছে না। আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলবার উদ্যোগ করছি না; নরম বা গরম কোন দলেরই আমি নই; আবার নরমই হোক আর গরমই হোক, যা কিছু আমার দেশকে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর করে দেয়, তাই আমি পরম পবিত্র বস্তু বলে জ্ঞান করি।

১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় যাঁরা ভেসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার ভাঁটার মুখে উল্টা পথে ভেসে যাচ্ছেন। যাঁরা স্রোতের মুখে তৃণের মত—নূতনের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যাঁদের উৎকট পুরুষকার নেই, তাঁদের উদ্দীপনার অগ্নিশিখা শেষে গোলদীঘির ধারে বক্তৃতা ও হাঁকডাকের ধূম্রাজিতে পরিণত হল। ব্যবসা-নীতি ও অর্থশাস্ত্রের ক খ জ্ঞান নেই, তাই শুধু বক্তৃতার দ্বারা শিল্প-প্রতিষ্ঠার ও অর্থ-সংস্থানের ব্যর্থ চেষ্টা আমাদের ভিতরে বাহিরে খুব একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে গেল। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙলার শিল্প জাগল না—কিন্তু জাগল বোম্বাই শিল্প। বোম্বাই প্রদেশে কাপড়ের কলকারখানা স্বদেশীর হাওয়ায় বেশ শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠল।

বাঙলায় স্বদেশী শিল্পের যে পুনরুত্থান হয় না তার প্রধান কারণ বাঙালী উদ্যমহীন; অলস ও আরামপ্রিয়। আবেগপূর্ণ ভাবপ্রবণতার দ্বারা আমরা

হনুমানের মত এক লাফে সাগর পার হতে চাই। কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসের পশ্চাতে বিপুল কর্ম্মচেষ্টা না থাকায় আমাদের কেবল ভরাডুবি হতে হয়। আবার ভিতরের এই সাংঘাতিক বাধা সকলকে আমরা কথার চটকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। নীরব সাধনা ভিন্ন যে কোন কাজ সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব—এই খাঁটি কথাটি সত্যভাবে স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই; কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে কেবল গলাবাজীর দাপটে আমরা দু'বেলা দেশোদ্ধার করে থাকি।

বোম্বাই ও কলকাতার মধ্যে তফাৎ অনেক। বোম্বাই সহরে মালাবার পাহাড়ের রমণীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে এবং সমুদ্র-সৈকতে যে সকল সুসজ্জিত প্রাসাদ, তার প্রায় সকলগুলি আমাদের দেশবাসীর। কিন্তু কলকাতার চৌরঙ্গীতে কালা আদমীর স্থান নেই—তারা থাকে সেই 'নেটিভ কোয়ার্টার'-এ যেখানে আলো ও বাতাস অন্ধকারের মলিনতায় প্রায় ডুবে যায়। বোম্বাই সহরে স্যর দোরাব, তাতা, স্যর বিঠলদাস ঠাকরসে, স্যর ফজলভাই করিমভাই প্রভৃতি—এঁরাই হচ্ছেন ঐ সকল প্রাসাদের মালিক। এঁরা মহা ধনী, শিক্ষিত, কৃতবিদ্য। স্যর বিঠলদাস স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে একদিনে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেছেন। বাঙলায় এমন মহাপ্রাণ বণিকরাজ আছেন কি? স্যর ফজলভাই কয়েকটা কলের স্বত্বাধিকারী। কোন কোন কলে ১০০ টাকায় ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত মুনাফা দিয়েছে। আর আমরা ১৮ লক্ষ টাকা মূলধনের ভাঙা 'বঙ্গলক্ষ্মী' নিয়ে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯২১ পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদের অনুসন্ধিৎসা ও কর্ম্মকুশলতা এতই অল্প যে বাঙলায় ২।১টি ছোটখাট কল চালাবার জন্যে হয় ইংরেজ, নয় বোম্বাই-বাসীকে ম্যানেজার নিয়ে আসতে হচ্ছে। এই ১৪ বছর কেবল চীৎকারে কাটালাম।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার হতে প্রতি বৎসর ৩০০ কোটি টাকার নানা প্রকার কাপড় বিদেশে রপ্তানি হত। তার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকার কাপড় ভারতের বাজারে আসত। এই ১০০ কোটি টাকার কাপড় যাদের দরকার তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র কৃষক। কোন রকমে লজ্জা নিবারণের জন্যে আমাদের দেশে এই ১০০ কোটি টাকার কাপড়ের

প্রয়োজন। তার মধ্যে কলকাতা হতে ৪০।৫০ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় বাঙলার বিভিন্ন জেলায়, বিহার ও আসামে চালান হয়। এই কোটি কোটি টাকার কাপড় একদিনে গোলদীঘির আন্দোলনে উৎপন্ন হবে কি? কলকাতার পাঁচ ছয়টা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।* নানা প্রকারের ব্যবহার্য্য জিনিস যাতে দেশেই উৎপন্ন হয় তার জন্যে চেষ্টা করাই আমি জীবনের ব্রত করেছি। আমি নিজেকে 'স্বদেশী' বলে পরিচয় দিলে বোধ হয় কেউ ক্ষুণ্ণ হবেন না। অভিজ্ঞতার ফলে এই সহজ সত্যটি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান বা ব্যবসা-বাণিজ্য যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হলে কঠোর তপস্যা চাই। নীরব সাধনা ভিন্ন এক দিনে এক লাফে কোন কাজই হবে না।

কিন্তু আমরা লাফ দিয়েই কেল্লা মেরে ফতে করতে চাই। আমার কাছে অনেক ছাত্র—কি করব?—এই প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁদের চালচলন ও কথার ভাবে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, তাঁরা একটা কিছু ব্যবসা ফেঁদে একেবারে রাতারাতি বড় লোক হতে চান। স্কুল কলেজের যুবকগণ যা গলাধঃকরণ করেন, পরীক্ষা-মন্দিরে তা উদ্গিরণ করে ডিগ্রী লাভ হলেই ব্যস্ মা-সরস্বতীর সঙ্গে একেবারে সেলাম-আলেকম্। তারপর উদ্যম-অধ্যবসায়ের ত কোন ধারই ধারি না—শুধু ব্যবসা-মন্ত্রটা মুখে উচ্চারণ করেই একেবারে লাট হবার স্বপ্ন দেখা। ব্যাপার মন্দ নয়।

সম্প্রতি দেখে এলাম বিলাতে প্রায় ২৫০০ ভারতীয় ছাত্র নানা প্রকার বিদ্যার্জ্জন করছেন। তাঁদের অধিকাংশই তাড়াতাড়ি একটা বিলাতী ডিগ্রী নিয়ে দেশী ডিগ্রীর উপর টেক্কা দিয়ে মোটা মাহিনার চাকরি জুটিয়ে নিতে চান। বাণিজ্য-ব্যবসার কেন্দ্রস্থানে শিক্ষালাভ করতে গিয়েও তাঁদের আড়ষ্ট বুদ্ধি সাড়া দেয় না; ঐ ডিগ্রী, আর চাকরি। বুদ্ধি খাটিয়ে আপন হাতের জোরে কিছু সৃজন করে তোলবার কল্পনা তাঁদের মনে কখনও জাগে না। এবার বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পথে জাহাজে দু'জন দেশীয় বণিকের

*১। Bengal Chemical and Pharmaceutical works. ২। Calcutta Pottery Works. ৩। Calcutta Soap Works. ৪। Bengal Canning and Condiments Works. ৫। Bengal Miscellany. আরও ২।১টি আছে।

সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মধ্যে একজন কলকাতার এক ধনী সওদাগরের পুত্র। লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে তাঁদের ব্যবসার কেন্দ্র আছে। আর একজন গুজরাটী বেণিয়া—১৪ মাস বিলাতে ছিলেন—পশমী জিনিষের ব্যবসা করেন। এই দুটি যুবক শিক্ষিত, কিন্তু তাঁদের ডিগ্রী নেই, তাঁরা ছাপহীন। জাহাজে তাঁদের একজন ম্যাটসিনির জীবনচরিত পাঠ করছিলেন, আর একজন প্রথমে ওমর খৈয়াম এবং পরে Light of Asia পাঠ করছিলেন। তাই বলি, ব্যবসা ও শিক্ষায় বিরোধ নেই—একেবারেই নেই। কার্ণেগী ও রকফেলারের নাম কে না শুনেছেন? এঁদের শিক্ষা যেরূপ গভীর, ব্যবসার বিস্তার সেইরূপ অদ্ভুত। জনসাধারণের হিতার্থে কার্ণেগী ১০০ কোটী টাকা ও রকফেলার বিদ্যাশিক্ষার ও পরহিতের জন্য ১৫০ কোটি টাকা দান করেছেন। এঁদের জীবন যেন উদ্যম, অধ্যবসায়, শিক্ষা, দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং করুণা ও মহাপ্রাণতার অপূর্ব্ব সঙ্গম। আর আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, অন্য দেশে বহু চেষ্টায় যা সম্ভব হয়েছে, আমরা এক প্রকার বিনা চেষ্টায় শুধু গলাবাজীর দ্বারা তা সারতে চাই। কিন্তু গলাবাজীর কসরতে গলাই ভেঙে যায়, আসল কাজ এতটুকুও হয় না। তবু আমরা নিজের আলস্য ও উদ্যমহীনতার দোষ দিই না—দোষ দিই পারিপার্শ্বিক অবস্থার। কেউ বলেন—আঃ বড় গরম, কাজ করতে পারি না; আবার কেউ বা বলেন—উঃ কি শীত, কাজে হাত পা ওঠে না।

তারপর সুপ্রচলিত 'নেশন' শব্দটির (আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনা করে) বিচার করা যাক। বাঙলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—উভয়ের মাতৃভাষা এক—বাঙলার হাওয়ায়, সুজন্মা-অজন্মায়, সুখে-দুঃখে, আমরা অনেকটা এক বটে। কিন্তু ধর্ম্মে আমরা পরস্পর থেকে পৃথক। হিন্দুর মধ্যে আবার নানাপ্রকার উপজাতি সব আছেন। এখন একটা ক্ষণিক আবেগের বশে আমরা হিন্দু-মুসলমান এক হয়েছি বটে, কিন্তু এই একত্ব কি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে? একদিনেই বনিয়াদ পাকা হয়ে যাবে এমন আশা অবশ্য আমি করি না। তবু আপনাদের এই মিলনকে সত্যবস্তু করে তোলবার জন্যে আমরা বাস্তবিক কি কোন সত্য চেষ্টা করছি? দিল্লীর জুম্মা মসজিদে হিন্দু সন্ন্যাসী আপন মর্ম্মকথা ব্যক্ত করেছেন। হিন্দু মুসলমান

তা শুনেছে—মহামতি তিলকের শবদেহ হিন্দু মুসলমান মিলে বহন করেছে। সকলে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেছে। এ সকলই আশার কথা। কিন্তু এ মিলন স্থায়ী হবে কি? এখনই ভেদনীতির কার্য্য আরম্ভ হয়েছে। আলিগড়ে মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আবার লক্ষৌ সহরে শিয়া মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়। কেন এই স্বাতন্ত্র্য? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে এমন কি বস্তু আছে যা হিন্দু-মুসলমান আপন আপন ভাইএর মত পাশাপাশি বসে শিখতে পারে না? হিন্দু মন্দিরে পূজা করেন, মুসলমান মসজিদে উপাসনা করেন। কিন্তু শিক্ষা-মন্দিরে যদি আমরা হিন্দু-মুসলমান এক আসনে বসতে না পারি, তবে কি করে বলি যে, আমরা ভাই ভাই বলে মিলতে চেষ্টা করছি। আমরা যে ইচ্ছা করে বুদ্ধির দোষে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। কোথায় সার্ব্বভৌমিকতা ও উদারতার প্রতিষ্ঠা করব—তা না করে, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে আমরা নিজেকে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করছি। এই কি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির লক্ষণ? এই কি জাতি গঠনের সূচনা?

আমরা এখন "জাতীয়" শিক্ষা চাই। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কি? জাতীয় শিক্ষা অর্থে কি বটতলার বই পড়া? আর্য্য সমাজের লোকে জাতীয় শিক্ষার অর্থ করেছেন বেদ পাঠ করা; কেন না তাঁদের মতে বেদ অভ্রান্ত। বিবেকানন্দের ভক্ত বলবেন—বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ বিচার কর। আবার কেহ বা বলবেন—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পাঠ কর। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীগণ সকলে এই ব্যবস্থায় সম্মত হবেন কি? মুসলমান জাতীয় শিক্ষা অর্থে বলবেন—কোরাণ পড়। খৃষ্টান বলবেন—বাইবেল পড়। এত মতের অনৈক্য হলে আসল কাজে যে বাধা পড়বেই। পরম ধার্ম্মিক হিন্দু রাজার রাজত্বকালে শূদ্র তপস্যা করেছে বলে তার শিরশ্ছেদনের ব্যবস্থা হল; মনু মহাশয় ব্যবস্থা করেন যে শূদ্রের কর্ণে বেদোচ্চারণ শব্দ প্রবেশ করলে উত্তপ্ত তরল সীসক সেই কর্ণে ঢেলে দিতে হয়। এই মনুস্মৃতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি? বেদ, বেদান্ত পাঠ্য হ'লে বাঙলার শতকরা ৫২ জন মুসলমান কি করবে? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ—কোন্ পন্থী হলে

মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে? আমরা হিন্দু-মুসলমান এক বলে আহ্লাদে নৃত্য করছি, কিন্তু মুসলমান আমাদের জল ছুঁলেই সর্ব্বনাশ। জল খেতে হ'লে পানি পাঁড়ে, আর চা খেতে হ'লে কেল্‌নার। কি চমৎকার! বক্তৃতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে অনেক যুবক দেশোদ্ধার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু আবেগ ও উত্তেজনা কতদিন স্থায়ী হয়? বি এ, বা এম এ পাশ করে যে সব শিক্ষিত যুবক দেশের কাজ করতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁরা কতদূর ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন জানতে চাই। কলকাতার অনেক ছাত্রাবাসে বামুন, কায়েত, নবশাখের আলাদা আলাদা ঘর; এদিকে বাবুর্চ্চির হাতের অমৃত আস্বাদনে কারও বাধে না। সমাজে বামুনের কাছে সব জাতিই অপাংক্তেয়। শিক্ষিত যুবক! নমঃশূদ্রকে দেশবাসী ভাই বলে তার সঙ্গে এক সাথে খেতে দাঁড়াতে পার? বিবাহের সময় বরপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার? তোমাদের বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে হতভম্ব লেগে যায়; এত বিচিত্র কুলশীলের তালিকাও তোমাদের আছে! তোমার বিয়ের যৌতুকের চাপে কত স্নেহলতা আত্মহত্যা করছে তার সংবাদ রাখ? না ঠিক ঐ সময়ে তোমার পিতৃভক্তির উৎস উথলে ওঠে—"কি করব, আমার ত পণ গ্রহণে অনিচ্ছা, কিন্তু বাবা বলছেন! ও বাবা! তিনি যে বুকে ধরে মানুষ করেছেন, সেই বুকে কি করে শেলবিদ্ধ করব?" হায়রে "বাবার" দোহাই। হে উপাধিধারী যুবক, তুমি ঘোড়া, গরু ও ছাগলের মত নিজকে সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রীত হতে দেও—ধিক্ তোমার শিক্ষা, ধিক্ তোমার দীক্ষা। তুমি আবার স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আগুয়ান। তুমি মানসিক দাসত্বের নিগড় আপন চরণে এমন করে পরিয়েছ যে, এক পাও অগ্রসর হতে পার না। তুমি দেশাচার-জুজুর ভয়ে এত ভীতত্রস্ত যে কোনও প্রকার সমাজ-সংস্কারে হাত দিতেও ভীত হও। তুমি বারেন্দ্র হয়ে 'কাপের', বঙ্গজ হয়ে দক্ষিণ রাঢ়ীর কন্যার পাণি গ্রহণ করতে বললে, ভয়ে আড়ষ্ট হও।

আর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। On national lines এর মানে কি? ইংরেজী ভাষা একেবারে বাদ দেওয়া চলতে পারে কি? শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন

বঙ্গ সমাজ" নামক পুস্তকে যাঁরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন কারও স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন এদেশে হয় নি। বরং আমাদেরই একটা গর্ব্বের বিষয় এই যে, রামমোহন রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ ঐ কলেজ স্থাপিত করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে রামমোহন রায় লর্ড আম্‌হার্ষ্টকে যে পত্র লিখেছিলেন তা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করে দেখা উচিত। তিনিই প্রথম প্রণিধান করেছিলেন যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত জ্ঞানরাশি এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য দর্শন আয়ত্ত না করলে, দেশের চিন্তাস্রোতে জোয়ার আসবে না; শুধু সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অধ্যয়ন করলে দেশকে মধ্য যুগের অন্ধকারেই পড়ে থাকতে হবে। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রধান উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতার ফল আজ ফলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন স্থানে যথার্থই বলেছেন যে, কিছুকাল আগে জন্মগ্রহণ করলে কলম ধরে "বঙ্গদেশের কৃষক" বা অন্য উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ বা উপন্যাস না লিখে, তিনি পাঁজী হাতে করে নবমীতে লাউ খেতে আছে কিনা তার বিচার করতেন। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের শিক্ষা করবার অনেক জিনিষ এখনও আছে। নূতন কোন বিষয় শিখতে হলে পাঠাগার থেকে আপনারা ইংরেজী বা বাঙলা কোন্ পুস্তক নিয়ে আসেন সে কথা ভেবে দেখলে আমার উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারবেন। আমি মাতৃভাষার নিন্দা করছি না। কিন্তু গায়ের জোরে ভাষার দৈন্য চাপা দিতে আমি একবারেই প্রস্তুত নই। বরং পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে সর্ব্ব বিষয়ে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধিশালিনী করবার জন্যে আমাদেরও মধুসূদনের মত বলতে হবে—

"রচিব এ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মিলটন, দাঁতে, হোমার, ভার্জ্জিল প্রভৃতি নানা দেশের মধুচক্র হতে মধুসূদন মধু সংগ্রহ করেছিলেন। একি কোন লজ্জার কথা? ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব কি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখা যায় না? On national lines মানে

কি নবদ্বীপের টোল বা মুসলমানদের মুক্তাব? কোন্ সাহিত্য চর্চ্চার ফলে দেশে রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে? No taxation without representation কোন সাহিত্যের কথা? মনুর মতে রাজা দেবতা; তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের স্থান নেই—যা বলবেন তাই মানতে হবে। কিন্তু আজ যে আমরা মানুষের জন্মগত অধিকার ও স্বত্ব বুঝে নেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেছি, তার প্রেরণা কোন্ শিক্ষা হতে? হাম্‌ডেন্, পিম্ প্রভৃতি স্বাধীনতার আন্দোলনের পুরোহিত জননায়ককে ভুলতে গেলে যে বিষম ভুল হবে!

বর্ত্তমান সময়ে জাতিগঠনের আন্দোলনে লোকশিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার স্থান আমরা কোথায় দিয়েছি? বাঙলার নবজাগরণের দিনে যখন জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন ব্রজেন্দ্র কিশোর পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন, সুবোধচন্দ্র এক লক্ষ টাকা দিলেন, সূর্য্যকান্ত আড়াই লক্ষ দিলেন। আরও অনেকে মাসিক সাহায্য দিলেন। কিন্তু সে সময়ে পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি বলে যে কেউ আছেন একথা তাঁরা একেবারেই ভুলে গেলেন। মা, ভগ্নী, সহধর্ম্মীণীকে মূর্খ করে রাখলে কি লাঞ্ছনা হয় তা ত আমরা প্রতি পদে বুঝতে পারছি। তবু ত আমাদের চেতনা হয় না! ইউরোপীয় যুদ্ধে স্ত্রীলোক কত কাজ করে দিয়েছেন তা আজ সকলেই জানেন। আমাদের ঐ সময়ে স্ত্রীলোকের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা কতটুকু? তাঁদের গণ্ডমূর্খ ও অকেজো পুতুল করে রেখে আমরা সমাজের আধখানা অঙ্গকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু করে রেখেছি। স্ত্রীশিক্ষার স্থান ত কোথাও দেখছি না। আর পুরুষের যা শিক্ষা সে ত ডিগ্রী ও চাকরির লোভে।

আবার লোকশিক্ষার কথা যদি ধরা যায়, তাহলে ত বুক শুকিয়ে ওঠে। দেশের শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। আপনাদের শিক্ষার জন্যে আমরা স্কুল কলেজ স্থাপন করছি। কিন্তু কোটি কোটি লোক যে অজ্ঞতার স্তূপের নাচে চাপা পড়ে মারা যাচ্ছে। তাদের বাঁচাবার জন্যে আমাদের ক'জনের প্রাণ কেঁদেছে? লোকশিক্ষার জন্যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা হতে শুনেছি, কিন্তু খুব অল্প কর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হতে ত দেখিনি। কিন্তু এই বিপুল জনসঙ্ঘ যদি চিরকালই শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকে, তবে কি আমরা আকাশ

থেকে জাতিগঠনের উপকরণ সংগ্রহ করব? জনসাধারণকে নিয়ে জাতি। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে যা থাকে তা অন্য কিছু হতে পারে, কিন্তু জাতি কোন কালেই নয়। জাগরণের ঢেউ জনসঙ্ঘের কাছে পৌঁছান চাই। যদি জিজ্ঞাসা করি—কলকাতার দোকানপাট বন্ধ হয়েছিল কেন? উত্তর হবে—মহাত্মার হুকুম। "কেন"? "তা জানি না।"* কিন্তু জাপানে ও ইংলণ্ডে এরকম অজ্ঞতা দেখা যায় না। শতকরা ৯৫ জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে জাতির দেহে বল সঞ্চারের সম্ভাবনা কোথায়? প্রজাশক্তি যদি জাগিয়ে তুলতে হয় তবে এখন শিক্ষার দীপ গ্রামে গ্রামে জ্বেলে দিতে হবে। তবেই ত রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণের ইচ্ছা, শক্তি ও সহানুভূতির উপর দাঁড়াতে পারবে। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেই পুণ্যশ্লোক গোখলে জীবনের শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কি পরিশ্রমই না করেছিলেন!

জনসাধারণের শক্তির উপর ভিত্তি নেই বলে ভারতবর্ষে অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। রণজিৎ সিংহ বা হায়দার আলির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়ে গেল। দেখা গিয়াছে, সেনাপতি যেমনই হত হলেন, অমনি সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খরগোশের মত পালিয়ে গেল। তাই বলি, কোন আন্দোলনই শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের নিয়ে সফল হয় না। জনসাধারণের উপর ভিত্তি না থাকলে সব ইমারৎ তাসের ঘরের মত ভূমিসাৎ হয়ে যায়। আমি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের উপর কটাক্ষ করছি না। আমি দূর থেকে ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতার দ্বারা যেটুকু বুঝেছি তাই দেশবাসীকে জানাচ্ছি। আমাদের অনেক গলদ আছে। দেহের মধ্যে যদি দূষিত ক্ষত থাকে তবে অস্ত্রচিকিৎসা চাইই চাই। পূঁজ রক্ত বাহির করে দিতেই হবে; চাপা দিলে শুধু মৃত্যুকে ডেকে আনা হবে।

আজ দেশই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তাঁর পূজার নৈবেদ্য সকলকেই সাজিয়ে আনতে হবে। কারও মুখ চেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে

*হরতাল কেন? এ কথার উত্তর অনেক বেহারা ও সাধারণ শ্রেণীর লোক প্রকৃতই দিতে পারে নি। কেবল উত্তর পেলাম—"গান্ধী মহারাজের হুকুম।"

রাজার পুকুরে দুধ ঢালবার মত দুধ আর এসে পৌঁছবে না,—আসবে শুধু জল। তাই আজ মনের ভক্তি ও দেহের শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন সাজিয়ে দিতে হবে। এ পূজায় সবারই সমান অধিকার। সকলকেই এ পূজায় উপকরণ জোগাড় করে আনতে হবে। হিন্দু মুসলমান হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে সত্যধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করবে।*

* বক্তৃতাটি "প্রবাসী" ১৩২৭, চৈত্র সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত।

জাতিভেদ-সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশের কথা ইউনিভারসিটি কমিশন রিপোর্টে আগ্রহাতিশয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য কথা অবতারণা করার আগে আপনাদের সম্মুখে তা থেকে দুই এক ছত্র পাঠ করছি,—

"In Bengal, while our mind is highly imaginative and our intellect peculiarly subtle, our actual social life is wholly circumscribed by conventional custom and completely fettered by artificial rules. This divorce of our actual life from the life of our ideas has made us a race of neurasthenics. In addition, it is destroying our intellectual power. At present we are too often content merely to imagine and almost never really to achieve. Our only hope lies in true university education. It must awaken in us a real sense of independence in both thought and action."

কমিশন বলেন বাঙালীর ছেলে দোটানায় পড়েছে; তার ঘরে একরকম, বাহিরে ঠিক তার উল্টা। বাস্তবিক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের ঘরে এবং বাহিরে এত তফাৎ, তার চিন্তা ও কার্য্যে এত পার্থক্য, ভাবরাজ্য ও কর্ম্মরাজ্যের ব্যবধান এরূপ সুপ্রশস্ত ও সুগভীর যে এই অসামঞ্জস্যের ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মশক্তি ক্রমে ক্ষয় পাচ্ছে। কলেজে জ্যোতির্ব্বিদ্যা অধ্যয়ন কালে বাঙালী যুবক বুঝেন পৃথিবীর ছায়া সম্পাতে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে; এদিকে বাড়ীর ভিতর এসে দেখেন আয়ীমা, ঠাকুরমা, দিদিমা, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে এসেছেন—কেননা সূর্য্যদেব রাহুগ্রস্ত হয়েছিলেন! আমাদের পুঁথিতে বিদ্যা একরূপ, আর সমাজগত ব্যবহার ভিন্নপ্রকার। এরূপ কপটতায় আমরা অতি অল্প বয়স থেকে অভ্যস্ত হয়ে আসছি বলে, অন্তরকে ফাঁকি দিয়ে বাহিরের ঠাট বজায় রাখতে আমাদের তেমন ঠেকে না—দ্বিধাবোধ হয় না। বুদ্ধি দিয়ে আমরা যা গ্রহণ করি, সামাজিক

ব্যাপারে প্রায় তার বিরুদ্ধাচরণই করে থাকি। কিন্তু এরূপ বিরোধ আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। যুক্তি যা স্বীকার করে, হৃদয় যা গ্রহণ করতে চায়, চিরাচরিত ও গতানুগতিকের চাপে সেই চিন্তা ও ভাবকে যদি আমরা জীবনযাত্রাকালে স্বীকার না করে চলি, তবে বাহিরের চলাফেরা বজায় থাকলেও অন্তরে দৈন্য উপস্থিত হয়; আমি অন্যত্র এই একই কথা বলেছি যে মানসিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা এক সঙ্গে হওয়া চাই। এর মধ্যে একটিকে চেপে অন্যগুলির কথা প্রচার করবার প্রয়াস বিফল হবে, তাতে জাতির কল্যাণ হবে না। কারণ জাতীয় উন্নতি অর্থে একটা বাঁধা-ধরা কিছু বুঝায় না,—বুঝায় সকল দিকে সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় জীবনের অবাধ বিকাশ ও প্রসার।

স্বীকার করতেই হবে যে, জাতিভেদ প্রথার ভীষণ বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি, অধঃপাতে গেছি; এতই অধঃপাতে গেছি যে আবার ধর্ম্মের অজুহাতে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা এই প্রথাকে—বিশেষতঃ এই ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারটাকে, বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণ না করে আর ছাড়ছি না। আমরা বলি "আমরা হিন্দু আধ্যাত্মিক জাতি, ঘোরতর spiritual; আর ইউরোপীয়েরা জড়বাদী বড়, material;—তবু caste কোথায় নেই মশাই—এই জাত্ মেনে চলা? ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধনী কি দীনদরিদ্র প্লিবিয়ানের মেয়ে বিয়ে করেন, না তার সঙ্গে এক সঙ্গে আহারাদি করতে সম্মত হন? তা যখন চলে না, তখন আর আমাদের সঙ্গে তফাৎ রইল কোথায়?" Things which are equal to the same thing are equal to one another—যুক্তি এমনই চমৎকার! বংশগত জাত্ আর অবস্থাগত জাত্ যে এক নয় তা এইটুকু বললেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে—বিশেষ বংশে জন্মের উপর কারো হাত নেই, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন মানুষ চেষ্টার দ্বারা করতে পারে। দরিদ্র ধনী হয়ে উঠলেই ইউরোপ আমেরিকায় তারা কুলীন হয়ে পড়ে; দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হয়ে স্যর বা লর্ড উপাধি অনেকেই পেয়েছেন এবং তাঁরা সমাজে অভিজাতদের সমকক্ষ হতে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের নীচু জাত্ হাজার তপস্যা করলেও এখন আর পূর্ব্বকালের মতন উচ্চজাত্ বলে গণ্য হতে পারে কি?

যাহোক এসব কথা ছেড়ে সমস্যাটিকে একটু তলিয়ে দেখতে হবে। তুলনা করে দেখতে হবে, ইউরোপের জাতিভেদ ও আমাদের দেশের জাতিভেদের মধ্যে বাস্তবিক কোন মূলগত পার্থক্য আছে কিনা, এদেশের মত ইউরোপে জাতিভেদ মানুষকে বংশের পর বংশ ধরে ক্রমাগত ঘৃণা করে, পেষণ করে তাকে চেপে, দেবে, কোণটাসা করে, চিরকালের জন্য হীন করে রেখেছে কি না, তার আত্মসম্মানজ্ঞান প্রায় লুপ্ত করে দিয়ে সর্ব্বপ্রকারে তাকে খর্ব্ব করেছে কি না, হৃদয়হীন ভাবে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে কিনা।

একটু সবিস্তারে আলোচনা করা যাক। মনে রাখবেন আজকালকার এই "জাতিভেদ" কথাটা আমরা সৃষ্টি করেছি, এটা পুরাতন নয়, পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ মাত্র নাই। যে সকল পুস্তকে বর্ণভেদ বর্ণাশ্রম প্রভৃতির কথা দেখা যায়। গীতায় আছে—"চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ"। আমাদের দেশে বহুপূর্ব্বে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। ঋগ্বেদ সংহিতা পড়লে তাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ইন্দ্র বরুণ তখন আর্য্যদের দেবতা ছিলেন। আর্য্যেরা প্রার্থনা করতেন,—"হে ইন্দ্র, হে বরুণ, তোমাদের প্রচুর সোমরস প্রদান করছি, পান করে প্রসন্ন হও এবং কৃষ্ণকায় অনার্য্য দস্যু বধ কর।" অনার্য্যেরা কৃষ্ণকায় ও কদাচারী ছিল। আর্য্যেরা ছিল সভ্য এবং গৌরবর্ণ। এদেশে তখন জাতিভেদের মূলে ছিল বর্ণভেদ। আর্য্যেরা যখন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে উত্তর ভারতের নদীবহুল সমতলক্ষেত্রে ক্রমে বসতি বিস্তার করতে লাগল, তখন কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধল এবং পরাজিত হয়ে তারা একে একে পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করলে। ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা তাদের বংশধর। আমেরিকা দেশেও এইরূপ ঘটনা ঘটেছে। পরাক্রান্ত ইউরোপীয় জাতির সংঘর্ষণে ও আওতায় রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি হীনজাতি টিকতে না পেরে, বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করেছে।

যে দেশে বর্ণভেদ ছাড়া জাতিভেদের অন্য কোন ভিত্তি ছিল না, সে দেশে এই হাজার রকম জন্মগত জাতির উৎপত্তি কিরূপে হল? নানা জাতিতে বিভক্ত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজটিকে বিধাতা কি ঠিক এই রূপেই তৈরী করে

শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে দ্যুলোক থেকে ভূলোকে নামিয়ে দিয়েছেন, অথবা এই ভূলোকেই এইরূপ জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে ? যে হিন্দু সমাজে আদৌ জাতিভেদ ছিল না, সেই সমাজ ক্রমে "স্পৃশ্য" "অস্পৃশ্য" নানা জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ! জাতিভেদের এই অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ একটু আলোচনা করতে হবে।

ম্যাকস্মুলার প্রথম সমগ্র ঋগ্বেদ প্রকাশিত করেন। তারপর রমেশ দত্ত বেদের বাঙলা অনুবাদ করেছেন। সুতরাং সংস্কৃত বিশারদ না হলেও বেদের কথা এখন অনায়াসেই জানতে পারা যায়। বেবর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদের নানা প্রকার আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে—"caste is not a Vedic institution"—ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ ছিল না। আবার বৈদিক যুগের খাওয়া ছোঁয়ার বাছবিচার সম্বন্ধে একটা কথা শুনুন,—অতিথি সৎকারের জন্য তখন গৃহস্থের বাড়ীতে গরু মারা হত। এই জন্য অতিথির আর এক নাম ছিল "গোঘ্ন"। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনেক পুরাতন কথা সঙ্কলন করে "Beef-eating in Ancient India" নামক এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুতরং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এখনকার খাদ্যাখাদ্য-বিচার, স্পর্শদোষে খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র হবার ব্যবস্থা, এসব বেদে শ্রুতিতে কোথাও দেখা যায় না। এমন কি ভবভূতির সময়ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। অতিথিকে মাংস সহিত মধুপর্ক দান করবে এই বেদবাক্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গৃহস্থগণ অতিথিরূপে সমাগত বেদাধ্যায়ী বিপ্র বা রাজন্যের অভ্যর্থনার জন্য রামছাগল, ষাঁড় প্রদান করে থাকেন— ধর্ম্মসূত্রকারগণ এই বিধান দিয়েছেন। যুগে যুগে আচার-বিচারের পরিবর্ত্তন হয়েছে ও হচ্ছে এই হল মূল কথা; অস্পৃশ্যতা-পরিহারই মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

আমরা বলি, হিন্দু হয়ে বেদের মত অগ্রাহ্য করে এমন কেউ নেই। কিন্তু বেদবিরোধী বিধি-ব্যবস্থার চাপে ধর্ম্ম যে দেশ ছেড়ে পালাবার উপক্রম করেছেন তা আমরা বুঝেও বুঝতে পারি না। শ্রুতি ও স্মৃতি যেখানে পরস্পর বিসম্বাদী, সেখানে বিরোধ-মীমাংসায় স্মৃতি ছেড়ে দিয়ে শ্রুতির কথাই গ্রাহ্য। কিন্তু আমাদের এমনই দশা হয়ে পড়েছে যে, আমরা বরং সত্য ও শ্রুতি

পরিত্যাগ করব, তবুও স্মৃতির অদ্ভুত বিধান ও লোকাচারের কঙ্কালরাশি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। বিচার ও যুক্তির বশবর্ত্তী হয়ে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি যদি অর্থহীন নির্ম্মম বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, তবে সমাজ অমনি রক্ত-আঁখি হ'য়ে তার কড়া শাসনের জন্যে "একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত" করতে উদ্গ্রীব হয়ে উঠবেন। বড় দুঃখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"ওই যে পশুবৎ হাড়ি ডোম প্রভৃতি বাড়ীর চারিদিকে ঘুরছে ওদের জন্যে—ঐ অধঃপতিত, দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্যে—তোমরা হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ কি করেছ? খালি বলছ ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা! এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি করে ফেলেছ? এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা!" কিন্তু বৈদিক যুগে এই ছুঁৎমার্গের অস্তিত্বই ছিল না; তখন ছিল শুধু বর্ণভেদ!

অনার্য্যেরা ছিল কৃষ্ণকায় কিম্ভূতকিমাকার, তাদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সুজলা সুফলা দেশে বাস করল গৌরবর্ণ আর্য্যেরা। অনার্য্যের সহিত সংমিশ্রিত যাতে না হয় তারই জন্য সাবধানতা অবলম্বন করেছিল—উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক ক্রিয়া তাই তখন নিষিদ্ধ ছিল। আর্য্যেরা ছিল শ্রেষ্ঠ,—অনার্য্যেরা নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হত। প্রাচীনকালে অন্য অনেক দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। পুরাতন বাইবেল অনুসারে ইহুদিরা ছিল ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জাতি; আর জেন্টাইলরা ছিল নিকৃষ্ট, অধম, অস্পৃশ্য—শিয়াল-কুকুরের সামিল। মিশর দেশের পুরাতন জাতির মধ্যেও এরূপ ভেদ ছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে জাপান দেশের সামুরাই বা ক্ষত্রিয়গণ অন্যান্য জাতিকে হীন বলে ঘৃণা করত—শিল্পী বা ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে আসা লজ্জাকর বলে বিবেচনা করত। জাপানের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে, বলে বুঝিয়ে, ব্যষ্টির বিকাশের প্রধান অন্তরায় এই জাতিভেদ প্রথাকে সমাজ থেকে রহিত করে দিয়েছেন। কিন্তু যে দেশে যেরূপ আকারেই থাক না কেন, আমাদের দেশের মত এমন সর্ব্বনাশকারী জাতিভেদ পৃথিবীর কোথাও নেই, কখনও ছিল কিনা সন্দেহ! আমাদের দেশে জাতিভেদের পাষাণস্তূপে নির্ম্মমতা এমন উগ্র হয়ে প্রকট হয়েছে যে তার নিশ্বাসে উৎকট ঘৃণার গরল অহরহ বাহির হচ্ছে; তার চাপে পতিত জনসঙ্ঘ

দলিত ও মথিত হয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত একপাশে পড়ে রয়েছে। সর্ব্ব-প্রকার বিভেদ ভুলে গিয়ে, আপামর সাধারণের কল্যাণ-কামনায় বুদ্ধ যখন নূতন সত্যের প্রচার আরম্ভ করলেন, সেই প্লাবনের যুগে ব্রাহ্মণাধিকার তিরোহিত হয়ে ভারতবর্ষে সব একাকার হয়ে গেল। সেই ভাববন্যা হতে যে যুগের উদ্ভব হল ভারতবর্ষের সে এক শ্রেষ্ঠ যুগ। মগধ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মহারাজ অশোকের সময় দেশবাসীকে এক নূতন জীবনের আস্বাদ প্রদান করলে। পরে নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞান সর্ব্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হল; সে জীবনে জাতিভেদ একপ্রকার বিলুপ্ত হয়ে গেল। বিবাহাদির স্বচ্ছন্দ আদান প্রদানে বিভিন্ন জাতি মিলে মিশে এক হয়ে গেল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের আরও কতগুলি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙালীর মুখাবয়ব ও শরীর-গঠন দেখে তাকে কোনমতে খাঁটি আর্য্যসন্তান বলে মেনে নিতে পারা যায় না। মণিপুর, কোচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজবংশ খাঁটি আর্য্যবংশ বলে পরিচিত হতে চান। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়ে কুলজী তৈরী করে আপন আপন বংশের ধারাকে টেনে কেউ সূর্য্য, কেউ চন্দ্র, কেউ বা শুক্র, কেউ বা শিব পর্যন্ত নিয়ে যান। কিন্তু মুখের উপর যে ছাপটা স্পষ্ট হয়ে আছে তাতে তাঁদের চেহারায় মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ বেমালুম ধরা পড়ে যায়। তারপর শক ও হিন্দু মিলে যে রাজপুত ও জাঠ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বংশের উদ্ভব হয়েছে একথা ইতিহাসসম্মত।

বাঙলাদেশে ১১০০।১২০০ বৎসর ধরে বৌদ্ধাধিকার ছিল। বিক্রমপুরে ও তার নিকটবর্ত্তী স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বৌদ্ধযুগের বাঙলার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুদীর্ঘকাল ধরে নানা জাতির যখন অবাধ সংমিশ্রণ হয়ে এসেছে, তখন জাত আর আছে কোথায়? খাঁটি আর্য্যরক্ত অনেক অনুসন্ধান করলেও মিলবে না। বৌদ্ধপ্লাবনে বাঙলাদেশ থেকে হিন্দু ধর্ম্ম এমন আশ্চর্য্য-ভাবে নিঃশেষ ও লোপপ্রাপ্ত হয়েছিল যে আদিশূরের সময় বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ চেষ্টা করেও একজনও পাওয়া যায় নি। তাই রাজা কান্যকুব্জ থেকে মাত্র পাঁচজন সুব্রাহ্মণ নিয়ে এসে বাঙলায় বসবাস করিয়েছিলেন। এঁরা পাঁচজনে বঙ্গদেশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বাঙলার নবব্রাহ্মণের খাঁটিত্ব কোথায়? আর এক আশ্চর্য্য কথা এই

যে, মাত্র পাঁচজনের বংশ বরাবর সোজাসুজি চলে এসে নব বাঙলায় এই ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হল। নানাজাতির মেলামেশা অনেকদিন ধরেই হয়েছে—এই আমাদের প্রতিপাদ্য,—তাই এসব ঘটনার উল্লেখ করছি। রিস্‌লি প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদের মতে অনেক নূতন অনার্য্যজাতি হিন্দু সমাজের পার্শ্বে বসবাস করতে করতে ক্রমে হিন্দু হয়ে গেছে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আসামে আহোম নামে এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ ছিল। তাঁরা প্রথমে ছিলেন মঙ্গোলীয়; তাঁদের আদি বাসভূমি শ্যামদেশ, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ করে তাঁরা অবশেষে হিন্দু এবং ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হলেন। সুতরাং দেখুন, আমরা যে জাতি বলে চীৎকার করে থাকি এবং কারও স্পর্শে বা জল গ্রহণে জাত্ গেল ভেবে প্রমাদ গণি, তার মূলে প্রকৃত সত্য পদার্থ কিছু আছে অথবা তার ভিত্তি একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কারের উপর, যা কোন কালেই যুক্তি বা বিচারসহ নহে?

তারপর আমাদের এই বাঙলাদেশের কৌলিন্য প্রথার কথা ধরা যাক। বল্লালসেনের সময় এই প্রথার প্রচার হয়। "নবধা কুললক্ষণম্"—কুলীন হতে হলে আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি সদগুণের অধিকারী হতে হয়। গুণের উপর কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠা হলেও এই মর্য্যাদার অধিকারী হলেন একমাত্র ব্রাহ্মণেরা; যেন গুণরাশি ব্রাহ্মণেরই একচেটে, আর ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই একেবারে নির্গুণ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, গুণ কি বাস্তবিক বংশপরম্পরাগত হয় অথবা বিদ্যাশিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির উপর গুণের বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে? কথাটা এতই সোজা যে স্কুলের ছোট ছেলেও অনায়াসে বুঝতে পারে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পুত্র হলেই কি প্রতিভার অধিকারী হতে হবে? সেক্সপীয়রের বা মিলটনের বংশে তাঁদের মত প্রতিভা আর জন্মগ্রহণ করেছেন কি? পৃথিবীতে বরং ঠিক এর উল্টাই দেখা যায়। প্রকৃতির কেমন আশ্চর্য্য খেয়াল যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির বংশে সেরূপ গুণান্বিত পুরুষ আর প্রায় জন্মায় না।

আর প্রতিভার কথা ছেড়ে দিলেও যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে গুণী কুলীন, তাঁর সন্তান যে মাতৃগর্ভ থেকে নয়টি গুণ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে এমন সম্ভাবনা একটুও নেই। কুলীনের ছেলে নামে "কুলীন" হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে

হবে কাঁটাগাছ উর্ব্বর ক্ষেত্রেও জন্মায়। সুতরাং অপরকে হীন ও অবনত করে রেখে, আর এরকম একটা অন্যায় গণ্ডী টেনে, আপনার জাত বাঁচিয়ে চলবার মূলে কি যে সৎ উদ্দেশ্য বর্তমান আছে, তা দেবতা হয়ত বা বুঝলেও বুঝতে পারেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধির তা অগম্য। আবার শুনুন, আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঘটকপ্রবর দেবীবর বামুনদের মধ্যে মেল বাঁধলেন—বংশের দোষ দেখে দেখে, এক রকমের দোষীদের একত্র করে করে। ফলে একই জাতি থেকে আবার বহু প্র-পরা-উপজাতির সৃষ্টি হল। সমাজবিধি হল এই যে, মেলে মেলে বিবাহ দিতে হবে, মেলান্তরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করলে একবারে কৌলিন্য-বিচ্যুতি অর্থাৎ মেলগত দোষকে বংশে কায়েমি করে না তুললে সমাজে হীন হতে হবে! "অঘরে" মেয়ে দিলে কুল যাবে। সুতরাং কন্যাকে "সঘরে" অর্থাৎ নিজের গণ্ডীবদ্ধ মেলের ভিতর পাত্রস্থ করাটাই কুলীন পিতার বাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ফল হল বড় বিষময়। পাত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় "কুলীনের কুলরক্ষা করাই কুলীনের ধর্ম্ম" হয়ে উঠল। আর ব্রাহ্মণের ছেলে কদাপি ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ নন! তাই পূর্ণ উদ্যমে কেউ ৬০, কেউ ৭০, কেউ বা ৮০টি পর্যন্ত বিবাহ করে বসলেন এবং পাকা খাতায় বিবাহের "লিষ্টি" করে রেখে দিলেন। এসব "নিশার স্বপন সম ভাবিছ অলীক?" কিন্তু তা নয়, অনেক ভুক্তভোগী বৃদ্ধ এখনও বেঁচে আছেন। এ সকল কথা বলবার একমাত্র কারণ এই যে, গুণ কখনও বংশগত হয় না এবং অন্যায় অবিচারের গণ্ডী টেনে যারা আপনার দেশবাসীকে নির্ম্মম ভাবে পরস্পর থেকে তফাৎ ক'রে দেয়, তাদের জীবন সকল দিকেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে, উচ্চ আদর্শ বা সৎ সঙ্কল্পের কথা তারা প্রায় ভুলে যায়।

অপরকে হীন অন্ত্যজ নীচ ছোট লোক বলে ঘৃণা করবার অধিকার আমাদের কোথায়? আভিজাত্যহীন তথাকথিত নীচজাতির গৃহে কি পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নি? পৃথিবীতে যাঁরা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম্মজগতে যাঁরা একটা মহাপ্লাবন বহিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সব মহাত্মাদের অনেকেই আভিজাত্যমণ্ডিত ছিলেন না। যীশু ছুতোরের ছেলে, ভক্তবীর কবীরের জন্ম নীচ জোলার ঘরে। ভক্তমালে রুহিদাস প্রভৃতি অনেক সাধুর বর্ণনা আছে যাঁরা হীন বংশে জন্মলাভ

করেছেন। মান্দ্রাজে হীনবংশোদ্ভব অনেক তামিল সাধু ছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক পীর ছিলেন যাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দির ও দরগা নির্ম্মিত হয়েছে এবং উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের দেবজ্ঞানে পূজা করেছেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বামুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নি। বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ উচ্চ বংশোদ্ভূত নন—কেউ বা দাসীপুত্র, কেউ বা বেশ্যাপুত্র। সকল দেশেই এরূপ হয়েছে। মহাপুরুষগণ সকল দেশেই সমাজের সকল রকম স্তরে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং কেন এই কপটাচার, কেন এই ঘৃণা ও নির্ম্মমতা? কেন মানুষের মুখদর্শনে পাপ, তার ছায়াস্পর্শে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা?

অত্যাচারী রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের প্রজাশক্তি রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। এই অন্তর্বিপ্লবের ইতিহাস (Buckle's History of Civilization) পাঠ করলে, তৎকালীন ইংলণ্ডীয় সমাজের নীচ ও উচ্চ জাতি সম্বন্ধে একটা বড় কথা জানা যায়। কথাটা এই যে, যতদিন প্রজা-শক্তিকে চালিত করবার জন্যে উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিকে সেনাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়েছিল, ততদিন প্রজাপক্ষ জয়লাভ করেনি। তারপর যখন জন-সাধারণের মধ্য থেকে যুদ্ধনেতার আবির্ভাব হল, তখন রাজার দল পরাজিত হল, জনসাধারণের চেষ্টা জয়শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠল। নেপোলিয়ন তাঁর ভগ্নী কারোলিনাকে মুরা নামক যোদ্ধার হাতে সম্প্রদান করেন; তিনি সরাইওয়ালার (inn-keeper) পুত্র ছিলেন। নেপোলিয়নের নিকট পুরুষকার আভিজাত্যের একমাত্র নিদর্শন ছিল। তিনি কি সৈনিক বিভাগে, কি শাসন বিভাগে, যোগ্যতা ও গুণ অনুসন্ধান করে সমাজের যে কোন স্তর হতে লোকদের উন্নীত করতেন।

নেপোলিয়নের কার্য্যনীতির একটা বিশেষ অঙ্গ এই ছিল যে, তিনি বরাবর গুণেরই আদর করতেন। যথার্থ গুণী, তা সে সমাজের যে-স্তর থেকেই আসুক না কেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সামরিক রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হত। কর্ম্মতৎপরতার ফলস্বরূপ লোকের পদোন্নতি লাভ হত। তার কোন্ কুলে জন্ম সে পরিচয় কেউ নিত না। ক্রম্‌ওয়েল মদ প্রস্তুত করতেন। তিনি যে-সকল সেনানায়ক নিযুক্ত করতেন

তার মধ্যে অনেকেই নীচবংশোদ্ভূত—কেউ বা মুদি, কেউ বা ফেরিওয়ালা, কেউ বা পরিচারক, কেউ বা ভিক্ষান্নপালিত, কেউ বা চামার, কেউ বা মুচি, কেউ বা "জুতি-সেলাই"! বক্‌ল বলছেন "The highest prizes being open to all men, provided they displayed the requisite capacity." এই "জুতি-সেলাই" বলতে আর একটি কথা মনে পড়ল। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অগ্রণী বিখ্যাত উইলিয়ম কেরীও এই ব্যবসায়ী ছিলেন। অর্থাৎ আমার প্রতিপাদ্য এই যে, জাতিভেদরূপ বিষময় প্রথার এই ফল দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশে যারা হীন শ্রেণীর তারা এমন পদদলিত, অবমানিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত যে, কোন সুযোগে তাদের প্রতিভা বিকশিত হবার ও ভদ্রশ্রেণীস্থ হবার উপায় নেই।

সুতরাং বর্ত্তমান ইউরোপ বা আমেরিকায় জাতিভেদ আছে, অতএব আমাদের দেশেও জাতিভেদ কোন ক্ষতির কারণ হতে পারে না—এই বলে চীৎকার করে যাঁরা পুরাতনের কঙ্কাল এখনও আঁকড়ে ধরে রাখতে চান, তাঁরা একবার যুক্তিসহকারে বিবেচনা করে বুঝে দেখবেন যে, পাশ্চাত্য দেশে আভিজাত্যের সম্মান এদেশের মত একটা নিছক পাগলামি নয়। তাঁতি, জোলা, গাড়োয়ানের ঘর থেকে এদেশে ক'জন বড়লোক হবার সুযোগ পেয়েছে? এদেশে যদি তেলির ঘরে জন্ম হল ত মানুষ চিরকাল তেলিই রয়ে গেল,—সে যত গুণের গুণী হোক না কেন সমাজে খানিকটা হেঁট হয়ে থাকতেই হবে, গুণ থাক্‌লেও সমুচিত আদর সে কখনও পাবে না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আজ লর্ড হয়েছেন বিলাতী আভিজাত্যের নিয়মে। কিন্তু আমাদের দেশে যিনি কুলীন বামুন হয়ে না জন্মেছেন তিনি আর তা হতে পারবেন না। লর্ড রবার্টস্ জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন সামান্য সৈনিক; কিন্তু সামরিক বিভাগে অসাধারণ গুণপনার পরিচয় দিয়ে শেষে সমাজে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য লাভ করেছিলেন। লর্ড কিচনারও তাই। এরূপ আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা বিদ্যাবিজ্ঞানে, ব্যবসাবাণিজ্যে কৃষিশিল্পে—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে গুণের পরিচয় দিয়ে, অসাধারণত্ব দেখিয়ে, সামান্য থেকে বড় হয়ে উঠেছেন এবং পাশ্চাত্য সমাজ তাঁদের বড় বলে শ্রেষ্ঠ বলে, গুণান্বিত বলে আদর করে বরণ করে নিয়েছে। ইংলণ্ডে

চাষার ছেলে, মুদীর ছেলে, অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করে, অভিজাত শ্রেণীর সকল প্রকার রীতি-নীতি আচার ব্যবহারের সাথে পরিচিত হয়। এইরূপ লেখাপড়া শিখে গুণী হয়ে সে পুরাদস্তুর Gentleman হয়। আমেরিকায় প্রজাশক্তির চূড়ান্ত উন্মেষ হয়েছে; তাই সেখানে দেখা যায়, সামান্য কুটীরে জন্মগ্রহণ করে সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তর থেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তরে উঠেছিলেন মহামতি গার্ফিল্ড। সে দেশে আজ যে মুটে মজুর খানসামার কাজ করছে, কাল সে বিদ্যার্জ্জনের জন্য স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। কেউ বা যে-কলেজে চিমনী-পরিষ্কারকের কাজ করে, সেই কলেজেই আবার পড়ছে। তার সহপাঠী ক্রোড়পতির সন্তান যদি তাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে, তবে সেই ধনী সন্তানকে নানাপ্রকার লজ্জা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। সেখানে আজ যে কাঠ কাটে, আর একদিন সে দেশের রাষ্ট্রনায়ক (president) হবার আশা রাখতে পারে।

সুতরাং এমন বড় কুলীন সেখানে কে আছে যে তাঁকে কন্যাদান করবে না? আমি এখানে পাশ্চাত্য সমাজনীতির বিচার করছি না। আমার প্রতিপাদ্য এই যে, পাশ্চাত্য দেশের জাতিভেদ ও ভারতবর্ষের জাতিভেদের মধ্যে তফাৎ অনেক। আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করে নি; আপন ভাইকে পর ক'রে দিয়েছে, তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে; সে তুচ্ছ ঘৃণ্য, সে অযোগ্য ও জঘন্য, এই কথাই প্রচার করে এসেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের জাতিভেদ মানুষে মানুষে ব্যবধানের এমন অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রাচীর তুলে দেয় নি, মানুষের উন্নতি ও বিকাশের পথে এমন অন্তরায় হয় নি।

বাঙলাদেশের লোকসংখ্যা এখন সাড়ে চার কোটি। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য মিলে মোট ২৩ লক্ষ মাত্র। সমস্ত লোকসংখ্যার তুলনায় এঁরা ক'জন? সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু লেখাপড়া, জ্ঞানের অনুশীলন এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা এঁদের মধ্যেই অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সকল জাতি প্রায় এসব বিষয়ে এঁদের বহু পশ্চাতে পড়ে আছেন। এক্ষণে আপন শিক্ষা দীক্ষা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান

ও জ্ঞানান্বেষণের ধারাকে দিন দিন পুষ্ট ও প্রবল করে তুলে যদি সমগ্র জাতিকে বেঁচে থাকতে হয়, তবে প্রকৃত কর্ম্মীর আবির্ভাব ২৩ লক্ষ উঁচু জাতের মধ্য হতে অধিক সংখ্যক হবে, অথবা যাদের আমরা নীচ জাতি আখ্যা দিয়ে দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছি, সেই চার কোটিরও অধিক জনসঙ্ঘ অধিক সংখ্যক কাজের লোক উৎপন্ন করে সমাজকে পুষ্ট করবে? সকল দেশে সমাজের সর্ব্বপ্রকার স্তর হতে প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে আজ একবার আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, এই বিরাট জনসঙ্ঘকে নিকৃষ্ট বলে অবজ্ঞা করে আমরা কত উৎকৃষ্ট জিনিসের অপচয় করছি। সামাজিক অত্যাচারে ও শিক্ষা দীক্ষার অভাবে আমাদের কতটা শক্তি বিকাশলাভ না করে লোক চক্ষুর আড়ালে মুষড়ে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে হচ্ছে। বাঙালীর আজ সামরিক বিভাগে প্রবেশের পথ কতকটা উন্মুক্ত হয়েছে; ক্রমে আরও উন্মুক্ত হবে। বাঙালী সেনা নিয়ে যে সৈন্যদল গঠিত হবে, তাতে কি শুধু উচ্চ জাতেরই লোক থাকবে অথবা সমাজের সকল স্তর থেকে সুস্থ ও সবলদেহ লোক সংগ্রহ করে সেই সৈন্যদলকে পরিপুষ্ট করতে হবে? বাঙলায় মুসলমানের সংখ্যা অর্দ্ধেক; তাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, সুতরাং তাদের কথা এখন বাদ দিলাম। কিন্তু বিভিন্ন জাতির হিন্দু সেনা যখন কোন অভিযানে বাহির হবে, তখন বামুন রাঁধুনির অভাব হলে কি তারা যে যার হাঁড়ি মাথায় করে কুচকাওয়াজ করবে? আজকাল ট্রেঞ্চ অর্থাৎ খাদের মধ্যে আত্মগোপন করে যুদ্ধ করতে হয়; সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেই শত্রুর গুলিতে বিদ্ধ হতে হবে। সুতরাং শাণ্ডিল্য বাৎস্যায়ন বা ভরদ্বাজ—এঁদের মধ্যে কার বংশধর ট্রেঞ্চে খাবার যুগিয়ে দিয়ে গেল, তার আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলে সে-খাবার কখনও মুখে তুলতে হবে না। আজ এই বিজ্ঞান-প্লাবনের যুগে সকল দেশে সকল সমাজের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে। এই সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টায় যে যে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিতে হবে, তার মধ্যে জাতিভেদের কঠোর নির্ম্মমতা প্রথম এবং প্রধান।

জাতিভেদের বজ্রকঠোর বন্ধন বাঙলা দেশে তবু ত অনেকটা শিথিল হয়েছে। বাঙলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের পরই নবশাখ জাতি সমাজে স্থান পেয়েছেন এবং তাঁদের জল "চল" হয়েছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও শিক্ষাদীক্ষার গুণে অন্য অন্য অনেক জাতি বাঙলাদেশে ক্রমে মুখ তুলে দাঁড়াচ্ছেন এবং এক "অচলায়তনে"র নিতান্ত গোঁড়া বামুন ছাড়া আর কেউই তাঁদের ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দিচ্ছে না. কিন্তু মান্দ্রাজে জাতিভেদের শাসন এখনও বড় ভয়ানক। সেখানে আয়ার ও আয়েঙ্গারগণ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই নীচ ও অস্পৃশ্য। নবশাখ প্রভৃতি যে সব জাতি বাঙালী হিন্দু সমাজে একটা মাঝামাঝি স্থান অধিকার করে আছেন, মান্দ্রাজী হিন্দু সমাজে সেরূপ কিছু নেই। মান্দ্রাজে পেরিয়া নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাদের অবস্থা বড়ই হীন। তারা বংশের পর বংশ ধরে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করেই থাকে। তাদের ছায়াস্পর্শ করলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এতই তারা অভিশপ্ত ও অপবিত্র! স্বর্গগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তামিল দেশ ভ্রমণকালে এক সম্প্রদায় লোক দেখেছিলেন; তারা দূর থেকে চিৎকার করতে করতে আসে—"মহাশয় সরে যান, আমি অধম যাচ্ছি",—পাছে তার ছায়াস্পর্শে ব্রাহ্মণের পবিত্রতা উবে যায়, তাই এই ব্যবস্থা। আবার কোন হতভাগ্যের গলায় ঘণ্টা বাঁধা আছে। চলতে গেলেই ঘণ্টা বাজে, আর সেই শব্দ শুনে শুচি ব্রাহ্মণ অশুচির আগমন-বার্ত্তা জানতে পেরে ছুটে পালান। আবার এই সকল নীচ জাতের নাম শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। সেখানে বামুনদের নাম রামস্বামী, কুমারস্বামী; কিন্তু এইসব অন্ত্যজ বংশীয়দের নাম হবে সাপ, ব্যাঙ, পিঁপড়ে, কেঁচো, ছুঁচো! কি ভয়ানক ব্যাপার! বাঙলার হাড়ি ডোম চণ্ডাল মুদ্দফরাস ওদের চেয়ে ঢের ভাল আছে—তাদের আরও ভাল আরও বড় করে তুলতে হবে—গুণবান শীলবান হলে তারাও ব্রাহ্মণের সম্মান পাবার অধিকারী একথা মনে রাখতে হবে।

আমরা যে কারণে ইংরেজের নিকট রাজনৈতিক অধিকারের দাবী করছি, নীচজাতি বলে যাদের ঘৃণা করি তারাও ঠিক সেই কারণেই সামাজিক অধিকার দাবী করছে। বাঙলা দেশে জাতিভেদের কঠোরতা

কম; তবুও এখানে নমঃশূদ্র ও পোদ প্রভৃতি জাতি লেখাপড়া শিখে সামাজিক অত্যাচারের কারণে উঁচুজাতের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠছেন। মান্দ্রাজের ডাক্তার নায়ার অব্রাহ্মণ সমাজের মুখপাত্র স্বরূপে একটি দল বেঁধে গেছেন। সেই দল এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কতকটা এক হয়ে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের পথে বাধা দিচ্ছেন। বাঙলা দেশে নমঃশূদ্রের মধ্যেও এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। এঁরা বল্‌ছেন—নূতন শাসন-সংস্কারে অব্রাহ্মণদের স্বত্বরক্ষার জন্য যদি গোড়া থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়—তবে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে নূতন সুখসুবিধার সব অধিকারই ক্রমে ব্রাহ্মণগণ একচেটে ক'রে নেবে। তা ছাড়া আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা লোকসংখ্যা হিসাবে অর্দ্ধেক ব'লে communal representation সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বাগিয়ে নিচ্ছেন। এই সকল মতামতের ভালমন্দ আলোচনা করবার জন্য আমি একটা কথাও বলছি না। আমি বলতে চাই এই যে, এদিকেও আমাদের সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। যে অধিকারটুকু ইংরেজ আমাদের দিতে চায় আমাদেরই দেশবাসী আজ তাতে আপত্তি তুলছে; কেন না, আমরা অনেক কাল ধরে তাদের ঘৃণা করেছি এবং এখনও করছি; তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।

জাতির গঠন ও বিকাশে এই জাতিভেদ অনেক পরিমাণে বাধা দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান নেই; তার উপর ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা এই রব করতে করতে সকলেই এক একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। হিন্দুমুসলমান ত বরাবরই আলাদা হয়ে আছে। এ অবস্থায় কবি ভাবের আবেগে বলে থাকতে পারেন "একবার তোরা জাতিভেদ ভুলে" ইত্যাদি। কিন্তু এতদিনের বন্ধন এক কথায় খসে পড়বে কি? আমার লিখিত "হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস" History of Hindu Chemistry নামক পুস্তকের "বিজ্ঞান ও শিল্পের অবনতি" (Decline of Science) শীর্ষক অধ্যায়ে আমি জাতি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছি। চরক ও সুশ্রুত দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর দুখানি মহাগ্রন্থ। এতে অবস্থা-বিশেষে এমন কি গোমাংস খাবারও কথা আছে। সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদের রীতিমত

ব্যবস্থা ছিল ; কিন্তু মনু মহাশয় বলেন, শব স্পর্শ হলে জাতিচ্যুত হতে হবে। সুতরাং ব্যবস্থা হয়ে গেল, শবব্যবচ্ছেদের স্থানে অতঃপর লাউব্যবচ্ছেদ হবে ; অর্থাৎ লাউ কেটে মনুষ্য-শরীরের শিরা-উপশিরা প্রভৃতির সংস্থান জানতে হবে। ব্যবস্থাটা কতকটা সেই কলাগাছ বিয়ে করার মত নয় কি? জাতিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে এমনি করে যখন স্বাধীন চিন্তার গলা টিপে মারা হল, তখন ৬৪ কলাবিদ্যা লোককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বিজ্ঞানের যা কিছু রইল—তা Surgeon পরামাণিক, Botanist বেদে, আর Metallurgist ভীল কোল সাঁওতালের হাতে। আঙুলের নৈপুণ্যে ঢাকাই মসলিন অতি সূক্ষ্ম হল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের দৌড় ওই "পাত্রাধার-তৈল" বা "তৈলাধার পাত্র"-এর বেশী আর গেল না। বুদ্ধি জড় ও আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তাই পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের দ্বারা বস্তুর প্রকৃতি বিচার করে, ঘটনা পরম্পরার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা লুপ্ত হল। সামাজিক অত্যাচারের ফলে সাধারণ লোক অস্পৃশ্য ও মূর্খ হয়ে পশুত্বে নেমে গেল। ওদিকে ইংলণ্ডে আর্করাইট নাপিত ছিলেন, ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতেন—কিন্তু স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে বস্ত্রবয়ন-কল আবিষ্কার করে যুগান্তর উপস্থিত করলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে কোন্ নাপিত এ প্রকার কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম? তাই এদের মধ্য থেকে জেমস্ ওয়াট বা আর্করাইটের উদ্ভব অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে স্বাধীনচিন্তা ও কর্ম্মশক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তার জন্য জাতিভেদ বড় কম দায়ী নয়।

প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁর New Freedom নামক পুস্তকের এক স্থানে আমেরিকার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলছেন যে, সে দেশের রাস্তার মুটে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনায়ক হবার আশা পোষণ করতে পারে ; কে দেশের নেতা হবে এবং কোন কূলে তার জন্ম হবে যুক্তরাজ্যে একথা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। সুবিধা ও সুযোগ জনসাধারণের সকলের কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত ; সুতরাং সমাজের যে কোন স্তর থেকে সেখানে দেশনায়কের উদ্ভব হতে পারে। প্রেসিডেন্ট উইলসন আরও বলেন যে,

সমাজের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি পুষ্ট হয় নিম্ন স্তরের লোকের দ্বারা। জনসাধারণের মধ্য হতেই যথার্থ শিক্ষিত ও গুণসম্পন্ন লোক উদ্ভূত হয়ে দেশের ভাব ও কর্ম্মের ধারাকে নানা অবদান-পরম্পরায় বিচিত্র করে তোলে। এই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে সমাজের উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় লোকের সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। সমাজ-দেহের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সকল প্রকার পুষ্টির উপাদান জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, উচ্চস্তরের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেরূপ থাকা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং "জাতের" দোহাই দিয়ে সেই জনসঙ্ঘকে পদদলিত করে আমরা জাতিগঠনে যে কত বাধার সৃষ্টি করেছি তা বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনার অধিগম্য। বর্ত্তমানে আমাদের শাসন-সংস্কারের দাবীকে ইংরেজ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের চিৎকার বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণ যখন একবার এই দাবী করবে তখন কেউ তাকে আটকাতে পারে কি? পৃথিবী জুড়ে জনসাধারণের যুগ এসেছে। আমাদের এই যুগকে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরণ করে নিতে হবে। আপনার দেশভাইকে অস্পৃশ্য বলে আর দূরে রাখলে চলবে না।

এখন আমরা সভ্যজগতে সকল জাতির সঙ্গে এক আসরে বসতে চাই; পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) স্থান পেতে চাই। কিন্তু অন্যে আমাদের কি চক্ষে দেখে আজ তা তোমাদের ভেবে দেখতে হবে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে ভারতবর্ষের যোগ্য প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সে আরম্ভ মাত্র—কোকিলের প্রথম গান বসন্তের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে মাত্র। দারিদ্র্য ও সামাজিক অত্যাচার প্রভৃতি নানা দোষের জন্য আজও আমরা অন্য জাতির অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছি। আমাদের অন্তর সমৃদ্ধ হয়ে অদূর ভবিষ্যতে নানা কর্ম্মে ও বৈচিত্র্যে বিকাশ লাভ করবে না কি? দেশীয় রাজ্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ স্যর টি মাধব রাও হিন্দুসমাজের বৈষম্যকে লক্ষ্য করে বড় দুঃখে বলেছেন—এই সব বৈষম্য ও তজ্জনিত ক্লেশ আমরা আপন হাতে সৃষ্টি করে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। সুতরাং সত্যভাবে চেষ্টা করলে এর প্রতিবিধানও আমাদের আপনারই হাতে।—আমাদের যুক্তি নেই, বিচার নেই, কুফলপ্রসূ অতি তুচ্ছ লোকাচারকে

আমরা মনু রঘুনন্দন প্রভৃতির দোহাই দিয়ে সাগ্রহে আঁকড়ে থাকি। "কেন" বলে কেউ যদি প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিই—"কি আশ্চর্য্য! ও যে চিরকাল হয়ে আসছে গো।" আমরা বিলাতী বিস্কুট খাব, বরফ দিয়ে সোডা লেমনেড খাব, কিন্তু জাতিবিশেষের কেউ যদি হাতে করে এক গ্লাস জল দেয়, অথবা আমাদের চৌকাঠ মাড়ায়, তাহলে অমনি চিৎকার—"জাত গেল, হাঁড়ি ফেল, স্নান কর।" অদ্ভুত ব্যাপার! তারই ফলে আমরা ব্রাহ্মণ-শূদ্র মিলে সকল জাতিটাই বিদেশের অগ্রসর জাতিদের কাছে হেয় অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় হয়ে আছি। যতকাল নিজেদের স্বভাব শোধন না করব, ততকাল এমনি থাকতে হবে। সুতরাং সাধু সাবধান!

বক্তৃতাটি "প্রবাসী" ১৩২৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে এই বক্তৃতা দেন।

প রি শি ষ্ট

আমি ও আমার জীবন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সত্তর পঁচাত্তর বছর আগে বাঙলার যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে আজ তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। তখন বাঙালীর ছিল গোলাভরা ধান, দেহ-জোড়া স্বাস্থ্য, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুর-ভরা মাছ। কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত সব ছিল বাঙালী। গেরস্ত ঘরে ঝি চাকর সবই ছিল বাঙলা দেশের লোক। জাতিগত বৃত্তি মেনে, তারা সুখে না হলেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। গ্রামে গ্রামে ছোট-খাট মুদির দোকান ছিল তিলি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া। একেবারে আলাদা মণিহারী দোকানেরও সৃষ্টি তখন হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি; তখন লোকের এত মণিহারী জিনিষের দরকারও হত না। বিলাসিতার মোহ পঁচাত্তর বছর আগে বাঙলাকে এমন করে পেয়ে বসে নি। লোকের আয় ছিল কম, ব্যয়ও ছিল কম। অল্প আয় নিয়েই তখনকার লোকেরা ছোটবড় সবাই বার মাসে তের পর্ব্ব করত। দিনের যে-কোন সময়েই অতিথি অভ্যাগত আসুক না কেন, অপরিচিত লোকের বাড়ীতেও দু চারটে ডালভাত মিলত। ছোটবড় সবাই ভিক্ষুককে দুমুটো চাল অন্ততঃ দিত ; খালি-হাতে তাদের ফিরিয়ে দিত না।

লোকের তখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল। সারাদিন নিজের কাজকর্ম্ম করে' সন্ধ্যা-বেলায় তারা কেউ কেউ তাদের সংসারের ছোট ছোট দরকারী কাজগুলো করত। কেউ বা বসে দড়ি পাকাত, কেউ বা বৃষ্টির দিনে কাজে লাগতে পারে বলে গোলপাতার টোকা অর্থাৎ একেবারে ভারতীয় ছাতা বানাত, কেউ কেউ আবার সুতো কাটতে আরম্ভ করত। এগুলো ঠিক কাজ হিসাবে করা হত না ; এগুলো অবসর কাটানোর উপায় ছিল। পাঁচজন একত্র বসে হাতে কাজ করত, আর মুখে গল্প করত। ফলে আনন্দও যেমন তারা পেত, সংসারের সাশ্রয়ও তেমনি হত। যারা বুড়ো তারা হয়ত রামায়ণ মহাভারত পড়ত। কিংবা গান-বাজনা করত। তখন লোকে সুরের জন্যে তত ব্যস্ত হত না—যতটা হত গানের ভাষার জন্যে। এখন যেমন গানের সুর বোঝা

যায়, ভাষা বোঝা যায় না—তখন তেমন ছিল না। সুর বাজার-চলতি হলেও গানের ভাষা শুনে তারা আহা আহা করত।

গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি উৎসব ছিল কত। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, রামায়ণ, কবি, জারিগান—এই সব গান তখন গ্রামে গ্রামে হত।

খোলা জায়গায় এই সব গান হত, আশে-পাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক এসে এগুলো শুনত। যারা শুনত তারা এগুলো সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত এবং দরকারমত এইগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিজেদের জীবন চালাত।

কিন্তু আজকের দিনে অবস্থা গেছে একদম বদলে। আমার বয়স হল আশি। আজ যদি পিছনের দিকে ফিরে তাকাই, তবে বেশ বুঝতে পারি তফাৎ কতটা হয়েছে। নিজের চোখে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না এ পরিবর্ত্তন সত্যি সত্যি কতটা।

আজকের দিনের অবস্থা বক্তৃতা করে বলার কিছু দরকার নেই। শ্রোতারা সবাই ত নিজের চোখেই এটা দেখতে পাচ্ছেন। পেটে ভাত নেই, পরণে ছেঁড়া কাপড়, চোখে নিরাশা নিয়ে হাজার হাজার ছেলে কলকাতা শহরের একদিক থেকে আর একদিকে "হা চাকরি হা চাকরি" করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দেখলে কার না দুঃখ হয়। ভাগ্যবলে দু'চার জন যারা চাকরি পেয়েছেন বা ব্যবসায় নাম করেছেন, তাঁদের সংখ্যা এত কম যে আমার মনে হয়, সে কয়টাকে বাদ দিয়েই দেশের অবস্থা আলোচনা করা ভাল। পাড়াগাঁয়ের অবস্থা আরও ভয়ানক। বৃত্তিজীবী যারা ছিল তারা আজ নিজের নিজের পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে।

চল্লিশ বছর হল জীবনযুদ্ধে আমার দেশবাসীর এই পরাজয়ের কথা আমি বলে আসছি—ফলে কিছু হয়েছে কিনা জানিনা। এখন জীবন-সন্ধ্যায় পৌঁছেছি—যে কোন সময়ে ওপারের ডাক এসে পৌঁছবে। কিন্তু এখনও চুপ করে থাকতে পারি না। যে কটা দিন থাকব ঐ একই কথা বলব—ভারতবাসী এখনও ফেরো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিল্প-বাণিজ্যে ব্যবসায়ে মন দাও—তবে যদি বাঁচতে পার, নইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভারতবর্ষের গত ১৭৫ বছরের ইতিহাস বড়ই দুঃখের ; কি কুক্ষণেই আমাদের মাথায় চাকরির নেশা ঢুকেছিল তা ভাবলে দুঃখ হয়। চাকরি পেয়ে আমরা ভাবলুম দিন

এমনি করেই যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য রসাতলে দিয়ে, আর একটা জালে আমরা নিজেদের জড়িয়ে ফেললুম—সেটা হল জমিদারী। চাকরি আর জমিদারীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডিগ্রীর মোহ এল। চাকরি করে জমিদারী কেনা হল একটা নেশা, আর ছেলেদের ইস্কুল-কলেজে পাঠাতে আরম্ভ করা হল সাধারণ নিয়ম। এই ছাত্রেরা আবার তাদের বাপ-পিতামহের চেয়ে একটু বেশী এগিয়ে গেল। তারা পুরোপুরী বিলাসী হল—আয়েশী হল; ব্যবসা মানে নিন্দের জিনিস, ছোট কাজ—এই হল তাদের ধারণা। এমনি করে ক্রমাগত সাতপুরুষ ধরে, হয় চাকরি নয়ত জমিদারী—এই নিয়ে মেতে রইল। এখন জমিদারী গেল দেনার দায়ে—ব্যবসা গেল বুদ্ধির দোষে।

আমি কারও নিন্দা করছি না। আমি শুধু ভুল কোথায় নিজের বিশ্বাস মত এই কথাই বলছি। অনেক আগে যাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল, তারা যদি আজও সাবধান হয়, তবে হয়ত এখনও চাকা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেদিকে কারও নজর দিতে দেখছি না।

আমার বয়স হয়েছে। জরাব্যাধির চিহ্নকে আর এখন তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারি না—তবু যদি শুনি কোথাও কেউ ব্যবসা করে উন্নতি করছে, অমনি আমার আনন্দ হয়। আমি সুযোগ পেলেই সেখানে ছুটে যাই।

যদি কোনদিন আমার এই রূঢ় কথায় কারও দৃষ্টি ফেরে, তবেই সার্থক হবে আমার সমস্ত সাধনা—শেষ বয়সের শেষের কথায় আমার দেশবাসীর কাছে এই আমার একমাত্র আবেদন।*

* ১৯৪০ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাত্রি ৮টার সময়ে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশন থেকে প্রচারিত আচার্য্যের বেতার বক্তৃতা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কয়খানি চিঠি

(চিঠিগুলি বিভিন্ন সময় শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত)

দ্রষ্টব্য—নিম্নে প্রকাশিত পত্রগুলি পুণ্যশ্লোক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক ১৯১৯ নভেম্বর হতে ১৯৩৯ নভেম্বর—এই বিশ বৎসর কালের মধ্যে লিখিত। পত্রগুলি প্রধানতঃ তাঁর বক্তৃতা, বক্তৃতার অনুলেখন ও প্রবন্ধাকারে সম্পাদন সম্পর্কে। তা ছাড়া চিঠিগুলি তাঁর বিমিশ্র-কর্ম্মব্যস্ত জীবনের এবং পিতৃতুল্য হৃদয়ের স্বচ্ছ স্নেহশীলতার গভীর পরিচয় দেয়।

১

College of Science,
Calcutta
7. 11. 19

My dear Ratanmoni,

আমি ১লা আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। যদি বক্তৃতাগুলির কিছু সুধারা করিতে পারিয়া থাক, তবে সুবিধামতে আসিয়া দেখা করিবে। অনেকস্থল হইতে এইগুলি পড়িবার জন্য আগ্রহ দেখিতেছি।

Yours sincerely
P. C. Roy

২

College of Science
1. 4. 20

My dear Ratanmoni,

জাতি-সমস্যা যথাসময়ে পাইয়াছি। লেখা সুন্দর হইয়াছে। আমি আর কিছু add করিয়া রামানন্দবাবুকে* দিব। বাকি প্রবন্ধটি সুবিধামত লিখিয়া ফেলিবে। আমি কাল সকালে টাকি-শ্রীপুর স্কুলে যাইতেছি। আশা করি সোমবারে ফিরিব।

Yours sincerely
P. C. Roy

* স্বনামধন্য 'প্রবাসী'-সম্পাদক ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

৩

Basirhat
5th April, 20

My dear Ratanmoni,

আমি আজ কলিকাতায় যাইতেছি। পরশু বুধবার Calcutta University Institute-এ ৬ টার সময় ছুঁৎমার্গতত্ত্ব (Touch-me-not-ism) বিষয় বক্তৃতা দিতে (হইবে)। যদি একবার আমার ওখানে ৫॥০ টার মধ্যে আসিতে পার চেষ্টা করিও।

Yours sincerely
P. C. Roy

৪

26. 4. 20

My dear Ratanmoni,

জাতিভেদ-সমস্যার final proof দেখিয়া দিয়াছি। তোমার reproduction অদ্ভুত ও উচ্চদরের হইয়াছে। আমি আগামী ১।২রা মে দেশে যাইব। ইহার মধ্যে বাকী প্রবন্ধটি হইবে কি না সন্দেহ। যদি সম্পূর্ণ করিতে পার, কৃষ্ণবাবুর* হাত দিয়া পাঠাইবে।

Yours sincerely
P. C. Roy

৫

College of Science
Calcutta,
The 30th July 1920

My dear Ratanmoni,

'অন্নসমস্যা' এক কপি পাঠাইয়াছি, বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। বাকি প্রবন্ধটি লিখিয়া উঠিতে পারিলে কি? আমি সম্ভবতঃ ২০শে আগষ্ট বিলাত রওনা হইব।

Yours sincerely
P. C. Roy

* বালিনিবাসী ৺কৃষ্ণধন গোস্বামী—কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন-পরীক্ষাগারে তৎকালে কাজ করিতেন।

৬

College of Science
Calcutta,
The 12th August 1920

কল্যাণবরেষু

কৃষ্ণবাবু মাং প্রবন্ধ পাইয়াছি। অতি সুন্দর reproduction হইয়াছে। ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি তুমি শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৭

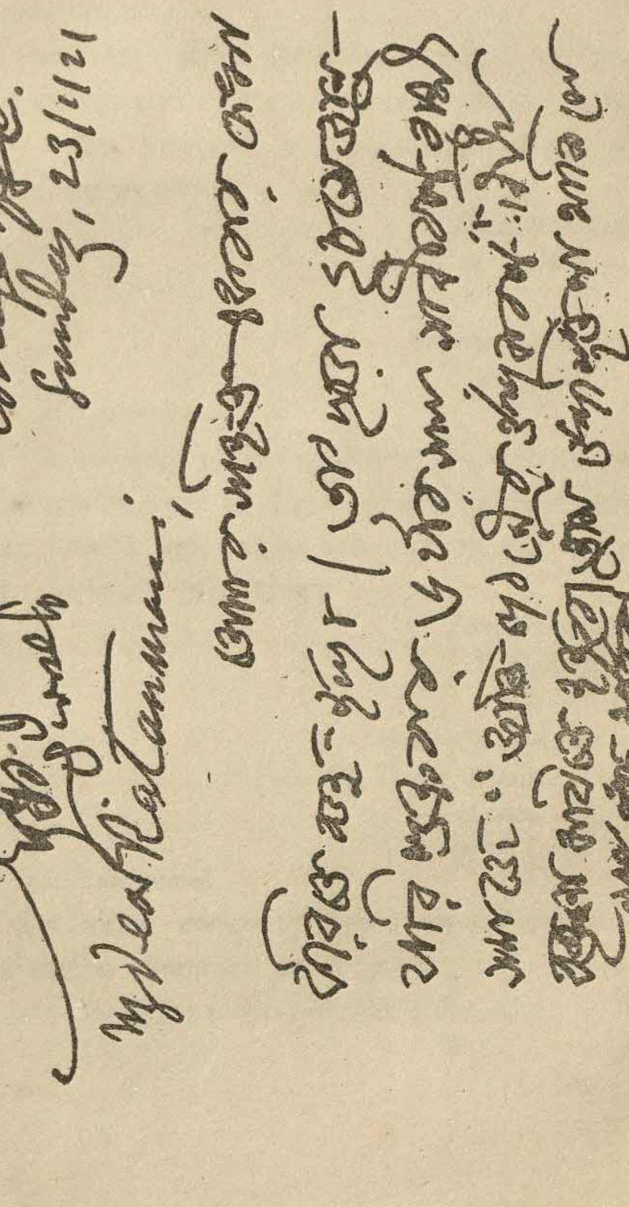
Cambridge
21. 11. 20

My dear Ratanmoni,

আমি ইংলণ্ডে আসিয়া নানা স্থানে (centres of scientific activity) পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। ছেলেবেলা 'বোধোদয়' পড়িতাম,অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অভিজ্ঞতা। এবং তাহাই আহরণ করিবার চেষ্টায় আছি। ঘরে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া আছি। জানালার কাচের মধ্য দিয়া দেখিতেছি চারিদিক ধবল তুষারাবৃত। আমি আশা করি ১০ই জানুয়ারি নাগাদ কলিকাতায় পৌঁছিব। আশা করি তুমি এখন ম্যালেরিয়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া করিতে পারিতেছ।

Yours sincerely
P. C. Roy

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হস্তলিপি



৮

College of Science
Sunday, 23. 1. 21

My dear Ratanmoni,

তোমার সহিত একবার দেখা করিতে বড় ইচ্ছা। তা' ছাড়া ২৮শে জানুয়ারি শুক্রবার ৬ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে "জাতি-গঠনের উপকরণ" বিষয় বক্তৃতা করিতে হইবে। তুমি উপস্থিত না থাকিলে সমস্ত পণ্ড হইবে।

Yours sincerely
P. C. Roy

৯

College of Science
29. 1. 21

My dear Ratanmoni,

আজ ১৬ই মাঘ। তুমি যদি প্রবন্ধটি ১লা ফাল্গুন অর্থাৎ এক পক্ষ পরে আমাকে দিতে পার, তবে চৈত্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ হইতে পারে। এমন কি ইহার আগেও মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতে পারি। আশা করি পারিয়া উঠিবে।

Yours sincerely
P. C. Roy

১০

College of Science
92, Upper Circular Road
Calcutta
(Post Mark 2. 2. 21)

My dear Ratanmoni,

আজ সকালে রামানন্দবাবু বক্তৃতার জন্য আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে ১লা ফাল্গুন পাইবেন। প্রবাসীতে space reserved রহিল। আশা করি তুমি পারিয়া উঠিবে।

Yours sincerely
P. C. Roy

১১

১১

College of Science
Calcutta
17. 2. 21

My dear Ratanmoni,

Many thanks for the article. I have handed it over to Ramananda Babu.

Yours sincerely
P. C. Roy

১২

College of Science
Calcutta
7. 3. 21

My dear Ratanmoni,

আমাকে আগামী বুধবার (9th March) ৪টার সময় Chinsura Exhibition খুলিতে হইবে। সেই সময় Industry ও Agriculture সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে। তুমি Reporter স্বরূপ উপস্থিত থাকিলে আমার inspiration আসে। যদি উপস্থিত থাকিতে পার বড় ভাল হয়। গত বক্তৃতার reproduction এমন উচ্চাঙ্গের হইয়াছে যে সকলেই অবাক্ হইতেছে। তোমাকে স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইবার জন্য Exhibition-এর Secretary-কে পত্র লিখিলাম। যদি পাইতে বিলম্ব হয় এই কার্ডখানা তোমার সহিত রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। পারতপক্ষে যাইতে ত্রুটি করিও না।

Yours sincerely
P. C. Roy

১৩

12. 3. 21

My dear Ratanmoni,

I shall be returning from Naogaon on Thursday next (17th March). If you can submit the M. S. on that day through Krishna Babu, I can get it published in the বৈশাখ issue. Please remember also that the Oriental Seminary prize distribution comes off on the 19th inst.

Yours sincerely
P. C. Roy

১৪

Science College
17. 3. 21

My dear Ratanmoni,

আমি আজ প্রত্যূষে নওগাঁ হইতে ফিরিয়াছি। আগামী পরশু শনিবার (১৯শে) ৫ টার সময় Oriental Seminary-র prize distribution হইবে। তুমি যদি আসিতে পার বড় ভাল হয়। আমার আবার সেদিন Senate-এর meeting আছে। তুমি যদি আমার ঘরে আমার জন্য ৪ টার সময় অপেক্ষা কর তবে ভাল হয়। আমি তোমাকে যথাসময়ে তুলিয়া লইয়া যাইব।

Yours sincerely
P. C. Roy

১৫

College of Science
92, Upper Circular Road
Calcutta
22. 2. 22

My dear Ratanmoni,

তুমি চলিয়া যাইবার কিছু পরেই জানিলাম যে আগামী রবিবার আমি booked—শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে prize distribution করিতে হইবে। পরের রবিবারে হরিনাভি যাইতে হইবে। স্থতরাং আপততঃ উত্তরপাড়ায় স্থগিত থাকুক।

Yours sincerely
P. C. Roy

১৬

College of Science
18. 4. 22

My dear Ratanmoni,

'প্রবাসী'-তে আজ 'সাধনা ও সিদ্ধি' এক নজরে পড়িলাম। আমি হ য ব র ল যাহা বলিয়া যাই তাহা যে এমন করিয়া গাঁথা যায়, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে—তবে এই হারে রতনমণির রতন ছড়ান আছে বলিয়া এত স্থন্দর হইয়াছে।

Yours sincerely
P. C. Roy

পুঃ—'আর্ট ও আহিতাগ্নি' পাইলাম।

১৭

College of Science
19. 8. 22

My dear Ratanmoni,

আগামী শনিবার (২৬শে আগষ্ট) ৫৷৷০ টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আমায় বক্তৃতা করিতে হইবে। তুমি যদি এখানে ৪ টার মধ্যে পৌঁছিতে পার ভাল হয়। তুমি reporter না থাকিলে সবই পণ্ড হইয়া যায়।

তাঁত-চরকা কেমন চলিতেছে ? আবার জ্বরে পড় নাই ত ?

Yours sincerely
P. C. Roy

১৮

College of Science
Calcutta
25. 8. 22

My dear Ratanmoni,

তোমার মনে আছে বোধ হয়, কাল (শনিবার) ৫।৷০ টার সময় ভবানীপুরে আমার বক্তৃতা। আশা করি ৪টার সময় আমার এখানে উপস্থিত হইবে এবং রাত্রে আমার কাছে থাকিবে। ইতি

Yours sincerely
P. C. Roy

১৯

College of Science
92, Upper Circular Road
Cal. 1. 10. 22

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে এখান হইতে বিজয়া দশমীর "কোলাকুলি" অর্পণ করিতেছি। এবার যে রকম অজস্র বর্ষা চলিতেছে, তাহাতে বালিতে থাকিয়া যে জ্বরে ভুগিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমার এখানে দিন কতক অবস্থিতি কর, তাহা না হইলে ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। লেখাটি সুস্থ হইলে সুবিধামতে অর্পণ করিও।

বর্ষা চলিয়া গেলে তোমার ওখানে একদিন যাইব, তবে বালি যেরূপ নির্জীব স্থান—বিশেষত daily passenger-এর এলাকার ভিতর—সেখানে যে তাঁত-চরকার প্রচলন হইবে ইহা বড় আশা হয় না। অত্রত্য মঙ্গল, ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

২০

College of Science
92, Upper Circular Rd.
Calcutta
Jan. 7. 1923

My dear Ratanmoni,

অনেক দিন তোমার খোঁজ খবর পাই নাই—আমিও এখন ঘুরপাকে পড়িয়া সমস্ত বাঙ্গালা, এমন কি ভারতবর্ষময় বেড়াইতেছি যে নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাই না। ২৮শে জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তুমি যদি আমার নিকট সেই তারিখে আসিতে পার তো বিশেষ ভাল হয়। তোমার Press কেমন চলিতেছে? আমায় মাঝে আবার অনেক জায়গায় যাতায়াত করিতে হইবে। ইতি—

Yours sincerely
P. C. Roy

২১

University College of Science
Calcutta
30. 3. 23

My dear Ratanmoni,

এইবারকার মাসিক বসুমতীতে অন্নসমস্যাঘটিত প্রবন্ধ বার হইয়াছে দেখিয়া থাকিবে। সকলেই পড়িয়া রচনা-চাতুর্য্যে অবাক্ হইতেছে। আমি বলিয়া থাকি 'রতন ও মণি' একসঙ্গে হইলে অনেক কাজ হয়। ভারতচন্দ্র গাহিয়াছেন 'যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন'। কাল ভবানীপুরে এক ঘণ্টা যাবৎ একটি বক্তৃতা করিয়াছি। আবার আজ যশোর যাইতেছি। রতনমণি সঙ্গে না থাকায় আমার শ্রম পণ্ড হইয়া যাইতেছে। তুমি যদি পার ২রা, ৩রা লাগাইত একবার দেখা করিবে।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

২২

College of Science
22. 6. 23

My dear Ratanmoni,

কালকার ভবানীপুরের meeting ৬॥০ সাড়ে ছয় টায়। আর আমার pottery-র meeting ৪॥০ টায়। আমি ৬ টার পূর্ব্বে ওখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। আমার জন্য অপেক্ষা করিও।

Yours sincerely
P. C. Roy

২৩

College of Science
Aug. 18. 1923

My dear Ratanmoni,

আগামী শুক্রবার ২৪শে আগষ্ট ৬টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আমায় বক্তৃতা করিতে হইবে। তুমি না আসিলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে। আশা করি ঐ দিন ৫ টার মধ্যে আমার এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

Yours sincerely
P. C. Roy

২৪

College of Science
Aug. 23. 1923

My dear Ratanmoni,

পর পর তোমাকে দুইখানা কার্ড লিখিয়াছি জবাব পাই নাই। আমার ভয় হইতেছে—তোমার ডেঙ্গু হইয়াছে কি? সর্ব্বত্রই epidemic। তোমাকে জানাইয়াছি ২৯শে আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আমার বক্তৃতা। এই জন্য তোমাকে জানাইয়াছিলাম—ঐ তারিখে অন্যূন ৫ টার মধ্যে আমার এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে—তুমি না আসিলে সব পণ্ড হইবে।

Yours sincerely
P. C. Roy

২৫

College of Science
Calcutta
3. 10. 23

My dear Ratanmoni,

তোমার নিকট লিখিত অনেকগুলি পত্রের উত্তর না পাইয়া আমি ঠিক করিয়াছিলাম হঠাৎ কোথাও চলিয়া গিয়াছ। যাহা হউক তুমি সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার এই পূজার ছুটিতে ৪।৫ জায়গায় যাইবার নির্দ্ধারণ আছে। পূজার ছুটির পর আশা করি তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।

Yours sincerely
P. C. Roy

২৬

College of Science
Calcutta
Jan. 23. 1924

My dear Ratanmoni,

আগামী সোমবার ২৮শে জানুয়ারী আমার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিবার কথা আছে—আশা করি তুমি ৪ টার মধ্যে আমার এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। আমি মেদিনীপুর অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়াছি। আজ আবার আত্রাই যাইতেছি, আশা করি সোমবার প্রত্যুষে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিব।

Yours sincerely
P. C. Roy

২৭

College of Science
2nd March 1924

My dear Ratanmoni,

আমি এক সপ্তাহ আন্দাজ Benares-এ থাকিয়া অদ্য প্রাতে এখানে আসিয়াছি। আবার বুধবার রাত্রে দিনাজপুর অঞ্চলে যাইব এবং প্রায় মাসাবধি বাহিরে থাকিতে হইবে। আশা করি সোম, মঙ্গল ও বুধ এই তিন দিনের মধ্যে যে কোনও দিনে তোমার প্রবন্ধ লইয়া এখানে আসিতে পারিবে। ইতি—

Yours sincerely
P. C. Roy

২৮

Bengal Relief Committee

COLLEGE OF SCIENCE
92, Upper Circular Road
Calcutta
12. 3. 24

স্নেহাস্পদেষু

আজ সকালের ডাকে তোমার প্রবন্ধ পাইবামাত্র প্রফুল্ল দ্বারা সমস্ত মিলাইয়াছি। বসুমতী আফিসে দিয়া আসিব। কাল প্রত্যুষে শ্রীহট্ট যাত্রা করিব। ইতি—

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

২৯

College of Science
Calcutta
4. 3. 25

My dear Ratanmoni,

তোমার ২ তারিখের কার্ড পাইলাম। আমি ইদানীং প্রায় প্রত্যহই crowded with engagements, সোম ও মঙ্গলবার দেখা হইবে না। বুধবারে ৫½ আন্দাজ দেখা হইতে পারে।

Yours sincerely
P. C. Roy

৩০

College of Science
Calcutta
23. 3. 25

কল্যাণবরেষু

বিধাতা অনেক সময় অনুকম্পাবশতঃ অসাধ্যসাধন করেন—কাল অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বেই বিনয়বাবুকে ডাকিয়া বলিলাম, যদি কাহাকেও পান, তবে একটি পেন্সিল-হাতে বসাইয়া দিবেন টুকিবে, এমন সময় দেখি তুমি স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত। আমি যখন বলিতে আরম্ভ করি মাত্র আধ ঘণ্টা সময় বাকি—ঘড়ি ধরিয়া ৭ টার সময় ট্রেন ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করি—হড়্ বড়্ তড়্ যাহা মুখে আসিল বলিয়া গেলাম। তবে তোমার হাতে ছাইমুঠ্ সোণার মুঠে পরিবর্ত্তন হয়—যাহা হউক তুমি একরূপ করিয়া শীগ্‌গির শীগ্‌গির দাখিল করিবে। ইতি—

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৩১

Tel. Add :
MASTERS
Calcutta

Phone No. 1934
Burra Bazar.

Chuckervertty Chatterjee & Co. Ltd.

Book-Sellers, Publishers & Printers

15, College Square, Calcutta

Dated 1. 7. 1927

স্নেহাস্পদেষু

চক্রবর্ত্তী চাটুয্যে আমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী একসঙ্গে মুদ্রিত করিতেছেন। প্রথম খণ্ডেই দেখিলাম যে প্রায় ৪০০ শত পৃষ্ঠা হইয়াছে। প্রুফ দেখিবার সময় স্পষ্ট বোঝা যায়, যেগুলি তোমার লিখিত সেগুলি যেন অদ্ভুত ধরণের। তাহার সহিত অপরগুলির খাপ খায় না। পার্থক্য এত বেশী যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এক এক সময়ে মনে হয়, তুমি যদি মসী ধারণ করিতে (অবশ্য মসীজীবী বলিতেছি না) তবে সাহিত্যক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত বলিয়া গণ্য হইতে। অনেকদিন তোমার দেখা সাক্ষাৎ পাই নাই। কি ভাবে আছ, কি করিতেছ জানি না।

শুভার্থী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৩২

College of Science
Calcutta
13. 7. 27

My dear Ratanmoni,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আগামী কল্য আমি বাঙ্গালোর (Inst. of Science) যাইতেছি। ফিরিতে প্রায় ১ পক্ষ হইবে। ইহার পরে দেখা করিলে আনন্দিত হইব। তোমাকে দেখিবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হয়।

Yours sincerely
P. C. Roy

৩৩

College of Science
Calcutta
24. 8. 27

কল্যাণবরেষু

গতকল্য চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জির দোকানে যাইবামাত্র দেখিলাম আমার প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত করিয়াছে। তখনই তোমাকে এক copy পাঠাইতে বলিলাম। আমি ত বক্তৃতার সময় হ য ব র ল উদ্গীরণ করিয়া যাই। তবে যে ভাল ধরিতে পারে তাহারই উপর বক্তৃতার বিশেষত্ব নির্ভর করে।

পরশু দিন (শুক্রবার) ৬॥০ টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আমার একটি বক্তৃতা দিবার কথা। যদি পারিয়া উঠ, আমার এখানে ৫॥০ টার মধ্যে হাজির হইবার চেষ্টা করিবে।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৩৪

College of Science
Calcutta
5. 9. 27
4 P.M.

My dear Ratanmoni,

আজই সকালে লিখিয়াছি যে শনিবারে আমার কোন engagement নাই। কিন্তু লেখার কিছু পরেই আমাকে সেই দিন বৰ্দ্ধমান Moslem Conference-এ যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ আসিয়াছে। সুতরাং আমাকে তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। সোমবার আমি সম্ভবতঃ ঢাকায় রওনা হইব। আশা করি প্রবন্ধটি যতশীঘ্র পার পাঠাইবে।

Yours sincerely
P. C. Roy

৩৫

College of Science
6. 10. 27

কল্যাণবরেষু

গত রবিবার প্রত্যুষে পুরুলিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আশা করি প্রবন্ধটি শীঘ্রই আমার হাতে সমর্পণ করিতে পারিবে। আমার বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করিবে।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৩৬

College of Science
Calcutta
25. 10. 28
1 P.M.

কল্যাণবরেষু

এই মাত্র তোমার পত্র পাইলাম। মাঝে তোমার খোঁজ করিয়াছিলাম। এবং শুনিয়াছিলাম যে স্বাস্থ্যলাভের জন্য পশ্চিমে আছ। Malaria ও Malnutrition-এ বাঙ্গালী জাতিকে ভগ্নস্বাস্থ্য করিয়া তুলিল। আশা করি তুমি অনেকটা ভাল হইয়া স্বস্থানে ফিরিবে। আমি এইমাত্র খুলনায় যাইতেছি—যোগীসম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য। রবিবার (২৮শে) প্রত্যুষে কলিকাতায় ফিরিবার কথা।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৩৭

College of Science
14. 10. 29

কল্যাণবরেষু

তোমার ১৩ই তারিখের কার্ড পাইলাম। তুমি যে এ প্রকার কালাজ্বরে ভুগিতেছ তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতাম না। যাহা হউক পাটনার মত জায়গা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। কতটি injection দিয়াছ এবং রোগের অবস্থা কি প্রকার মাঝে মাঝে জানাইয়া উদ্বেগ দূর করিবে।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

পুঃ গতকল্য হইতে বেজায় বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এবার কলিকাতার আশেপাশে বেশ Malaria দেখা দিয়াছে।

৩৮

College of Science
Calcutta
18. 8. 31

কল্যাণবরেষু

সকালবেলা 'যুগশঙ্খ'* পড়িলাম। সকল কয়টি প্রবন্ধই সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিবারণ দাশগুপ্তের † 'ব্যথার দরদ' বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এখন কথা হইতেছে প্রথম সংখ্যা প্রায়ই উচ্চ শ্রেণীর হয়, শেষে যখন পর পর আর ভাল লেখা মেলে না তখন রাবিশ দিয়া গর্ত্ত বুজাইবার চেষ্টা হয়।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

* 'যুগশঙ্খ' জাতীয় সাপ্তাহিক—১৯৩১ সনে গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের পর হুগলী জেলার বিখ্যাত স্বাদেশিক ডাক্তার ৺আশুতোষ দাস প্রমথ কয়জন গান্ধীবাদী কর্ম্মীর উদ্যোগে, কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলিকাতা শক্তি প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়।

† পুরুলিয়ার ঋষিকল্প ৺নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় স্বনামধন্য গান্ধীবাদী নেতা ও গান্ধীবাদের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা।

৩৯

College of Science
92, Upper Circular Road
Calcutta
20. 10. 34

কল্যাণবরেষু

তোমার ২৮ তারিখের বিজয়ার সম্ভাষণপূর্ণ card পাইয়াছি। এই দুর্বৎসরে—বিশেষত কেরাণীপূর্ণ স্থানে যে ৪২৫৲ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়।

আমি আজ তিন মাস যাবৎ প্রায়ই শুইয়া কাটাই। কেন না, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন Blood pressure high. তবে এখন কোন উপসর্গ নাই। সকাল ও সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে একটু বেড়াই। আর বাপু, ৭৪-এ পদার্পণ করিয়াছি। এই জীর্ণশীর্ণ শরীরে এতকাল যে চলিতেছে ইহাই ভগবানের কৃপা।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৪০

College of Science
Calcutta
29. 10. 36

কল্যাণবরেষু

এতদিন তুমি একপ্রকার নিরুদ্দেশ ছিলে। তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। Heart trouble হইয়াছে শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম। ডাক্তার পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের * বাড়ীতে আছ শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। কারণ একাধারে খ্যাতনামা চিকিৎসকের গৃহ ও treatment পাইবে—ইহা বেলের মোরব্বার ন্যায় অর্থাৎ আহার ও ঔষধ দুই-এরই একত্র সমাবেশ।

আমি এখন ছিয়াত্তরে পড়িয়াছি। এক চোখ হারাইয়াছি, অপর চোখে কষ্ট করিয়া দেখি। দিন দিন বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি। যাহা হউক এই জরাজীর্ণ কাঠাম যে এতদিন চলিল, ইহাই আশ্চর্য্য, আপশোষ করিবার কিছুই নাই। এখন তুমি যাহাতে সুস্থ হও ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৪১

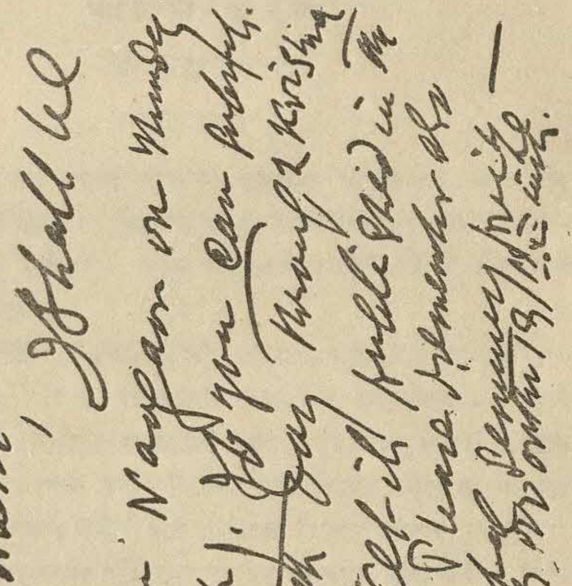
College of Science
Calcutta
1. 11. 39

কল্যাণবরেষু

তোমার বিজয়া-সম্ভাষণ পাইলাম। আমি আজ ৫ সপ্তাহ যাবৎ চিকিৎসকগণের আদেশমত শয্যাগত আছি। ঘরের বাহির হইবার হুকুম নাই। তবে এখন একটু ভালর দিকে। সেই জন্য চিঠিপত্রাদির উত্তর দিতে পারিতেছি। ইহাও এতদিন নিষিদ্ধ ছিল। আমার সম্ভাষণ গ্রহণ করিবে।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

* বালিনিবাসী ডাক্তার ৺পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম. বি. (কলিঃ) এফ্. আর. সি. এস. (এডিন্) কলিকাতার কৃতী এবং সুবিখ্যাত শল্যচিকিৎসক—প্রায় ৩০ বৎসর কাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সহিত শল্য-চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে ও অন্য নানাভাবে যুক্ত ছিলেন।


X 12-3-21
My dear Ratan mani,
I shall be back ... returning from Naogaon on Thursday
next (17th March). If you can submit
the MS. on that day through Krishna
... I can get it published in the
... issue. Please remember the ...

আ চা র্য্য - প্র শ স্তি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

জাতীয় অধ্যাপক

১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মেছিলেন কপোতাক্ষ নদের ধারে রাড়ুলী গ্রামে। কিছুদূরে একই নদের উপর সাগরদাঁড়ি গ্রাম—মহাকবি মধুসূদনের জন্মভূমি। নতুন আমলে বাঙালীর এই দুই তীর্থস্থানই এখন পূর্ব্ব পাকিস্তানে।

স্বাবলম্বন, দেশপ্রীতি, ও বিজ্ঞানে অটুট অনুরাগ, আচার্য্যের সারা জীবনের গতি নির্ণয় করেছে। পিতা হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠান। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দরুণ তার উপযুক্ত অর্থ যোগাড় করা সম্ভব হল না। তখন দুইটি বিদেশী ভাষা নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করে গিলক্রিষ্ট প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশে শিক্ষার পাথেয় স্বয়ং সংগ্রহ করলেন। বহু বৎসর পরিশ্রমের পর রসায়ন শাস্ত্রে ডক্টর উপাধি নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন সরকারী শিক্ষকমণ্ডলীর উচ্চতম বিভাগে প্রবেশ করতে পারলেন না। তবু প্রেসিডেন্সী কলেজেই যোগ দিলেন—এডিনবরা থেকে গবেষণার নেশা ধরে গিয়েছিল। ভাবলেন প্রাদেশিক বিভাগের শিক্ষকেরও গবেষণার সুযোগ মিলবে।

সেইদিনে বিদেশী মালে দেশ ছেয়ে ছিল। ঔষধপত্র, কাপড়-চোপড়, কাঁচের বাসন, এমন কি ছুঁচটি পর্য্যন্ত বাহির থেকে আমদানি হত। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের জন্য দেশ যে তখন পরমুখাপেক্ষী, স্বাবলম্বী প্রফুল্লচন্দ্র এটি বরদাস্ত করতে পারতেন না। জীবনে কলকাতার খরচ মিটিয়ে তাঁর উপার্জ্জনের অল্পই উদ্বৃত্ত থাকত—কিন্তু সেই সম্বল নিয়েই তিনি নেমে পড়লেন রাসায়নিক কারবার গড়ে তুলতে। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' তাঁর সেই অসম সাহস, দৃঢ় সংকল্প ও অক্লান্ত চেষ্টার উজ্জ্বল স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

প্রথম অবস্থায় যখন লোকসানের অঙ্কেই খাতা ভরে উঠত, প্রফুল্লচন্দ্র তখন

কারবারে নিজের পুঁজি অকাতরে ব্যয় করতেন—শিশু প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। পরে যখন প্রতিষ্ঠা এল, দেশের লোক তাঁর মাল খরিদ করতে লাগল—আয় বাড়তে সুরু হল—তখন পয়সার মোহে না মেতে ব্যবসার ভার তাঁর কৃতী ছাত্রদের উপর দিলেন—দরদী ধনিকেরা নিয়ন্ত্রণের হাল ধরলেন। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের জুটল সম্মান, যশ ও অর্থ। নির্লোভ বিজ্ঞানী কিন্তু তখনও কলেজের কর্ম্মশালায় ব্যস্ত রইলেন—গবেষণার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সমাধান করতে। শিক্ষকের সকল কাজই তিনি রীতিমত চালিয়ে গেলেন।

তিনি চেয়েছিলেন দেশে বিজ্ঞানের যুগ ফিরিয়ে আনতে। মৌলিক অনুসন্ধানে, আলকেমী বিদ্যায়, ভেষজতত্ত্বে ভারতীয়েরা এক সময় সভ্য জগতে অগ্রণী হয়েছিল। পুরণো পুঁথি ঘেঁটে বহু পরিশ্রমে তার ইতিহাস তিনি বিস্মৃতির গহ্বর থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর লিখিত প্রাচীনকালে হিন্দুদের রসায়ন শাস্ত্রের কথা বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি গৌরবময় স্থান দখল করে রয়েছে। পুরাকালে পর্য্যবেক্ষণে, পরীক্ষার নিপুণতায় হিন্দু বিজ্ঞানী অন্য দেশীয়দের থেকে হীন ছিলেন না—তার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করে আচার্য্য আমাদের সকলের আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগিয়েছেন—ভারতীয়ের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন।

বর্ত্তমানকালে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে ভারত যেন পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ হয়ে ওঠে এই ছিল তাঁর সাধের স্বপ্ন। বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রায় লোপ পেয়েছিল, এখন তাঁরই সারাজীবনের পরিশ্রমে বিজ্ঞানচর্চা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। রাসায়নিক গবেষণার তিনিই প্রধান পথিকৃৎ। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁরই কাছে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে, আজ বহু ভারতীয় নানাক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করেছে। শেষ জীবনে এই-ই ছিল আচার্য্যের গর্ব্বের কথা। তাঁরই ছাত্রেরা দেশে বিদেশে সম্বর্দ্ধনা পাচ্ছে—তার খবর অনেক আড়ম্বর করে তিনি এ দেশের কাগজে প্রকাশ করতেন।

দেশে ফিরে কাজ সুরু করার পর চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মারকিউরস নাইট্রাইটের আবিষ্কার হ'ল। কর্ম্মশালায় প্রফুল্লচন্দ্র তখন একা কাজ

করছেন। আস্তে আস্তে দু'একটি ছাত্র জুটতে লাগল। তারাও ওঁর কাছে গবেষণার পদ্ধতি শিখলে, কিন্তু বেশীদিন এই কাজে ভুলে থাকতে পারত না—নিজেদের সাংসারিক দায়িত্বে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় অন্যত্র চলে যেতে হতো। সে যুগে মৌলিক গবেষণার দায়িত্ব ছিল একা শিক্ষকের। কলেজের কর্তৃপক্ষের মন সে দিকে ছিল না। তা ছাড়া ডাঃ রায় তখন পর্য্যন্ত বিভাগের পরিচালনার সমগ্র ভার নিজের হাতে পান নি। মাথার উপর কর্তা ছিলেন ইংরেজ। আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁরা অনেক সময় আচার্য্যকে সুযোগ জুগিয়ে দিতেন।

ডাঃ রায়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এই সময়ে তাঁকে মাতিয়ে রেখেছিল। এর ফলে তাঁর সুখ্যাতি যখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সরকারও তাঁকে মৌলিক গবেষণার সুযোগ দিতে সুরু করলেন। ১৯০৪ সালে সরকারের খরচায় প্রথম বিদেশ ভ্রমণে গেলেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স সর্ব্বত্র নানা গবেষণার ধারা দেখে, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নানা বিজ্ঞানীর প্রশংসা নিয়ে ফিরে এসে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ সুরু করলেন। এবার সরস্বতী দেবী সাধনায় প্রসন্না হয়েছেন। দেশের আবহাওয়াও তখন বদলেছে। স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে বাঙালী সকল বিষয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনেক নতুন ব্যবস্থা করেছেন। দেশ-সেবার আদর্শ সামনে রেখে বহু ছাত্র এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। গবেষণার ক্ষেত্র প্রচুর বিস্তৃতি লাভ করল। এদিকে তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রচুর অর্থদান করলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে। স্যর আশুতোষের চেষ্টায় সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হ'ল। সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ডাঃ রায় রসায়ন বিভাগের ভার নিলেন ৯২, আপার সারকুলার রোডে। সায়েন্স কলেজেই থাকতেন দিনরাত।

কর্ম্মজীবন আরও ১৫ বৎসর চলল। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর যে মাহিনা বরাদ্দ করেছিল তাঁদের তহবিলে তা জমতে লাগল, এর এক পয়সাও নিজের জন্য তিনি খরচ করেন নি। শেষকালে ১৫ বৎসরের সঞ্চিত সব টাকা খরচ হল রসায়ন বিভাগে স্যর পি. সি. রায় ফেলোশিপ সৃষ্টি করতে।

দেশের দুঃখে আচার্য্যের প্রাণ কাঁদত। যখন সরকারের চাকুরি ছাড়লেন,

দেশহিতকর নানাকাজে অগ্রণী হতে আর কোনও বাধা রইল না। তাই বন্যার প্লাবনের সময় গড়লেন সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি—তাঁর ডাকে হাজার হাজার স্বেচ্ছাকর্ম্মী এগিয়ে এল দুঃস্থদের সাহায্য করতে।

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও খদ্দর ব্যবহারের আন্দোলন স্থরু করলেন—আচার্য্য রায় এই কাজ মাথায় করে নিলেন। দেশসেবার এই কাজ তাঁর শেষজীবনের ব্রত হল। নিজের স্থখ স্থবিধার কথা না ভেবে, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি ঘুরতেন দেশ-বিদেশে স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করতে।

অকৃতদার শুদ্ধচরিত্র আচার্য্যের ছাত্ররাই ছিল নিকট পরিবারবর্গ। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁর আশ্রয়ে সাহায্য পেয়ে পড়াশুনা করেছে। তাঁর স্নেহ যে শুধু শান্তশিষ্ট পড়ায় মনোযোগী ছাত্রদের জন্যই ঝরত তা নয়—অশান্ত, অসমসাহসী অনেক বিপ্লবী, যারা সে যুগে সর্ব্বস্ব পণ করে দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিল, তাঁদের অনেকে তাঁর কাছে পেত সহানুভূতি ও গোপনে সাহায্য। তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি তারাও—এরূপ জনপ্রসিদ্ধি আছে। আজকে তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত এ বিষয়ে নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেন।

ভারতে বিজ্ঞানের যুগ প্রবর্ত্তনের জন্য, দেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আচার্য্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই মহৎ দান যে কতকটা ফলপ্রসূ হ'ল দেশের ভবিষ্যতের ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে।

নানাস্থানে ও নানা সময়ে আচার্য্যদেব পথ নির্দ্দেশছলে অনেক কথা বলে গেছেন—সংগৃহীত 'আচার্য্যবাণী' তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি নিজেই আত্মচরিতে লিখে গেছেন। যাঁরা অনুরাগী—যাঁরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান তাঁদের এগুলি পড়তে অনুরোধ করি।

প্রবন্ধের পরিশিষ্টে আমি তাঁর কয়েকটি কথা চয়ন করেছি, সেগুলি আমার বিবেচনায় আমাদের বিশেষ করে জেনে রাখা দরকার।

১৯৪৪-এর ১৬ই জুন আচার্য্যের তিরোভাব ঘটল। দেশে এরই মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে। ভারত আজ স্বাধীন—তবে তাঁর নিজের জন্মভূমি এখন পূর্ব্ব পাকিস্তানে। দেশের উন্নতি করবার কাজে দৃঢ় সংকল্প করে তাঁর ছাত্রদের এগিয়ে যেতে তিনি অনুরোধ করে গেছেন।

তাঁর নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি এখনও শেষ হয়নি। ছাত্ররা হয়ত এবার শতবর্ষপূর্ত্তির দিনে বলবে কতটুকু এতদিনে করা সম্ভব হল।

পুণ্যচরিত আচার্য্যদেবের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম।

আচার্য্য রায়ের কয়েকটি বাণী

(প্রকাশিত 'আচার্য্য-বাণী' থেকে সঙ্কলিত)

বঙ্গাব্দ ১৩২৬।

আমাকে যদি কেউ একদিনের জন্যও কলকাতার সর্ব্বময় কর্ত্তা করে, তবে ল' কলেজটিকে আগে ভূমিসাৎ করি। অন্ততঃ দশ বছরের জন্য আইন পড়া উঠিয়ে দিই।

* * * *

যুবকগণের প্রতি আমার নিবেদন, ফেল করে তারা যেন জগৎ অন্ধকার না দেখেন, এবং ক্ষোভে ও দুঃখে আত্মহত্যা না করে বসেন।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয় দ্বার বন্ধ করলে কি টাকা পয়সা বা মনুষ্যত্বের দ্বার বন্ধ হয়?

বঙ্গাব্দ ১৩২৭।

পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে, বুদ্ধি, কৌশল ও প্রাণশক্তির বলে যারা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে জীবন-সংগ্রামে তারাই টিঁকে যায়।

অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধা দেয়। আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি যা কিছু সবই ভাল—এরূপ বিশ্বাসের দিকে যাঁদের মনের খুব ঝোঁক, কোনপ্রকার সংস্কারের কথায় তাঁরা কখনই আমল দেবেন না।

বঙ্গাব্দ ১৩২৮।

গলাবাজী দেশে প্রচুর হয়েছে। এই যে ভাবের বন্যায় আজ দেশ কাণায় কাণায় ভরে গিয়েছে, এবারকার প্লাবনে দেশ যাতে স্নিগ্ধমধুর শস্যশ্যামল হয় তার আয়োজন করতে হবে।

বঙ্গাব্দ ১৩২৯।

আমরা শুধু বাঙালী নই—আমরা মানুষ—যুগে যুগে দেশে যে মানুষ হয়েছে—কাজ করেছে—স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে—আমরা তাদের ভাই। আমরা বিশ্বের সর্ব্ববিধ সত্যের সর্ব্ববিধ ধনের সমান অধিকারী।

* * *

হে আমার সাধের ছাত্রগণ, তোমাদের দিকে আগ্রহাকুল নয়নে আমি তাকিয়ে আছি—যদি দেখি তোমরা মানুষ হচ্ছ, তবে ভাবব আমার জীবনব্রত সফল হল। * * * মানুষ হও, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, দেশ আবার নিশ্চয়ই উঠবে।

বঙ্গাব্দ ১৩২৯।

আজকাল রব উঠেছে,—বিহার বিহারীদের—আসাম আসামীদের,—উড়িষ্যা ওড়িয়াদের, কিন্তু বাঙলা সকলের। সকলের জন্য বাঙালী ঘরের দ্বার খুলে দিব্য আরাম-শয্যায় পড়ে আছে, কেন-না বাঙালী বড় পরমার্থিক জাতি—বিশ্বকে আপন করতে চায়, সেজন্য যদি অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়, সেও স্বীকার। বাঙলার দ্বার সব সময়েই খোলা।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩।

এখনকার দিনে—"জীব দিয়াছেন যিনি আহার দেবেন তিনি"—বলে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আলস্য ত্যাগ কর, উন্নতির জন্য উঠে পড়ে লাগা চাই—ভাল করে খাওয়া চাই-ই।

* * *

বঙ্গাব্দ ১৩৩৬।

ব্রাহ্ম সমাজের চিরন্তন আদর্শ

"একজাতি, এক ভগবান
একদেশ এক মনপ্রাণ"।

এই আদর্শ গ্রহণ না করলে ভারতের মুক্তি শত শত বৎসরেও সম্ভব হবে না।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫।

কোন কোন বাঙালীর ব্যবসায়ে অসাফল্যের দুইটি প্রধান কারণ—সততা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অভাব।

* * *

বঙ্গাব্দ ১৩৪৯।

ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নতির চেষ্টা করতে হলে আজ হউক, কাল হউক, যন্ত্র ও কল কব্জা নির্মাণে মনোনিবেশ করতে হবে।

* * *

ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছা ও ঔদাসীন্য হেতু জাতীয় উন্নতির গতি রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

জাতির সাধারণ লোকেরা যে পরিমাণে মহৎ ও উন্নত হয়, জাতিও ঠিক সেই পরিমাণে মহৎ ও উন্নত হয়।

পৃথিবীতে বাঁচতে হলে আমাদেরও বিবেক ও বিচার-শক্তিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, চিরাগত অনেক বিষয়ের মূলে কুঠারাঘাত করে জীবনপথে অগ্রসর হতে হবে। অন্য কোন পথে শ্রেয়ের সন্ধান মিলবে না।

আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা করবার সময় অতীত হয়েছে—জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মত আমাদিগকেও বিজ্ঞানের অনুসরণ করতে হবে। *

* খুলনা সম্মিলনী হতে প্রকাশিত 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র' স্মারক বই থেকে।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভিতরের মানুষটি বৈজ্ঞানিক পি. সি. রায়কে ছাড়িয়ে পরীক্ষাগার ও বিজ্ঞান কলেজের বাহিরে দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ব্যাপ্তি কল্যাণকর্ম্মের সূত্রে সম্ভব হওয়ায়, তাঁর জীবনকে অপূর্ব্ব একটি সার্থকতায় মণ্ডিত করেছিল। আমরা আচার্য্য সম্বন্ধে কয়টি অতি সাধারণ কথার উল্লেখ করব। কথাগুলি আমরা জানি। এইরূপ আরও অনেক কথা আরও অনেকে অবশ্যই জানেন।

প্রায় ১০।১১ বৎসর আগেকার কথা। আচার্য্য কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের নৈঋত কোণের ঘরে আছেন। একদিন বৈকালে দেখা করতে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "মধ্যবিত্ত বাঙালীর উদ্ধারের আশা এখনও করেন কি? আপনি ত এর জন্যে কত প্রচার, কত চেষ্টা করেছেন। 'অন্নসমস্যা' থেকে সুরু করে কোন সমস্যারই বিচার ও সমাধানের চেষ্টার বাকি ত আপনি কিছু রাখেন নি।"

একটু চিন্তিত ভাবে আচার্য্য উত্তর করলেন, "নাঃ। মধ্যবিত্তের আরও অধোগতিই হয়েছে। প্রচারের কথা তোমার ত মনে থাকবেই। আজও দেখনা, সেই ডিগ্রী ও চাকরির মোহ, আর সেই আল্‌সে-পনা।"

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "রামমোহন রায় কোন্ সনে জন্মেছিলেন বল ত।"

উত্তর করলুম, "ঠিক বলতে পারছি না—১৭৭২ কি ১৭৭৪ সালে হবে।"

তিনি বললেন, "তবেই বোঝ। সে আর পলাশীর যুদ্ধের কয় বৎসরই বা পরে?"

আমি বললুম, "প্রায় ১৬।১৭ বৎসর পরে।"

একটু গভীর স্বরে তিনি বললেন, "নদীর একটা বাঁকপথ আর কি।"

কুতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "সে কি?"

তিনি বললেন, "বুঝতে পারছ না? সুমুখে নদীর একটা বাঁকপথ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, নদী বুঝি ঐখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাঁকের মুখে এগিয়ে চল। দেখবে, মোড় ঘুরে নদী আবার কোন্ সুদূরে প্রসারিত, প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এও সেই বাঁকপথ। পলাশীর যুদ্ধ ত বাঙালীর চরম দুর্গতির দিন। দেশের প্রধানরা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় দেশকে একদল বিদেশী বণিকের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। তারপর ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের করাল কবলে গিয়েছে বাঙলার ⅓ ভাগ লোক। বাঙলায় তখনও শ্মশানের আগুন জ্বলছে। তার উপর আবার ইংরেজ রাজ্য বাঙলায় সেই সুরু হয়ে, সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করবার জন্য হাঁ করছে। এর চেয়ে ঘোর দুর্দ্দিন আর কি হতে পারে? মনে হয়েছে, দেশের বুঝি ঐখানেই ইতি হয়ে গেছে। কিন্তু তারপর আর ৩।৪ বৎসর এগিয়ে এসে দেখ, বাঙলার এক অখ্যাত পল্লীতে নব্যভারতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করলেন। এইবার বাঁকপথে পৌঁছে যাওয়া গেল আর কি? তারপর চেয়ে দেখ, সুমুখে নব্যভারত ভবিষ্যতের দিকে কত দূরদূরান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়ে রয়েছে। প্রথম সূচনায় দেখ, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় কত রকমের কত বড়লোক, কি প্রতিভা! বাঙালীই ত নব্যভারত গঠনের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল।"

একটু চুপ করে থেকে দক্ষিণ হস্তখানি বুকের উপর তুলে নিয়ে আবার বললেন, "আশা আমি ষোল আনাই করি হে। যে দেশের ছেলে এক পকেটে রিভলভার, আর এক পকেটে পটাসিয়াম সায়ানাইড নিয়ে ঘুরতে পারে, পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলে প্রাণের মায়া রাখে না, সে দেশ সম্বন্ধে হতাশ হবার কি আছে? এও সেই বাঁকপথ। পুঁজি আছে দেশে—ঠিকমত খাটিয়ে যেতে হবে।"

শ্রদ্ধায়, আনন্দে ও বিস্ময়ে আচার্য্যের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

১৯০৮ সালে কানাই দত্তর যখন ফাঁসি হয়, তখন আচার্য্য একদিন কানাইয়ের স্বজাতি এবং আত্মীয়, হুগলী জেলার শ্রদ্ধেয় স্মরণীয় স্বাদেশিক ডাক্তার আশুতোষ দাসকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস ভরে বলেছিলেন, "তোমাদের তাঁতিরাই আজ দেশকে বাঁচালে। দেশকে বড় হতে হলে 'মারটারডম্'

চাই। তোমাদের জাত রক্ত দিয়েছে, আত্মদান করেছে তোমরা নমস্য”। আশুতোষ দাস তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লোকসেবার ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির আপিস খোলা হয়েছে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণ মহলের নীচের তলের কয়খানি ঘরে। সারা বাঙলায় আর্ত্তত্রাণ-চেষ্টার সাড়া পড়ে গেছে। বন্যাপীড়িতের সাহায্যের জন্য অর্থ ও বস্ত্রাদি—আচার্য্যের নিজের ভাষায় বলতে হয়—বন্যার মত এসে পড়ছে। কর্ম্মমুখর আপিস ঘরে এক পার্শ্বে আচার্য্যের কাছে গিয়ে বসেছি। বিজ্ঞানাচার্য্যের সেবাব্রত রূপটি সেই পরিবেশে একটি অপূর্ব্বতা দিয়েছে, আর নূতন আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। আচার্য্য বললেন, তাঁর স্বরে সংযত উচ্ছ্বাস ছিল, “দেখ হে, বিজ্ঞান-মন্দির এখন সেবা-মন্দির হয়ে সার্থক হয়েছে। দেশের ছেলেদের প্রাণটা একবার দেখ। উৎসাহটা দেখ। জ্ঞান ও কর্ম্ম এমনি করেই মিলিয়ে নিতে হবে।”

আশা-আনন্দ-উৎসাহমিশ্র প্রাণপ্রদ একটা অনুভূতির গভীরতায় ক্ষণকাল স্থির হয়ে আছি, এমন সময় ক' বোঝা কাপড়-চোপড় এবং কিছু সংগৃহীত অর্থাদি নিয়ে ক'জন নারী আপিস ঘরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হল। এরা বারনারী। “এস মা লক্ষ্মীরা” বলে আচার্য্য তাদের সাদরে আহ্বান করলেন। পিতার সেই অকৃত্রিম স্নেহের আহ্বানে পরিত্যক্তাদের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। অকথিত থাকলেও তাদের মুখের ভাবে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে, এমন প্রাণভরা আপন-করা সহজ আহ্বান তারা ত কই আর কখনও শোনে নি।

আচার্য্য অনেক দিন পর্য্যন্ত ছুটিতে বাড়ি যেতেন খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে। নিজ গ্রামের গল্প তাঁকে ধীরে ধীরে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে করতে বলতে শুনেছি। একদিন বললেন, “দেখ, গ্রামে গেলে সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়। আমার চেয়ে সব বয়সে বড় আছেন—কেউ দিদি, কেউ মাসী। বাড়িতে গেলে তাঁরা কাঠের বড় পিঁড়ি পেতে দেন, আদর করে বসতে বলেন! সে-সব ভারি মোটা পিঁড়ি, একালে হয়ত তোমরা দেখ নি। ক'পুরুষ ধরে তার

ব্যবহার হয়ে আসছে। জ্যেষ্ঠাদের নমস্কার করে সেই পিঁড়ির উপর গিয়ে বসি। তাঁরা কত যত্ন করে আম কেটে, আনারস কেটে বড় পাথরের পাত্রে সাজিয়ে দেন। তারপর বসে বসে খেতে খেতে ঘর-সংসারের নানা সুখ-দুঃখের গল্প করেন।”—কোথায় দেশবিশ্রুত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আর কোথায় গ্রাম-সুবাদের বর্ষীয়সী মাসী-পিসী। তবু এঁরা যেন একটু বিশেষ করেই পরস্পরের আপনার। এঁদের কথা বলতে আচার্য্যের মুখে সেই চির সহজ সম্পর্কের মাধুর্য্যের স্পর্শ লাগত। আচার্য্য যেন নিজগ্রামে একান্তভাবে গ্রামেরই, অপর কারও নন। এ সম্পর্ক তাঁর জন্মের পূর্ব্ব থেকেই পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—জন্মের পরে নূতন করে গড়ে উঠবার অপেক্ষা রাখে নি।

ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর এই নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল—আমি তোমাদের, তোমরা আমার। ছাত্রদের সহজে আপন করে নিতে পারতেন তিনি। তাই দেখা যেত, পরীক্ষণাগারের মুহূর্তগুলি আনন্দে, স্নেহে ও ভালবাসায় তিনি ভরে রেখেছেন। এই পথেই তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা বহু ছাত্রে সঞ্চারিত হয়ে ব্যাপক ও সার্থক হয়েছে। একদিন পরীক্ষণাগারের ভিতর গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়েছি। ঈষৎ ঢালু উঁচু একটি টুলের উপর তিনি উবু হয়ে বসে আছেন। ছাত্রগণ নীরবে আপন আপন কাঁচের নল, শিশি-বোতল এসিড প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত। আচার্য্যের প্রবন্ধ লেখার একটি কাজ আমার হাতে সম্পন্ন হয়েছে বলে পরম খুশীতে তিনি আমার গালে পিঠে বেশ কয়েকটা চড় ঘুঁসি দিলেন। তাঁর আদরের এই অত্যাচারে অনেকেই ধন্য হয়েছে। তারপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক ছাত্রের কাঁধের উপর হাত রাখলেন। মুহূর্ত্তেই দেখি, পরম কৌতুক ও চরম বিস্ময়ের কারণ হয়ে বৃদ্ধ আচার্য্য বালকের আনন্দে সেই যুবক ছাত্রের পিঠের উপর চড়ে বসেছেন। ছাত্র আনন্দ ও প্রেরণার, ভক্তি ও ভালবাসার সেই পবিত্র আধারটিকে পিঠে নিয়ে পরমানন্দে পরীক্ষণাগারের অপর প্রান্তে অনুরূপ একটি টুলের উপরে নামিয়ে দিয়ে, নিজ স্থানে ফিরে এসে আপন কাজে মনঃসন্নিবেশ করলেন।

১৩২৮ সনে মাঘের এক অপরাহ্নে তাঁর ঘরটির ভিতর গিয়ে হাজির হয়ে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালুম। খুব আনন্দিত হয়ে তিনি

বলে উঠলেন : "আরে, আরে, আরে, এস, এস। কবে বেরিয়েছ জেল থেকে ?"

উত্তর করলুম "গতকাল"।

তিনি বললেন, "তারপর কেমন ছিলে ? পৌষ-সংক্রান্তিটা তাহলে জেলের ভিতরেই কেটেছে ? এস এস, পৌষপার্ব্বণ তোমার ফাঁক যাবে না। সত্যানন্দ বাবুর বাড়ী থেকে নানারকম পিঠে এসেছে।" এই কথা বলে আলমারি খুলে একটি পাত্রে নিজহাতে পিঠে সাজিয়ে, আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই চেয়ারটায় বস, বসে বসে খাও, খেতে খেতে গল্প কর।"

এমন আদরযত্ন মা-ঠাকুরমার দ্বারাই সম্ভব হয়। আচার্য্যের ভিতর এইরূপ একজন কেহ ছিলেন, সন্দেহ নেই। সে পরিচয় অনেকেই হয়ত অনেকবার পেয়েছেন।

গল্প করতে করতে বললেন, "দেখ, তুমি জেলে গিয়েছ—তোমার বৃদ্ধা মা-ঠাকরুণ খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন জেনে ভাবলুম, বালি গিয়ে একবার তাঁকে দেখে আসব। কিন্তু তা হল না—তৎক্ষণাৎ বোম্বাই থেকে বাসন্তী দেবীর ডাক এল।"

আর একদিন একটি পাত্রে মুড়ির উপর পয়রা খেজুরে গুড় ঢালতে ঢালতে বললেন, "খেয়েছ কখন এমন জিনিস ? আমাদের খুলনার জিরেনের গুড়। কি সুতারটা একবার দেখ। তোমরা কলকাতার লোক, হোটেলে বসে কেক্ খেতে শিখেছ। মুড়িগুড় তো তোমাদের কাছে ছিঃ ছিঃ পাড়াগাঁয়ে খানা"—বলে হাসতে লাগলেন। আবার বললেন, "আরে আমি বৈজ্ঞানিক একথা তো মানতেই হবে। আমি বলছি, তোমাদের ঐ চৌদ্দ-সিকের এক বাক্স হাণ্ট্‌লি পামারের সৌখিন বিস্কুট আর আমাদের পাড়াগাঁয়ের দু'আনার মুড়িগুড় একবারে সমান—পুষ্টিতে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু তোমরা শহুরে হয়েছ—মুড়িগুড়-জলখাবারে তোমাদের কৌলিন্য নষ্ট হবে।"

এক সন্ধ্যায় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে 'সময়ের সদ্ব্যবহার' সম্বন্ধে এক ঘণ্টারও উপর বক্তৃতা দিয়ে, 'চল চল' বলতে বলতে তাড়াতাড়ি এসে আচার্য্য তাঁর ছোট ঘোড়ার গাড়িখানিতে উঠে বসলেন। বাহিরে হাত

বাড়িয়ে তাঁর সেই সনাতন কড়ির বোতল থেকে জল ঢেলে মাথায় থাবড়ে থাবড়ে দিতে লাগলেন। এইবার মাঠে যাওয়া হবে সান্ধ্য ভ্রমণে। আচার্য্যের মোটর ছিল না। ছোট ঘোড়ার গাড়িখানি সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "এ আমার মেডিকেল বিল। প্রত্যহ এই গাড়ি করে এসে মাঠে বেড়িয়ে হাওয়া না খেলে আমাকে ওষুধ খেতে হবে।"

গাড়ির মাথার উপর দুই টুকরি ন্যাংড়া আম দিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে আচার্য্য বললেন, "চল, আজ রাতে সায়ান্স কলেজে থাকবে, আম খাবে।" কলেজে পৌঁছে নিজের ঘরটির ভিতর এসে তিনি অবিলম্বে রাত্রের স্বল্পাহার শেষ করলেন। তারপর তাঁর বহুবিশ্রুত চৌপায়ের উপর শুয়ে পড়ে বললেন, "তোমরা সব একজনে গোটা একটা করে আম খাবে।" ঘর অন্ধকার—মুখ টিপে হাসলুম। কি কৃপণ রে বাবা! তাঁর মাথায় ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি শীঘ্রই নিদ্রাগত হলেন। তারপর আমরা প্রত্যেকে—যতদূর মনে পড়ে—খাবার সময় চারবার গোটা একটা করে আম খেলুম। সকালবেলা দুষ্টুমি ফাঁস করে দিলে পর তিনি হাসতে হাসতে বললেন "বামুনের ছেলে, পেটুকতা তোমাদের পেশা।"

১৯২০ সালের পূর্ব্বেকার কথা। আচার্য্য ২।৩ দিনের জন্য পাবনায় চলেছেন। পথে পদ্মাতীরে পাকশীর রেল-বসতিতে এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে মধ্যাহ্নের স্নানাহার সমাপন করা হল। সংবাদপত্রে রামানুজম্ এফ. আর. এস-এর অকাল মৃত্যুর সংবাদ পাঠ করে আচার্য্য বড় ব্যথিত হলেন। মৃত মনীষীর গুণের কথা অনেকক্ষণ বললেন। তারপর কথাবার্ত্তার কালে আচার্য্যের এক পূর্ব্বতন ছাত্র এসে প্রণাম করলেন। ইনি মুন্সেফ। অনেক বৎসর পূর্ব্বে এম. এস-সি পাস করেছিলেন। মুন্সেফ-ছাত্রের গালভরা কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়িতে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আচার্য্য সকৌতুকে বললেন, "তোমাদের এম-এস-সি, বি-এল কাণ্ডখানা বাপু আজও কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকল না।" বিজ্ঞানের ছাত্র ওকালতি করবে —এ তিনি কখনও পছন্দ করেন নি।

তারপর স্টীমারে পাবনায় পৌঁছে সদলে শীতলাইয়ের যোগেন মৈত্রের অতিথি হলেন। মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে ভাল হৃষ্টপুষ্ট গাই গরু ছিল।

গো-সেবার ব্যবস্থা ছিল পরিপাটী। গব্যঘৃত বাড়ীতেই তৈরি হত। এই সব সুব্যবস্থা দেখে আচার্য্য খুব খুশী হলেন। পরদিন অপরাহ্ণে জনসভায় 'ধান ভানতে শিবের গীত'—মৈত্র মহাশয়ের গব্যঘৃত সম্বন্ধীয় উদ্যোগের তারিফ করে আচার্য্য বললেন, "বাড়ির তৈরি গব্য-ঘৃত উঁচুদরের খাঁটি জিনিস। আমরা অধ্যাপকরা এমন উপাদেয় জিনিস পেলেই নিয়ে থাকি।"

বলা বাহুল্য, বিদায়-বেলায় মৈত্র মহাশয় আচার্য্যের গাড়িতে কলসী-ভরা গব্যঘৃত তুলে দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। আচার্য্যের খুব আনন্দ—কলকাতার বাসায় ছেলেরা যে খাঁটি ঘি চোখে দেখতে পায় না।

সিবিলিয়ান জে. এন. গুপ্ত তখন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার, চুঁচুড়ায় থাকেন। ইনি বঙ্গের অন্যতম রত্ন সুবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জামাতা। চুঁচুড়া কৃষি-প্রদর্শনী খুলতে গিয়ে আচার্য্য সদলে তাঁর অতিথি। গুপ্ত সাহেবের বাংলোয় মেঝের উপর আসন পেতে শাক-সুক্ত, ডাল-ডালনা, ঝোল প্রভৃতি দিয়ে দেশী মতে আহারের ব্যবস্থা আচার্য্যের খুব পছন্দ হল। তারপর প্রদর্শনীর কার্য্য অন্তে বৈকালিক জল খাবারের আসরে বসে আচার্য্য দেখলেন, চোব্যচুষ্যের ভিড়ে কয়েক ছড়া সোনার বরণ উত্তম মর্ত্তমান রম্ভা রয়েছে। তখন রুমালখানি পকেট থেকে বার করে, দুই ছড়া কদলী তুলে নিয়ে পরম মনোযোগ সহকারে বাঁধতে বাঁধতে আচার্য্য সহাস্যে বললেন, "ওহে, এ আমাদের অধ্যাপকদের পাওনা—লজ্জা করলে চলবে কি করে?" স্বচ্ছ হাসির লহর তুলে সকলে তখন আচার্য্যের পাওনা-গণ্ডার সেই পরম বিস্ময়কর হিসাব সম্বন্ধে অবহিত হলেন। তারপর গুপ্ত সাহেব শুভ্র বস্ত্র খণ্ডে সমস্ত রম্ভাগুলি সযত্নে বেঁধে নিজ হাতে আচার্য্যের গাড়িতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হলেন।

বক্তৃতায় আচার্য্য মাঝে মাঝে সেক্সপিয়র ও এমার্সন থেকে বচন উদ্ধার করে দিতেন। একদিন বেলা তিনটা আন্দাজ তাঁর ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, "ওহে, আমাকে ঘণ্টাখানেক এই হিষ্ট্রি অফ ইংলিস ড্রামার খানিকটা পড়ে শোনাও। পারবে ত?" অগত্যা বেপরোয়া হয়ে, তাঁর হুকুমে হেঁকে হেঁকে পুরা এক ঘণ্টা নাট্য-রাজ্যে বিচরণ করা হ'ল। পড়া শেষ হতে বললেন, "তুমি ত পড় ভাল হে"। যথা লাভ!

একদিন গিয়ে শুনলুম, আচার্য্য স্নানঘরে আছেন—তবে আমি সেখানে যেতে পারি। দরজার ধারে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলুম, তিনি সাবান দিয়ে গেঞ্জি, মোজা, রুমাল সাফ করছেন। আমাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, "দেখ হে, তোমাদের আচার্য্য সাবান কাচছেন। নিজ হাতে কাজ যে করবে না, সে বাঁচবে না। আমাদের জাতটা বড় আল্সে। আবার মেয়েরা আজকাল বলতে শুরু করছেন, রাধুনি না রাখলে শ্বশুরবাড়ী যাবেন না। সঙ্গীন ব্যাপার!"

অসহযোগ আন্দোলনের মুখে দেশে যখন চরকা এসে পড়ল, আচার্য্য তখন বলেছিলেন যন্ত্রযুগে চরকার চেষ্টা পাগলামি—সময়ের গতি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টার মত। কিছুকাল পরে একদিন বিজ্ঞান কলেজে তাঁর ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, মেঝের উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পাখি-চরকায় তিনি দিব্য সূতো কাটছেন। আমাকে দেখে বললেন, "দেখ হে, তোমাদের আচার্য্য চরকা কাটছেন। একদিন চরকার বিরুদ্ধে বলেছিলুম। মহাত্মার যুক্তি যেদিন বুঝলুম যে, আমাদের গরীব দেশে সাত লক্ষ গ্রামে কোটি কোটি লোকের বেকার সময়টা একমাত্র চরকা দিয়েই কাজে লাগান যায়, আর তাতে দেশজোড়া আলস্য ও অবসাদ ঘোচে, সেদিন থেকেই সূতো কাটতে আরম্ভ করেছি। দেখ তো, সূতো কেমন হচ্ছে?"

গান্ধীজী সে সময়ে বাঙলার কয়েকটা স্থানে যাবেন। ভ্রমণ-ব্যবস্থার স্থির করায় আচার্য্যের হাত ছিল। একদিন আচার্য্য বললেন, "নিদ্রাটা মহাত্মার একেবারে আয়ত্বের মধ্যে। বাস্ রে! ঠিক নেপোলিয়নের মত। ছ'টায় সভা আরম্ভ হবে। ৫টা ৪৫ মিনিটে বললেন—একটু ঘুমিয়ে নেবো। অমনি নিদ্রাগত হলেন। ৫টা ৫৫ মিনিটে উঠে বললেন, এইবার সভায় যাওয়া যাক।"

একদিন আচার্য্য আমায় ডেকে বললেন, "ওহে এক কাজ করতে পারবে? কঠিন কাজ কিন্তু।"

উৎসুক হয়ে উত্তর করলুম, "কি বলুন।"

তিনি বললেন, "আমাদের খুলনা অঞ্চলে—আমরা আবার বলি খুলনে—নমঃশূদ্ররা নাপিত পায় না। হিন্দু নাপিত মুসলমান খ্রীষ্টানকে কামাবে, কিন্তু

হিন্দু নমঃশূদ্রকে কামাবে না। এ কোন দেশী কথা বাপু! অনেক দুঃখে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—আমাদের ধর্ম্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে। সমস্ত জাতটা 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না' করতে করতে মরতে চলেছে। তুমি ত বামুন। এখন নাপিত হয়ে খুলনা জেলার নমঃশূদ্র গ্রামে বসতে পারবে? এ কাজ বামুনদেরই হাতে নিতে হবে।"

পল্লীগ্রামের প্রতি আচার্য্যর প্রাণের টান বরাবর ছিল। পাবনায় মৈত্র-বাড়ির দীঘির বাঁধাঘাটে বসে খালি গায়ে খাঁটি সরিষার তেল মেখে দস্তুরমত পাড়াগাঁয়ের ধরণে আনন্দে অবগাহন স্নান করতে তাঁকে দেখেছি। একবার নদীয়া জেলার ঝাউডাঙ্গা গ্রামে পল্লী প্রান্তস্থিত হরিজন পাঠশালার জানালা-দরজাহীন মেটে ঘরে শীতের রাত্রি যাপন করে ভোরবেলা তিনি চৌপয়ের উপর বসে আছেন। আমরা পল্লীর অভ্যন্তরে গৃহস্থ-বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ ও রাত্রিযাপন করে, তাড়াতাড়ি মাঠ পার হয়ে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হতেই তিনি বলে উঠলেন, "লোটা-হাতে খুব ভোর ভোর মাঠ করে এসে বাঁচলুম—আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে।"

পল্লী-পাঠশালার বোধোদয় বইখানাও বোধ করি সেই জন্যে তিনি পরিণত জীবনেও ভুলতে পারেন নি। ১৯২০ সালে ২১শে নভেম্বর তারিখে কেম্ব্রিজ থেকে এই জ্ঞানতপস্বী একখানি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন—

"ছেলেবেলায় বোধোদয়ে পড়িতাম অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অভিজ্ঞতা এবং তাহাই আহরণ করিবার চেষ্টায় আছি।"

মনের যৌবন বটে!

১৯১৮-১৯ সালের কথা। একবার তাঁদের গ্রামের কুল-পুরোহিত-ঘরের এক ছেলের অনেক কাল কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আচার্য্য সেই ফেরারি বিপ্লবীর জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, "সে ভাল আছে এই খবরটুকু পেলে, আমাদের গ্রামে তার বাড়িতে জানিয়ে দিই। তা হলেই তার বাড়ির লোক আশ্বস্ত হবে।"

আমি বললুম, "তবে খবর পাঠিয়ে দিন, সে ভাল আছে।"

আচার্য্য আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "তাই বলি, তোমাদের ভেতর এই সব স্বদেশীর গোলমাল আছে বাপু। ঠিক খবর জান ত?"

আমি বললুম, "আজ্ঞে হাঁ।"

আচার্য্য খুশী হয়ে তখনই খুলনার বিখ্যাত বিপ্লবী ফেরারি শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে তার কুশল-বার্ত্তা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তাঁরই আদেশে আমাকে একদিন চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের প্রবর্ত্তক আশ্রমে সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তার অগ্রজের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

১৯৪০, এপ্রিল মাস। একদিন আমার কথার উত্তরে আচার্য্য বললেন, "তা তোমাদের বালি ত এই কাছেই। একদিন গেলেই হবে।"

আমি বললুম, "আপনি ক' বছর আগে যাবার কথা দিয়েছেন। এখন আবার ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ এসে পড়লো। আমাকে আরামবাগের পল্লীতে সত্যাগ্রহ শিবিরে গিয়ে থাকতে হবে।"

আচার্য্য বললেন, "আচ্ছা, পরে সে কথা হবে একদিন।"

প্রণাম করে বিদায় নিয়ে দরজার বাইরে গিয়েছি, তিনি হেঁকে বললেন, "শোন, শোন"। ফিরে গেলুম।

তিনি বললেন, "কি জানি বাপু, কখন আবার তোমাদের জেলখানায় চালিয়ে দেবে। তারপরের ব্যাপার ত অনিশ্চিত। তার চেয়ে চল, বুধবার বালি যাই, কথা দিয়েছি যখন। কিন্তু দু' দিনেই ব্যবস্থা করতে হবে।" সেদিন যেন ছিল রবিবার।

আমি খুব আনন্দিত হয়ে উঠলুম। তিনি বললেন, "কিন্তু গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে হবে। কার গাড়ী পাবে তুমি। অসুবিধা হবে না ত?"

আমি বললুম, "ডাক্তার পঞ্চানন চাটুয্যের গাড়ী পাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "তাঁর গাড়ী কি করে পাবে?"

আমি বললুম, "আজ্ঞে, তিনি যে আমাদের বালির লোক।"

বালি আসবার দিন বিজ্ঞান-কলেজে পঞ্চানন চাটুয্যের মজবুত লম্বা চেহারা দেখে আচার্য্য খুব খুশী হলেন। বললেন, "আমি ত নামতে পারি না। তুমি আমাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?"

"আজ্ঞা হাঁ, দেখুন না" বলে ডাক্তার চাটুয্যে আচার্য্যদেবকে পাঁজা-কোলা করে তুলে অবলীলাক্রমে নীচে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন।

আচার্য্য হাসতে হাসতে বললেন, "কিছু ত জানতেই পারলুম না হে। তুমি মজবুত বটে।"

বালিতে গঙ্গাতীরে স্কুল-মাঠে সভা হয়। আচার্য্য সেখানে কথা রাখতে গিয়েছিলেন, কথা বলতে নয়—সভায় দাঁড়িয়ে কথা বলবার শক্তি তখন আর তাঁর ছিল না। আচার্য্যের পরণে সেদিন ছিল ফিকে নীল রঙের খদ্দরের লুঙ্গি আর কোট, হাতে লাঠি।

এই লেখক মাঝে মাঝে আচার্য্যের বক্তৃতা লিখে নিতেন। আচার্য্য তাঁকে বলতেন, "এই আমার গণেশ।" গণেশের হাত ধরে পিছনে পিছনে সভায় প্রায় টেনে নিয়ে যেতেন। উদ্যোক্তাদের বলতেন, "এই আমার গণেশ, বসবার জায়গা দাও, যেন হাওয়া পায়। গণেশ না লিখলে আমার বক্তৃতা পণ্ড হবে।"

শেষের ক' মাস আচার্য্যদেব শয্যাগত ছিলেন। একদিন অপরাহ্নে তাঁর কাছে গিয়ে বসেছি। মোজা-পরা শীর্ণ পা-দুখানিতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তিনি মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলছেন। তাঁর এক বন্ধু পাশে চেয়ারে বসেছিলেন। বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করা হয়?"

আচার্য্য আমার দিকে চাইলেন। আমি চট্ করে কিছু জবাব দিতে পারলুম না। কারণ আমরা কি-যে করি তার কিছু ঠিক নেই—আবার কিছু-যে করি না তাও ত ঠিক নয়। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্ন করলেন। তখন বুদ্ধি জুগিয়ে গেল। আমি বললুম, "আজ্ঞে, স্বদেশী করি।" আচার্য্যদেবের শীর্ণ মুখখানি তখন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "বেশ বলেছ।"

শেষের দিনে অপরাহ্নে যখন তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আচার্য্যদেব তখন সংজ্ঞাহীন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মেঘলা সেই দিনটায় বিজ্ঞান-কলেজে সেই পুঞ্জীভূত দুঃখের কথা মনে পড়লে আজও চোখে জল আসে।*

* প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' ১৩৫৮, আষাঢ় সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাদেশিকতা

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রমন্থনে অমৃতের উদ্ভব হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর হৃদয়-সমুদ্র-মন্থনে যে অমৃতের উদ্ভব হয় তা হল স্বদেশী বা স্বাদেশিকতা। পতিত ভারতের উদ্ধারকার্য্যে স্বদেশীই ছিল একমাত্র মন্ত্র। নব্য ভারতের রক্ষাকার্য্যও একমাত্র স্বদেশী মন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। স্বদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করে বাঙালা সেদিন সর্ব্বভারতের নেতৃপদ অবিসম্বাদিতরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

স্বদেশীর ক্ষেত্র কোন সীমাবন্ধনে বদ্ধ ছিল না। স্বদেশী ছিল জাতীয় জীবনের সবখানি জুড়ে। দেশের জন্য সম্যক্ প্রেম, সম্যক্ চিন্তা, সম্যক্ ভাবনা, সম্যক্ সংকল্প, দেশের জন্য সম্যক্ উৎসাহ, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ ত্যাগ—এই হল স্বদেশীর মূল কথা, স্বদেশীর উপাদান, স্বদেশীর সত্ত্বা। স্বদেশ-আত্মার সহিত সুগভীর যোগে যুক্ত হয়ে যিনি নবচেতনা লাভ করেছেন, সেই যোগে যাঁর নবদৃষ্টির উন্মেষ হয়েছে, হৃদয় যাঁর নবপ্রেমের অরুণালোকে উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রাণ যাঁর নবরাগে রঞ্জিত হয়েছে, তিনিই হলেন যথার্থ স্বাদেশিক, স্বদেশ-মন্ত্রের সত্য উপাসক।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন কলকাতা হেয়ার স্কুলের ছাত্র তখন মহানগরীতে স্বাদেশিকতার হাওয়া বইতে সুরু করেছে। এই স্বাদেশিকতার দীক্ষাগুরুদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'চরিত-কথা' পুস্তকে লিখেছেন—

"বাঙলার এই আধুনিক স্বাধীনতা ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নানা দিকে নানা লোক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই নূতন সাধনার সর্ব্বপ্রথম যুগের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথই প্রথম এই স্বাদেশিকতার মধ্যে এক অভিনব ও উন্মাদিনী ঐতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। সুরেন্দ্রনাথের

তড়িৎসঞ্চারিণী বাগ্মী প্রতিভাই সর্ব্বপ্রথমে * * এদেশের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করে।"

সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদিনী বক্তৃতায় তরুণ ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ে স্বদেশীর এক নব উদ্দীপনা জেগে ওঠে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা আলোচনা করতে গিয়ে স্বদেশীর এই ভূমিকা রচনাটুকু করতেই হয়। কারণ তিনি ছিলেন বাঙলার শ্রেষ্ঠ স্বাদেশিকগণের অন্যতম। মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে, অস্থিমজ্জায়, চিন্তায় ও কর্মে এমন স্বদেশী মানুষ বাঙলায় বিরল। অথচ স্বদেশীর চমকপ্রদ, সুবিশাল, কোলাহল-মুখর রাজনীতিক্ষেত্রের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ যোগ ছিল না।

কিন্তু মাত্র রাজনীতি তো স্বদেশীর একচেটিয়া ক্ষেত্র নয়। শিক্ষা, সেবা, সাহিত্য, কলা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তখন স্বদেশীর হাওয়া লেগে ঢেউ উঠেছিল। স্বদেশীর প্রাণপ্রদ হাওয়ায় সে সকল ক্ষেত্রও নবশক্তি-সঞ্চারে সঞ্জীবিত হয়ে নবরূপ ধারণ করেছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে স্থির জ্যোতিষ্ক। সে জ্যোতিষ্কের কিরণ ছিল উজ্জ্বল, নির্মল, স্নিগ্ধ, সুন্দর। স্বদেশীর স্পর্শে সে জ্যোতিষ্ক শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।

স্বদেশী যুগে যে বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি স্বদেশীরই কারণে গড়ে উঠেছিল তা হল জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্। সেই পরিষদেরই একটি ধারার পরিণত রূপ বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একদা শ্রীঅরবিন্দ এই পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরিষদ্ তখন ছিল স্বদেশীর অন্যতম সাধন-কেন্দ্র, পরিষদে স্বদেশী ছিল ওতপ্রোত হয়ে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু এই পরিষদের সঙ্গে শিক্ষক-রূপে যুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একটা বিপরীত ও বিরোধী ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন ইংরেজ গভর্মেন্টের আটঘাট-বাঁধা, চব্বিশ ঘন্টার হুঁশিয়ারী দিয়ে ঘেরা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক—যেখানে অর্বাচীন ইংলণ্ডীয় যুবক প্রবেশমাত্রই শিক্ষক হিসাবে সর্ব্বজনবরেণ্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপরে স্থান পেয়ে যেত। সেই পরের কেল্লায় বাঙলায় একান্ত আপন জন, জ্ঞানতপস্বী, বিজ্ঞানসেবী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষক-জীবনের প্রথমার্দ্ধে

স্বদেশীর সাধনা করে গেছেন। শত্রুপুরীর শ্বাসরোধকারী পরিবেশের মধ্যে তাঁর সেই সাধনা এমন একটি স্থির বলিষ্ঠ রূপ পেয়েছিল সত্যই যার তুলনা হয় না।

আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ গত হয়েছে। এই ৫০/৫৫ বৎসরে কলকাতায় কত বড় বড় অধ্যাপকের উদয় ও অস্ত হয়েছে। তাঁদের কারও খ্যাতি শেকস্‌পীয়র-অধ্যাপনার অপূর্ব কৃতিত্বে, কারও বাগ্মিতা ছিল অনন্যসাধারণ, কেউ বা অঙ্কশাস্ত্রে দিগ্‌গজ ছিলেন, কেউ বা দর্শনশাস্ত্র-বারিধির পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে পরম বিস্ময়ের হেতু হয়েছেন, বিজ্ঞানচর্চার পথপ্রদর্শক-রূপে কেউ বা বাঙালীকে ধন্য করেছেন, কেউ বা পুরাতন পুঁথিপত্র ঘেঁটে ইতিহাসের লুপ্ত পথরেখা উদ্ধারে যত্নবান্ হয়েছেন, অপর কেহ বা উঁচুদরের 'নোট' লিখে ছাত্রদের পরীক্ষা-পারের কড়ি জুগিয়েছেন। এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে, আমরা যখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দিকে ফিরে চাই, তখন দেখি সেই ক্ষীণকায় বুদ্ধিদীপ্ত সরল ধীর শান্ত মানুষটির এমন একটা সহজ অথচ অনিবার্য্য আকর্ষণ আছে যা সত্যই সহজে দেখা যায় না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাদেশিকতাই তাঁকে এই বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছিল একথা অনস্বীকার্য্য। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন স্বাদেশিকতাই এই যুগে আমাদের ধর্ম্ম। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে সেই ধর্ম্ম নিয়ত পালিত হয়েছিল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কারবার ছিল ছাত্রদের নিয়ে। প্রতিদিনের অবিরত চেষ্টায় আত্মগঠন করে দেশ-সেবার প্রকৃত অধিকার অর্জ্জন করতে হয়, আপন আচরণের দ্বারা এই মহতী শিক্ষাই তিনি ছাত্রদের দিয়ে গেছেন। ছাত্রেরাই ছিল তাঁর প্রাণ, প্রাণের প্রাণ। ছাত্রগণ তাঁর জীবনে ও আচরণে আত্মসেবা বা স্বার্থসেবার বাষ্পমাত্র কখনও লক্ষ্য করতে পারেনি—লক্ষ্য করেছিল তাঁর সেই পরম সত্যকে, তাঁর অনুক্ষণ জাগ্রত দেশাত্মবোধকে।

প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, বাঙালী তার তাঁতিকুলে ব্রজেন শীলকে নিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে—কিন্তু কানাই দত্তকে নিয়ে হয়েছে ধন্য, কৃতকৃতার্থ। স্বাদেশিকতার এই গভীর অনুভূতি তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে অনুপম করে রেখেছে। দেখা যায়, দেশাত্মবোধ নিজ দেশ সম্বন্ধে একটা অভিমান জাগ্রত

করে রাখে। এই অভিমান আত্মমর্য্যাদারই একটা বলিষ্ঠ রূপ, মানুষকে ইহা পরানুবাদ ও পরানুকরণের মোহ থেকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখে। বিদ্যাসাগর পণ্ডিতের ধুতি-চাদর ও চটির মধ্যে এই অভিমানই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। এই অভিমান-বশেই খদ্দরধারী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রগণকে বিদেশের ডি এসসি ডিগ্রী গ্রহণে নিরস্ত হতে বলেন। তিনি বলতেন বিলাতী ডিগ্রী নিয়ে দেশবাসীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানান্বেষণের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তাই বলেছিলেন "আমাদের দেশে মেঘনাদ সাহা ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীমান্‌দ্বয়, বিলাতী ডিগ্রার মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব্ব করেন নি—এ পরম গৌরবের কথা।" কিন্তু এই অভিমান তাঁর জ্ঞান আহরণে কদাপি বাধা ঘটায় নি। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর নিত্য আনাগোনা ছিল। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করবার চেষ্টায় তিনি বহুবার ইউরোপ গিয়েছিলেন।

দেশের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই বৈজ্ঞানিক পি সি রায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র হয়ে ফুটে উঠেছিলেন এবং বিজ্ঞান-মন্দিরের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর ভিতরের মানুষ দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, আদৃত, স্বীকৃত ও পূজিত হয়েছিল।

১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গ বন্যায় সেবাকার্য্যে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিজ্ঞান-মন্দিরের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বন্যাবিধ্বস্ত দেশের সেবাক্ষেত্রে এসে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে একটা সহজ পদক্ষেপ মাত্রই হয়েছিল। সেবাকার্য্যে সারা বাঙলায় সেদিন কি অপূর্ব্ব সাড়াই না জেগেছিল! বাঙলার সহর গ্রাম কোথাও আর বাকি ছিল না। সর্ব্বত্র সকলেই অন্ন বস্ত্র অর্থ নিয়ে ছুটে এসেছিল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে। কল্যাণ-কর্ম্মের সূত্র ধরে তারা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে কাছে পেয়ে ধন্য হয়েছিল।

ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত—একদিকে অফুরন্ত স্নেহ, অপরদিকে সুগভীর শ্রদ্ধা। তাঁদের এই সুনিবিড় মধুর সম্পর্ক রসায়নের ল্যাবরেটরিকে আনন্দরসে ভরে রাখত—গবেষণাকার্য্যের মধ্য দিয়ে সেই আনন্দ দেশগঠনের স্বপ্নে ভরপুর হয়ে উঠত। গুরুশিষ্যের এই অনুপম সম্পর্ক হতে সংঘশক্তির উদ্ভব হয়ে বাঙলার বিজ্ঞানমন্দিরে রসায়নশাস্ত্র-

চর্চ্চায় ভারতীয় অগ্রগামীর দল সৃষ্ট হয়, যার পুরোভাগে ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

স্বাদেশিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনের মধ্যে দেশের প্রাণশক্তির উৎস ও প্রাণোৎসর্গ যজ্ঞের লীলা দেখতে পেয়েছিলেন, আবার গান্ধী আন্দোলনের রাজপথে দেশের মুক্তির পথ তাঁর দৃষ্টিপথে ধরা দিয়েছিল। দেশের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন বলেই একদা চরকার ঘোর সমালোচক হয়েও অবশেষে নিজহাতে চরকা কেটে গ্রামে-গাঁথা দরিদ্র দেশের প্রাণের সুরে সুর মেলাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। বেশভূষার পারিপাট্যকে তিনি কোনদিন গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর পরিচ্ছদের সরলতা অবশেষে খদ্দরের আশ্রয়ে বাঞ্ছিত পূর্ণতা লাভ করে দেশের দীনতমের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল। আচার্য্যের আভিজাত্য ধন-মান-মর্য্যাদার মুখ চাহে নাই, তাঁর আভিজাত্য ছিল চারিত্রশক্তির প্রাচুর্য্যে, মননশক্তির গভীরতায় ও বিদ্যাবত্তায়, কর্ম্ম-সাধনায় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে, সুগভীর দেশপ্রেম ও পরিপূর্ণ আত্মদানে।

চিরকুমার আচার্য্য অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। কলকাতা আপার সার্কুলার রোডে সায়ান্স কলেজের দ্বিতলে নৈর্ঋত কোণে একখানি ঘরে তিনি থাকতেন। একটি চৌপায়ের উপর সামান্য শয্যা বিস্তৃত থাকত। আর কয়েকটি আলমারিতে বই ভর্তি ছিল। বিজ্ঞানসেবী হলেও প্রফুল্লচন্দ্র নিয়মিতরূপে সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চ্চা করতেন। মাতৃভাষায় তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। কত বিষয়ে যে তাঁর পাঠের আগ্রহ ছিল তা যথাযথ বুঝানো যায় না। একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, খুব মনোযোগ সহকারে মাইকেল কলিন্সের জীবনী পাঠ করছেন। অপর একদিন 'আর্ট ও আহিতাগ্নি' (যামিনী সেন প্রণীত) বইখানির বিভিন্ন অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি আমাকে দেখাতে লাগলেন। লাইনের নীচে দাগ দিয়ে তিনি বই পড়তেন এবং পৃষ্ঠার পার্শ্বে ফাঁক জায়গায় কখন একটু মন্তব্য লিখতেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি বিষয়ে ভাল লেখা তিনি নিজ হাতে কাটিং করে রাখতেন। সেক্সপীয়র তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল একথা অনেকে জানেন। আবার এমার্সন

থেকে তিনি অনেক সময় কথা উদ্ধার করতেন। পাঠাগার সম্বন্ধে তাঁর একটি বক্তৃতায় আছে—

"এমার্সন বলেন, 'গোলাপ বাগান কার? আমার; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ! বাগানের মালিক বেড়া বাঁধান, মালি রাখেন, জল সেচন করেন; সে অনেক কাণ্ড! কিন্তু অমন শোভা ত কারও একার নয়।' কথাটি পাঠাগার সম্বন্ধেও সত্য।"

দেশের অন্ন-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, সমাজ-সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে আচার্য্য নানা স্থানে, নানা ভাবে নানা বক্তৃতা দিয়ে দেশবাসীর চিত্ত উদ্বুদ্ধ করে তাদের দৃষ্টি-পরিধির বিস্তার সাধনে যত্নবান্ হয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর মনকে নানা দিকে মুক্ত করে তার মানসিক জড়ত্বের অপসারণ করা। তাঁর বক্তৃতা শুনে মনে হতো, শ্রোতা যেন তাঁর সঙ্গে পৃথিবী পরিক্রমা করে, সকল দেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর ও কর্ম্মবীরগণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হচ্ছে ও তাঁদের আদর্শ, উদাহরণ, নানা বিষয়িণী চিন্তা ও বিবিধ চেষ্টা হতে কর্ম্মের আহ্বান শুনছে—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত!

মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রতি আচার্য্যের অশেষ মমতা ছিল। সমাজে মধ্যবিত্তের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই মধ্যবিত্তের আসন্ন পতনের লক্ষণ দেখে তিনি অতিশয় বিচলিত হয়েছিলেন। মধ্যবিত্তের অন্নসমস্যা যে দিন দিন কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে উঠছে তা উপলব্ধি করেই তিনি বলেছিলেন—("অন্নসমস্যা" ২,—প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২৬)

"আজ এই জীবনসন্ধ্যায় রসায়নের পরীক্ষাগার থেকে বাহিরে এসে উৎকট অন্নসমস্যা সম্বন্ধে যদি আলোচনা আরম্ভ করে থাকি, তবে আপনারা জানবেন সে নিতান্তই প্রাণের দায়ে। বাঙালীর আজ পেটের দায়।...... আজ সমস্ত দেশের ছাত্রদের গলা ছেড়ে ডেকে বিমর্ষভাবে আমাকে বলতে হচ্ছে—সাবধান! বিপদ সন্নিকট। ছাত্র তোমরা, দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল। তাই এই সকল অপ্রিয় সত্য তোমাদের কাছে খুব স্পষ্ট করেই বলছি। ...... মধ্যবিত্ত বাঙালীর সন্তান ডিগ্রী পেলেই জীবিকা-সংস্থান করতে পারবে, আর ডিগ্রীর অভাবে চারিদিক অন্ধকার দেখবে—এটা কত বড় ভুল আজ নিঃসংশয়ে তা বুঝে নিতে হবে।......কলেজের দ্বারে এই যে শত শত ছাত্র আঘাত

করছে,মাথা খুঁড়ছে, এরা কি প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থী অথবা ডিগ্রীপ্রার্থী মাত্র—উদ্দেশ্য গলাধঃকরণ, উদ্গিরণ ও ডিগ্রীগ্রহণ।······যে শিক্ষায় শুধু মেরুদণ্ডহীন গ্রাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না, যে-শিক্ষা আমাদের 'করে খেতে' শেখায় না, দুর্বল অসহায় শিশুর মত সংসার-পথে ছেড়ে দেয় সে শিক্ষার প্রয়োজন কি?"

তারপর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হয়ে গেছে। বাঙালীর অন্নসমস্যা ও শিক্ষাসমস্যা দিন দিন আরও জটিল হয়ে উঠেছে। আমরা আচার্য্যের সাবধান-বাণীতে কর্ণপাত করি নি, তাঁর কথা অনুধাবন করে দেখি নি। স্বাধীন দেশে আচার্য্যের বাণী আজও অবজ্ঞাত হয়ে থাকলে মধ্যবিত্তের মরণ অবধারিত, সন্দেহ নেই। আজও কলেজের দ্বারে আঘাত করছে, মাথা খুঁড়ছে শত শত নয়, সহস্র সহস্র ছাত্র। প্রতি বৎসরই এদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আজও লেখাপড়ার নামে সেই গলাধঃকরণ, উদ্গিরণ, তারপর ডিগ্রী ও চাকরি। শিক্ষার যে আমূল পরিবর্তন চাই একথা এখন সকলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু জাতিগঠনের মূলীভূত যুগান্তরকারী এই সংস্কার-কার্য্য সাধনের জন্য যে আবেগ উদ্বেগ অস্থিরতা, যে গভীর চিন্তা, বিশাল অভিজ্ঞতা, স্থির মননশীলতা ও প্রয়োগ-ক্ষমতা, যে দেশাত্মবোধ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অবস্থার সহিত যে সত্য পরিচয়, দেশের জনসাধারণের জন্য যে দরদ ও বেদনাবোধ এবং তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যে তীব্র সচেতনতা ও যথার্থ জ্ঞান চাই, তার প্রকৃত লক্ষণ আজও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষা উপেক্ষিত হলে ভাগ্য আমাদের উপেক্ষা করবে, এই সহজ কথাটা পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার নানা আড়ম্বরপূর্ণ কঙ্কালের বোঝা ঘাড়ে করে দেশ প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছে।

প্রকৃত শিক্ষা চাই, প্রকৃত শিক্ষকও চাই। পরাধীন অবস্থার নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত শিক্ষক। ভারতীয় আদর্শে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের ধারা আচার্য্যের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হ'য়েছিল অথচ তিনি ছিলেন ভারতে নবযুগের অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর মধ্যে গুরুশিষ্য সম্পর্কের যে পরিপূর্ণ রূপটি আমরা দেখি, শিক্ষাক্ষেত্রে তা আমাদের চিরসম্পদ। আজ সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধাহীনতার দুর্দ্দিনে আচার্য্যের কথা স্মরণ করে এই কথাটি

যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, প্রকৃত বিদ্যালাভ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারে। স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় স্বাদেশিকতার যে উগ্র যোদ্ধরূপ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকট হয়েছিল আজ তা সংহৃত হয়েছে। কিন্তু স্বাদেশিকতার যে শুচি শান্ত মঙ্গলময় রূপ শিক্ষাক্ষেত্রে আচার্য্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছিল, আজ দেশগঠনের পটভূমে তা স্ফুটতর ও উজ্জ্বলতর হয়ে আমাদের সত্য পথের নির্দ্দেশ দিচ্ছে। শিক্ষার বনিয়াদ স্বাদেশিকতায় এবং শক্তির উৎসমূল স্বদেশীর দীক্ষায়—আচার্য্যের মহান্ জীবন এই সত্যের স্বাক্ষর বহন করে।

* 'প্রবাসী' ষষ্ঠী বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে ও মাসিক 'শিক্ষা' পত্রিকায় মল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত ও পুনর্মুদ্রিত।

জনসেবায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী কর্ম্মচেষ্টা সেবার অখণ্ড মূর্ত্তিতে ফুটে উঠে দেশে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছে সত্যই তার তুলনা নেই। কর্ম্মযোগী আচার্য্যের সকল চেষ্টাই ছিল বহুজনহিতায় এবং স্বার্থলেশশূন্য। বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্পগঠনক্ষেত্রে ও সমাজসেবা ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই দেশসেবা ছিল তাঁর মূলমন্ত্র ও প্রেরণার উৎস, তাই সর্ব্বত্রই তাঁর স্থান এত পবিত্র ও সু-উচ্চ।

সেবা সম্পর্কে তাঁর নিজ মুখের একটি কথা উল্লেখ করছি! কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটু ভূমিকা দরকার। ১৯২১ সনে তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা এসেছে। ভারতবাসীর বুকের উপর থেকে বহু শতাব্দীর ভয় ও জড়ত্বের জগদ্দল পাষাণ অপসারিত হচ্ছে। আন্দোলনের গভীর প্রবল আবেগে বঙ্গদেশ ও বাঙলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা সহর টলমল করছে। মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দেশবন্ধু দাশরূপে বাঙলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। আন্দোলনের গতিমুখে দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে গবর্মেণ্ট কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। তখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে একখানি পত্র লেখেন। অগ্নিপরীক্ষার দিনে দেশবন্ধুর অশেষ সাহস, স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রেম, আত্মোৎসর্গ এবং মহান আদর্শবাদের ভূয়সী প্রশংসা করে, চিঠিখানির শেষের দিকে আচার্য্যদেব লিখছেন—"চিরজীবন একান্তভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধ হয় সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রিয় ভগিনি, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, যখন আমি বিজ্ঞান চর্চ্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"

প্রকৃতপক্ষে দেশসেবা ব্যতীত আচার্য্যের জীবনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিভিন্ন কার্য্যাবলি "সূত্রে মণিগণা ইব"—সূত্রে

যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে তেমনই দেশসেবার স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হয়ে সুন্দর ও সমুজ্জ্বল হয়েছিল। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় আচার্য্য যে সেবাকার্য্যে ব্রতী হয়েছিলেন এখন সংক্ষেপে তারই সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলব।

দেশসেবার জন্যে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের অন্যতম উপায় হিসাবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছয়বার বিলাত ভ্রমণ করেন। ১৯২১ সনে চতুর্থবার বিলাত থেকে ফিরে এসে তিনি সংবাদ পেলেন, খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত হয়েছে। দুর্গতদের জন্যে আচার্য্যের প্রাণ উদ্বেগ-চঞ্চল হয়ে উঠল। তথাপি কলকাতায় থেকে অবস্থার গুরুত্ব ঠিকমত উপলব্ধি করা সম্ভব হলো না। আচার্য্য গ্রাম বড় ভালবাসতেন। খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। এই গ্রাম তাঁর অতি প্রিয় ছিল। প্রতি বছর বিজ্ঞান কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির সময় তিনি আপন গ্রামে যেতেন। খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় এইবার তিনি গ্রামে এসে স্বচক্ষে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা উপলব্ধি করে অতিশয় বিচলিত হলেন। আচার্য্য বলেন, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্তু সেই ভীষণ অবস্থায় অবিচলিত রইলেন—চারদিকে অভাব ও অন্নকষ্টে হাহাকার পড়ে গেছে—তিনি তা গ্রাহ্য করা প্রয়োজন মনে করলেন না। গবর্মেন্টের মনোভাবটা এই যে—আর তাঁরা তা প্রচারও করেছিলেন—অভাব কোথায়? গাছে অপর্য্যাপ্ত ফল, পেড়ে খাও; পুকুরে প্রচুর মাছ, ধরে খাও! কিন্তু আচার্য্যের একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো দুর্ভিক্ষ প্রশমনের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা।

দুর্গতদের সহায়তা করবার ভার আচার্য্য নিজের উপর নিলেন। এই কাজের জন্যে তিনি দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে তাঁকে সাহায্য করল। খুলনায় শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ জননায়কগণ এবং বহু সেচ্ছাসেবক—তাঁদের অনেকে বরিশাল ও ফরিদপুর জেলা থেকে এসেছিলেন—আচার্য্য রায়ের এই কঠিন কল্যাণব্রত উদ্‌যাপনে সহায় হলেন। বহু পরিশ্রম করে স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষপীড়িত-গণের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করলেন। গবর্মেন্ট কিন্তু সরকারীভাবে এই দুর্ভিক্ষকে স্বীকার করলেন না। তাই আচার্য্য "আত্মচরিত" গ্রন্থে লিখেছেন "স্বাধীন দেশ হলে খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট যে এজন্যে কঠিন শাস্তি পাইত তাহা

নহে, মন্ত্রীসভা বিতাড়িত হইত। কিন্তু ভারতে বন্যা-দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে এই সব ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে।" যারা প্রকৃত দেশসেবক তাঁদের প্রতিনিয়ত এইরূপে পরাধীনতার লজ্জা ও গ্লানি অনুভব করতে হয়েছে।

এইবার উত্তরবঙ্গ বন্যার কথায় আসা যাক। এই সর্ব্বনাশা বন্যায় সেবাকার্য্য পরিচালনা করে জনসেবাক্ষেত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পূর্ব্বে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখ করা হয়েছে। আন্দোলনের লক্ষ্য স্বরাজ লাভ। ১৯২১-এর শেষে এবং ১৯২২-এর প্রথমভাগে আন্দোলনের গতি বিপুল বেগে ভারতের সর্ব্বত্র প্রবেশ করেছে। গান্ধীজী এই অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন হঠাৎ স্থগিত করলেন— কারণ উত্তর প্রদেশে চৌড়ীচাওড়া গ্রামে উন্মত্ত বিশৃঙ্খল জনতা হিংসার পথে থানায় অগ্নিসংযোগ করে পুলিশ হত্যা করেছে। সারা দেশে অহিংস সংগ্রামে উৎসাহের বন্যাপ্রবাহ ছুটছিল। প্রবাহের মুখ ভরা জোয়ারে এইরূপে হঠাৎ অবরুদ্ধ হওয়ায় দিশাহারা দেশচিত্তে অস্থির আবেগ স্তম্ভিত হল।

বাঙলায় এই স্তম্ভিত ও রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হয়ে গেল উত্তরবঙ্গে বন্যাপীড়িতের সেবাকার্য্যের বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্রে। রাজনীতিক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা গান্ধীজীর মত, সেবাক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই এসে দাঁড়ালেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—কর্ম্মে অনুপম, ব্যক্তিত্বে অসাধারণ, চরিত্রবত্তায় সুদৃঢ়, বিপন্নের আহ্বানে সাড়া দিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। উত্তরবঙ্গ বন্যা-সাহায্য-প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান হয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র হলেন দেশবাসীর স্থির বিশ্বাসভূমি ও অটল আশ্রয়।

উত্তরবঙ্গের বন্যার জন্যে দায়ী সান্তাহার অঞ্চলে আড়াআড়িভাবে নির্ম্মিত রেলের বাঁধ। বন্যা হবার এক বৎসর আগে গ্রামবাসীরা দ্রুত জল-নিকাশের সুবিধার জন্যে নবনির্ম্মিত রেলপথের সঙ্কীর্ণ সাঁকো বা কালভার্টকে চওড়া করে সেতুর মত নির্ম্মাণ করবার জন্যে সরকারে দরখাস্ত করে। কিন্তু রেল কোম্পানীর বিদেশী অংশীদারগণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সরকার হতে সে আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। ফলে প্রবল বর্ষায় অপ্রশস্ত কালভার্টে ভালভাবে জলনিকাশ না হওয়ায় এক পার্শ্বে সঞ্চিত বিপুল জলরাশির চাপে রেলপথ

ভেঙ্গে গিয়ে ঐ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। আত্রাই নদী স্ফীত হয়ে কূল ছাপিয়ে সাংঘাতিক প্লাবন ঘটায়। বন্যায় রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়।

বন্যার সংবাদ পেয়েই কর্ম্মবীর সুভাষচন্দ্র বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছুটে যান এবং সেখান থেকে আচার্য্যের নিকট এবং কংগ্রেস অফিস ও বঙ্গীয় যুবসঙ্ঘ অফিসে তার করেন। তৎক্ষণাৎ কলকাতা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন হলে সভা আহ্বান করে বন্যা সাহায্য সমিতি গঠন করা হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোক এই সভায় বিপুল আগ্রহে যোগদান করে। আচার্য্য তখন সবেমাত্র খুলনা দুর্ভিক্ষের কাজ শেষ করেছেন। তারপরেই তিনি দেশবাসীর অনুরোধে উত্তরবঙ্গ বন্যা সাহায্য সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেবাকার্য্য সুরু হয়ে যায়।

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণ দিকের নিম্নতলে প্রশস্ত কয়খানি ঘরে বন্যা সাহায্য সমিতির অফিস খোলা হয়। আচার্য্য তখন বলেন, বিজ্ঞান মন্দির এইবার সেবামন্দিরে পরিণত হয়েছে! 'আত্মচরিত'-এ আচার্য্য লিখেছেন—বেঙ্গল রিলিফ কমিটির অফিসে প্রত্যহ সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাজ চলত—প্রায় সত্তর জন স্বেচ্ছাসেবক—তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন—অফিসের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য পরিচালনা করতেন। বিভাগগুলির নাম সাধারণ কার্য্যালয়, কোষাগার, দ্রব্য-ভাণ্ডার, টাকাকড়ি জিনিষপত্র গ্রহণ করবার এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চলে পাঠাবার অফিস এবং প্রচার বিভাগ। প্রচার বিভাগ থেকে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করা হতো। ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি—ফ্রান্স, আমেরিকাতেও সাহায্যের জন্যে আবেদন করা হয়। অফিসে কাজ চলত ঘড়ির কাঁটার মত। সেবার আগ্রহ কর্ম্মিগণকে একসূত্রে গেঁথে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। বন্যার ভীষণ দুঃসংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র দেশে দিকে দিকে সাহায্য সমিতি গড়ে ওঠে। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির আহ্বানে প্রধান সংস্থাগুলি রিলিফ কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে প্রতিনিধি পাঠায়। এইরূপে প্রত্যেক সংস্থার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অথচ সহযোগিতা ও সুশৃঙ্খলায় সেই বিরাট জনসেবা-কার্য্য সুপরিচালনা করা সম্ভব হয়। সুভাষচন্দ্র, সতীশ দাসগুপ্ত, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ

সেনগুপ্ত, বগুড়ার যতীন রায় প্রভৃতি নেতৃবর্গ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে সাহায্য-কার্য্য করতে থাকেন।

কলকাতা বিজ্ঞান মন্দিরে রিলিফ কমিটির অফিসে নিত্য শত শত স্বেচ্ছাসেবক অর্থ, বস্ত্র ও চাউলাদির বোঝা নিয়ে আসত। ছেলেরা সকলেই আচার্য্য রায়ের এক আধটা কিল-চড়ের আদর পেয়ে ধন্য হতো এবং নিজ নিজ স্থানে ফিরে গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বন্যার জন্যে সাহায্য সংগ্রহের কার্য্যে লিপ্ত হতো। সারা দেশ জুড়ে সে যেন একটা বিরাট সেবা-যজ্ঞের আয়োজন।

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সান্তাহারে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির প্রধান কেন্দ্র খোলা হয় এবং অতি সুশৃঙ্খলার সহিত বিভিন্ন গ্রাম-কেন্দ্রের কার্য্য পরিচালনা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ অধিকাংশই অসহযোগী ছাত্র ও যুবক। তাঁরা অতি দূরবর্তী গ্রামে নৌকাযোগে, পদব্রজে, জলকাদা ভেঙ্গে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হন, লোকের মনে সাহস সঞ্চার করেন, তাদের অন্ন বস্ত্র অর্থাদি দিয়ে সাহায্য করেন এবং বিধ্বস্ত গৃহ পুনর্নির্মাণ এবং গবাদি-পশু রক্ষার ব্যবস্থা করেন। অফিসে অর্থ বস্ত্রাদির হিসাব অতি যত্নে রক্ষিত হয় এবং হিসাবাদি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। এই সময় বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' কাগজ লেখেন,

"মিঃ গান্ধী যদি আর দুইজন স্যর পি. সি. রায় তৈরি করতে পারতেন, তবে এক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বরাজ লাভ করতে সক্ষম হতেন। * * * স্বেচ্ছাসেবকেরা গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে। * * * স্যর পি. সি. রায় (বিরাট বন্যা সাহায্য কার্য্যের ভিতর দিয়ে) যে বীজ বপন করেছেন অসহযোগীরাই তা ভোগ করবে, ভোগ করবার যোগ্যতাও তাদের আছে।"

ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড এন্ড্রুজ বন্যাপীড়িত অঞ্চল কয়বার পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন—"বাঙলাদেশে এই বন্যাসেবাকার্য্যের ভিতর অসহযোগ আন্দোলন আরও একবার জয়লাভ করিল।" প্রকৃতপক্ষে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপৎকালে যে দেশব্যাপী সেবাকার্য্যের আয়োজন হয়েছে তা থেকে আমরা বাঙালীর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ কি, কোন্ পথে সে শক্তি জাগ্রত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপ্রযুক্ত হয়ে ফলপ্রসূ হতে পারে, তার সন্ধান পেয়েছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মাসে ২।৩ বার স্বয়ং উপস্থিত হয়ে উত্তরবঙ্গে বন্যা-পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করে আসতেন। নৌকাযোগে তিনি সুদূর গ্রাম-সমূহের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করতেন। আচার্য্য বলেন—

"খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্পর্কে সেবাকার্য্য করবার সময় আমি বুঝতে পেরেছি, এক শতাব্দী পূর্বে চরকা যদি পরিত্যক্ত না হতো, তবে আজ চরকা অনাহারক্লিষ্ট গ্রামের জনসাধারণের পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হতো। ** আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার জয়যাত্রার ফলে লক্ষ লক্ষ কাটুনী, তাঁতি, ছুতার, কামার, মাঝিমাল্লা, গাড়োয়ান প্রভৃতি কিরূপে নিরন্ন হয়ে পড়েছে তার আর বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই। ** বাঙলাদেশে ধান্য রোপণ হতে কাটা পর্য্যন্ত কাজ শেষ করতে মাত্র তিন মাস লাগে। যেখানে রবিশস্য হয় সেখানে কৃষক বৎসরে ছয়মাস পরিশ্রম করে। বাকি ৫।৬ মাস কাজ তাদের থাকে না। চরকা যে কৃষকদের পক্ষে কেবল আশীর্ব্বাদ নয়, পরন্তু বন্যা-দুর্ভিক্ষের সময় বীমার কাজ করে, উত্তরবঙ্গ বন্যার সময় তা দেখা গিয়েছে! বন্যাসাহায্য কার্য্যের সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে কয়েক হাজার চরকা বিতরণ করা হয় এবং কাটুনীর হাতে উৎপন্ন সূতায় খদ্দর তৈরি হয়। কিন্তু দেখা যায়, ধান পাটের অবস্থা ভাল হলে কৃষক আর চরকা কাটে না—বৎসরে ৫।৬ মাস প্রধানতঃ আলস্যেই কাটায়। আলস্যের ফল অতি বিষময়। চরকার অভ্যাস হলে কাটুনীর ব্যক্তিগত আয় যত কমই হোক, সারা দেশে সমষ্টির আয় কোটি কোটি টাকা দাঁড়ায়—'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ', তৃণরাশি একত্রে রজ্জুতে পরিণত হলে তা দিয়ে মত্ত হস্তীও বাঁধা যায়। আমার দৃঢ় অভিমত, কৃষি-প্রধান দেশ বলে সূতাকাটা ও কাপড়বোনা কুটির শিল্পরূপে বাঙলার সর্ব্বত্র প্রচলিত হতে পারে।"

১৯৩১ সনে ব্রহ্মপুত্র নদীর ভীষণ বন্যায় বিশ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৪ লক্ষ গৃহ বিধ্বস্ত হয়। এই সময় আচার্য্য রায় অগ্রণী হয়ে পুনরায় বন্যা-পীড়িতের সাহায্যের ভার গ্রহণ করেন এবং সঙ্কটত্রাণ সমিতি সাহায্যকার্য্য পরিচালনা করেন। এবারও সাহায্যকার্য্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ, স্বেচ্ছা-সেবকগণ এবং লোকসাধারণ যথেষ্ট সাড়া দেয়। কয়েক মাস ধরে সেবাকার্য্য চলতে থাকে এবং বন্যাপীড়িত বিপন্ন জনগণ আশ্রয় ও সাহস পায়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আশাবাদী ছিলেন। বাঙালীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, "বাঙালীর চরিত্রে অনেক মহৎ গুণ আছে এবং আমি নিজেকে বাঙালী বলে গর্ব অনুভব করি। কিন্তু একটা প্রধান বিষয়ে—জীবিকা সংগ্রহ ও অর্থসংস্থানে সে অক্ষমতা দেখিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোহ বাঙালী চরিত্রে একটা প্রধান ত্রুটি।" বাঙালী যাতে এই সব দোষ-দুর্ব্বলতা পরিহার করে, আচার্য্য রায় সেজন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঘুরেছেন, লোককে বুঝিয়েছেন ও বক্তৃতা দিয়েছেন। শিক্ষক, শিল্প-প্রতিষ্ঠাতা, দেশসেবক হিসাবে কাজও তিনি অনেক করে গেছেন।

জনসেবায় গান্ধীর পথ ও আচার্য্যের পথ এক ছিল। উভয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গঠন করে ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও গ্রামে-গাঁথা ভারতের পুনর্গঠন গ্রামগঠনের দ্বারাই সম্ভব হবে, এই বিশ্বাস করতেন।

আচার্য্য বহু বৎসর ধরে চরকা, খাদি ও অস্পৃশ্যতা-পরিহার সম্পর্কে প্রচার করেন। একটি দিনের কথা মনে পড়ে। আচার্য্য রায় বর্দ্ধমান জেলার পাটুলি গ্রামের বাজারে অনুষ্ঠিত জনসভায় চরকা খাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করছেন। এমন সময় তারে খবর এল, গান্ধীজী কারামুক্ত হয়েছেন (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪)। সুবিখ্যাত আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র এই সংবাদ পেয়ে আনন্দে শিশুর মত বক্তৃতা-মঞ্চের উপর নৃত্য করতে লাগলেন। গান্ধীজীর সহিত এমনই একাত্ম তিনি ছিলেন। দেশসেবায় আমরা যেন সর্ব্বভাবে মহান্ আচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। তবেই জাতির জীবনে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা সার্থক হবে।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৬১, হতে পুনর্মুদ্রিত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	
১৮৬১	প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম, ২রা আগস্ট। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা
১৮৭১	হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন ; আমাশয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে স্কুল ছেড়ে দেন ; দেড় বৎসর রুগ্ন থাকার পর
১৮৭৪	এলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি
১৮৭৯-৮২	মেট্রোপলিটন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ
১৮৮২	গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গমন
১৮৮৭	এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি উপাধি লাভ
১৮৮৮	স্বদেশে প্রত্যাগমন, আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে
১৮৮৯	প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, জুলাই হতে, বেতন ২৫০৲
১৮৯১	আজীবন সঙ্গী অনিদ্রা রোগের আত্মপ্রকাশ
১৮৯২	বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সূত্রপাত
১৮৯৪	তৈল ও ঘৃত বিষয়ে রাসায়নিক প্রবন্ধ প্রকাশ—Journal of the Asiatic Society of Bengal
১৮৯৬	Mercurous nitrite আবিষ্কার Journal of the Asiatic Society (Bengal), 1896
১৯০০	বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা ; ১৯০১ হতে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর
১৯০১	গোখেল ও গান্ধিজীর সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যের সূত্রপাত
১৯০৪	দ্বিতীয়বার বিলাত গমন—ইউরোপীয় গবেষণাগার দেখতে গভর্ণমেণ্ট পাঠান

১৯০৯	জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি, মাণিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্য্যদেবের স্নেহচ্ছায়ায় মিলিত হন
১৯১০	বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হন
১৯১১	The Congress of the Universities of the Empire-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে বিলাত যাত্রা সি-আই-ই উপাধি লাভ, Durham বিশ্ববিদ্যালয়ের Honourary D. Sc. উপাধি লাভ
১৯১৪	পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান
১৯১৬	প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরে যোগদান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে extension বক্তৃতাদান
১৯১৭	ভারতীয় জাতীয় সমাজ-সংস্কার সমিতির সভাপতি
১৯১৯	'নাইট' উপাধি লাভ
১৯২০	ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি
১৯২১	পুনরায় বিলাতযাত্রা
১৯২২	খুলনা দুর্ভিক্ষে সাহায্য ; উত্তরবঙ্গে বন্যায় সাহায্য ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০ টাকা দান ও নাগার্জ্জুন পুরস্কার স্থাপন
১৯২৩	আমেদাবাদ জাতীয় বিদ্যালয়ে বক্তৃতা ; আমেদাবাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা
১৯২৩	উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি স্থাপন—প্রথম সভাপতি
১৯২৫	শিউড়ী মেলার উদ্বোধন ; শান্তিনিকেতন পরিদর্শন ; নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা
১৯২৬	পুনরায় বিলাত যাত্রা

১৯৩১-৩৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ; সপ্ততিবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে টাউনহলে সংবর্দ্ধনা, ২৫-এ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

১৯৩৪ Hony, Fellow, Chemical Society London

১৯৩৬ রসায়নের পালিত অধ্যাপকপদ হতে অবসর গ্রহণ, ৭৫ বৎসর বয়সে

১৯৪১ সিনেট হলে প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসব

১৯৪৪ মৃত্যু, ১৬ই জুন, ৮৩ বৎসর বয়সে।*

*মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়" পুস্তক থেকে এই জীবনপঞ্জী উদ্ধৃত হল।

নির্ঘণ্ট

পৃষ্ঠা

অ

অক্সফোর্ড ... ৪৬, ১০৪
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ... ৪৩
অক্ষয়কুমার ... ১৯
"অচলায়তন" ... ১৪৭
"অব্রাহ্মণদের আন্দোলন" ... ১২১
অমৃতসর ... ১২১
অরিষ্টটল ... ১২
অশোক ... ১৪০
অশ্লেষা মঘা ... ১১৬
অসহযোগ আন্দোলন ... ১৯১, ২০৭
অস্পৃশ্যতা বর্জন ... ১৮৩, ২০৯
অহিংস অসহযোগ ... ২০৫

আ

আকবর ... ৬৫, ১০০
আর্কিমিডিস ... ৪৯
আগরওয়ালা, রামযশ ... ৯৯
আচার্য্য চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর ১৩২
আচার্য্য চৌধুরী, সূর্য্যকান্ত ... ১৩২
"আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র" ... ১৮৩
"আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়" ... ২১২
"আচার্য্য বাণী" ... ১৮০
"আত্মচরিত" ১৭, ১৮০, ২০৪, ২০৬
আত্রাই ... ২০৬
আদিশূর ... ১৪০
"আনন্দমঠ" ... ৩০
আমেদাবাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২১১
"American Civil War" ... ১০০

পৃষ্ঠা

আর্য্যভট্ট ... ২৭
আর্করাইট ... ৭৮, ১৪৯
"আর্ট ও আহিতাগ্নি" ... ১৬৪, ১৯৯
আরামবাগ ... ১৯৩
আলবার্ট হল ... ৫১
আলবার্ট স্কুল ... ৩৬
"আলালের ঘরের দুলাল" ... ১১৯
আহোম ... ১৪১
আয়রণসাইড, স্যর এডওয়ার্ড ১০৬
আয়ার ... ১৪৭
আয়েঙ্গার ... ১৪৭
আয়েঙ্গার, শ্রীনিবাস ... ৪২

ই

ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট ৭১, ১৩৪
ইউনিভার্সিটিজ কংগ্রেস ... ২১১
"Economic History of India" ৩১
Italian War of Independence ১০০
"India under Victorian Age" ৩১
ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন ... ২০৬
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ... ৩১, ৫৮

ঈ

ঈশ (উপনিষদ) ... ২৯

উ

উইলসন, প্রেসিডেণ্ট ... ১৪৯
Wilson, Horace Hayman ২৮
উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট ... ১০৭
উত্তরবঙ্গ বন্যা ... ১৮৬, ১৯৮, ২০৫, ২০৮, ২১১

পৃষ্ঠা

উপনিষদ ... ১২, ২৯, ৫৫
উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলন ... ২১১

ঋ

ঋগ্বেদ ... ১৩৮

এ

এডিনবরা ... ২৫, ৩৩, ১৭৭
এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ... ৪৩, ২১০
এডিসন ... ১০২, ১০৪
"Addison's Essay" ... ৩৩
এনড্রুজ, রেভারেণ্ড ... ২০৭
"Empire of Business" ... ৯৮
এম্প্রেস মিল ... ১২০
এমার্সন ৩, ৮, ১০, ১২, ২৪, ২৫, ৬০, ১২২, ১৯০, ১৯৯, ২০০
Elphinstone ... ২৮
এলবার্ট স্কুল ... ৭, ২১০

ও

ওমর খৈয়ম ... ১২৮
ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ... ১৬৩
ওয়াচার ... ৭৯
ওয়াট, জেমস্ ... ১৪৯
ওয়ারেন হেষ্টিংস ... ৬৫
ওয়াসিংটন, জর্জ ... ৩৪

ক

কঠ (উপনিষদ) ... ২৯
কণাদ ... ২৮
কণাদের পরমাণুবাদ ... ২৮
"Condition of Peasantry in Bengal" ২৭
কনস্ট্যান্টিনোপল ... ২০
কপোতাক্ষ ... ১৭৭
কবীর ... ১৪২

পৃষ্ঠা

কর্ডেলিয়া ... ২০
করিমভাই, ইব্রাহিম ... ৮২
করিমভাই, ফজুলভাই ... ৬৬, ১২৬
কলকাতা ... ৫৮, ৬৪, ৮০
কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট ৬৬, ৮২, ৯১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩, ৪৫, ২১১
কলিকাতা সায়ান্স কলেজ ১৭৯, ১৮৬, ১৮৯, ১৯০, ১৯৪, ১৯৮, ২০৬, ২০৭
কসবা লাইব্রেরী ... ২১
কংগ্রেস অফিস ... ২০৬
Cowper ... ২২
কান্যকুব্জ ... ১৪০
কাভুর ... ৪৩
কার্নেগী, এণ্ড্রু ৯, ১০, ১৪, ৮৭, ৯৮, ১০৫, ১২৮
কারোলিনা ... ১৪৩
কারলাইল ... ২৫, ২৬, ৩২
কাশী ... ১৭
কিউ গার্ডেন্স ... ৫, ৬, ৪৭
কিয়াতো বিশ্ববিদ্যালয় ... ৪৪
King Lear ... ২০
"Kubla Khan" ... ২৩
কুলীন ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫
কুষ্ঠালয় ... ৪৭
"কৃষ্ণকান্তের উইল" ... ৩০
কৃষ্ণবাবু ১৫৯, ১৬০, ১৬৩
কেন (উপনিষদ) ... ২৯
কেপ কলোনী ... ৫১
কেপলার ... ৪৮
কেমব্রিজ ৪৬, ১০৪, ১৬০, ১৯২
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ... ৪৩

পৃষ্ঠা

Chemical Society, London ২১২
কেরী, উইলিয়ম ... ১৪৪
কোচবিহার ... ১৪০
কোবে বিশ্ববিদ্যালয় ... ৪৪
কোরাণ ... ১২৯
কোলব্রুক, হেনরী টমাস ... ২৭, ২৮, ৩২
কোলরিজ ... ২৩
ক্রমওয়েল ... ১৪৩
ক্লাইভ ... ৬৫
Calcutta Pottery Works ১২৭
Calcutta Soap Works ... ১২৭

খ

খদ্দর ১৮০, ১৯৪, ২০৮, ২০৯
খড়্গাপ্রসাদ, শীতলপ্রসাদ ... ৯৯
খুলনা ২৮, ১৭৩, ১৮৬ ১৮৮, ১৯৩
খুলনা দুর্ভিক্ষ ২০৪, ২০৮, ২১১
খুলনা সম্মিলনী ... ১৮৩
খোদাবক্স ... ৪৫

গ

গণেরিল ... ২০
গণেশ কোম্পানী ... ১৫
গান্ধী আন্দোলন ... ১৯৯
গান্ধী, মহাত্মা ৫০, ৫১, ৯১, ১৩৩, ১৮০, ১৯১, ১৯৯, ২০৩, ২০৫, ২০৭, ২০৯, ২১০
গারফিল্ড ... ১৪৫
গিলক্রাইষ্ট ... ১৭৭, ২১০
গিলিণ্ডারস ... ৯৪
গীতা ... ১৩৭
"গীতাঞ্জলি" ... ১৪, ২৪, ৬০
গুপ্ত, জে. এন. ... ১৯০
গুপ্ত, মনোরঞ্জন ... ২১২

পৃষ্ঠা

গুপ্ত, বিহারী ... ৩১
গোকুলদাস, মোরারজী ... ৮০
গোখলে ৪১, ৪৭, ৫০, ৭৭, ৯১, ৯২, ৯৩, ১২২, ১৩৩, ২১০
গোল্ডস্মিথ ... ১০
গোস্বামী, ৺কৃষ্ণধন ...১৫৬, ১৫৯, ১৬৩
গোয়েঙ্কা ... ৬৬
গ্যারিবল্ডী ... ৪৩
গ্যালিলিও ... ৪৮
গ্রাহাম ... ৯৪
গ্লাসগো ... ১৪

ঘ

ঘোষ, এস. সি. ... ৭৪
ঘোষ, কালীপ্রসন্ন ... ৬০
ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ... ৪৫
ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ... ১৯৮, ২১১
ঘোষ, মনোমোহন ... ৬৯
ঘোষ, বরেন্দ্র ... ১০৮
ঘোষ, রাসবিহারী ... ১৭৯
ঘোষ, লালমোহন ... ৬৯
ঘোষ, শিশিরকুমার ... ৬০
ঘোষ, সাতকড়ি ... ৪৭, ১০৬

চ

চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী কোম্পানী ৮৭, ১৭১, ১৭২
চক্রবর্তী, ব্যোমকেশ ... ৬৯
চক্রবর্তী, শ্রীসতীশচন্দ্র ... ১৯৩
চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ পঞ্চানন ... ১৭৬, ১৯৩
চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল ... ১৭৪
চণ্ডাল ... ১৪৭
চন্দননগর ... ১৯৩
চন্দ্রাভারকর ... ৭৭

পৃষ্ঠা

চরকা ... ১৯১, ২০৯
"Chinese Problem" ... ৩৮
"চা পান না বিষ পান" ... ৩৭
চামারিয়া, হরদিৎ রায় ... ৬৬
চার্চিল, মিঃ ... ৮১
চার্লস, প্রথম ... ১৪৩
চিন্তামণি ... ৪৭
চিৎপবন ব্রাহ্মণ ... ৭৭
চেঙ্গিস খাঁ ... ২৩
চেদাম ... ৩৪
চৈতন্য ... ৫০
চৌড়ী চাওড়া ... ২০৫

ছ

ছিয়াত্তরে মন্বন্তর ... ১৮৫
ছুঁৎমার্গ ... ১৩৯

জ

জগদীশচন্দ্র ... ৪১, ১৫০
জঙ্গ, স্যর সালার ... ১২৫
জাতি-সঙ্ঘ ... ১৫০
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ... ১৯৬
"Journal of the Asiatic Society of Bengal" ২১০
জাষ্টিস্ চৌধুরী ... ৬৯
"জীবনের সুখ" ... ৮
জুম্মা মসজিদ ... ১২৮
"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" ... ২০৯
জ্যাকসন ... ৪৩

ঝ

ঝাউডাঙ্গা ... ১৯২
ঝুনঝুনওয়ালা ... ৬৬

পৃষ্ঠা

ট

টমসন্, জোসেফ ... ৪৫
টাউন হল ... ২১২
টাটা ... ৬৬
টারনার মরিসন ... ৯৪
"টেক্সট্ বুক কমিটি" ... ১৫

ঠ

ঠাকরসে, স্যর বিঠলদাস ৪৬, ৮০, ৮২, ১২৬
ঠাকুরসে, দামোদর ... ৬৬

ড

ডণ্ডী ... ১৪
ডঃ রমন ... ২০
"Digest of Hindu and Mohamadan Law" ২৭
ডাক্তার জনসন ... ১৭, ১০২
Duns Scotus ... ১০৪
ডামক্রিসশায়ার ... ২৫
ডামিয়েন, ফাদার ... ৪৭
ডারহামস বিশ্ববিদ্যালয় ... ২১১
ডিকেন্স ... ৫, ১৮
ডিগ বি সাহেব ... ১৭, ২৯
"Disease of Silkworm" ৭
ডেকার্ত ... ৭৯

ঢ

ঢাকা ... ১৭২

ত

"তত্ত্ববোধিনী" ... ১৯
তারাকুমার ... ৪৬, ১০০
তাতা, স্যর জেমসেদজি ... ১০৭
তাতা, স্যর দোরাব ৮০, ৮২, ৮৭, ১২৬

	পৃষ্ঠা
তিতুমির, মিঞা ...	১২০
তিলক ...	৭৭, ১২৯
তুং উইলার, মিঃ ...	৮৭
তোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ...	৪৪
ত্রিপুরা ...	১৪০
দ	
দত্ত, কানাই ...	১৮৫, ১৯৭
দত্ত, গোরাচাঁদ ...	৫৮
দত্ত, রমেশ	৩১, ৩২, ১৩৮, ১৯০
দত্ত, রসিকলাল ...	২১১
দত্ত, শরৎকুমার ...	৮৪
দয়ানন্দ ...	১২৯
দার্জিলিং ...	৫, ৩৭
দাসগুপ্ত, নিবারণ ...	১৭৪
দাসগুপ্ত, সতীশ ...	২০৬
দাস, ডাঃ আশুতোষ	১৭৪, ১৮৫, ১৮৬
দাস, ললিতমোহন ...	৫৮
দালাল, মিষ্টার ...	১০৬
দিনাজপুর ...	১৬৯
দিল্লী ...	৬৩, ১২৮
দে, মানিকলাল ...	২১১
দেবীবর ঘটক ...	১৪২
দে, রামদুলাল ...	৫৮
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ...	৬৯, ২০২
দাঁতে ...	১৩১
ধ	
ধর, নীলরতন ...	২১১
ন	
নওগাঁ ...	১৬৩
নটেশন ...	১৫
নটেশন কোম্পানী ...	১৫
নমঃশূদ্র ...	১৯১, ১৯২
নবদ্বীপ ...	১৭, ২৯
নবশাখ ...	১৪৭
'নাইট' উপাধি ...	২১১
"নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকা" ...	৯, ১০
নাগপুর ...	১২০
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ...	২১১
নাগার্জুন পুরস্কার ...	২১১
নারায়ণগঞ্জ ...	৬১
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ...	১৪০
নায়ার ...	১৪৮
নায়ার, স্যর শঙ্করন্ ...	৫৬
নিউটন ...	৪৮, ৭৯
নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ ...	৪৮
New Freedom ...	১৪৯
"নেচার" ...	৪৩
নেটাল ...	৫১
নেপোলিয়ন	১০, ১৪৩, ১৯১
ন্যানসেন ...	৪৭
প	
পদ্মা ...	৬২
পরাঞ্জপে ...	৫০, ৭৭, ৯১
পরাশর ...	১১৬
পলাশীর যুদ্ধ ...	১৮৫
পাটনা ...	১৭৪
পাটেল বিল ...	১৬
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ...	২১১
পামারষ্টোন ...	২৬
পাবনা ...	২০৬
পারিয়া অস্পৃশ্য ...	১২১
পালিত, তারকনাথ ...	১৭৯

	পৃষ্ঠা
পি এণ্ড ও কোম্পানী ...	৮০
পিকিং ...	৩৯
পিটস্‌বার্গ ...	৯, ১৪
"Peoples Library" ...	১৫
পিম ...	১৩২
পুরুলিয়া ...	১৭৩
পেত্রি ...	৪৪
পেরিয়া ...	১৪৭
পোর্ট সৈদ ...	৩২
পৌত্তলিকতা ...	২৯
"Paradise Lost" ...	১০০
প্যারী ...	১৬
প্রবর্ত্তক আশ্রম ...	১৯৩
প্রফুল্ল জয়ন্তী	২১২
"প্রবাসী" ...	১১, ১৯, ২১, ৫১, ৬৬, ৮২, ৯১, ১২৩, ১৩৪, ১৫১, ১৬৪, ২০০, ২০২
Princep, James ...	২৮
প্রেসিডেন্সী কলেজ	১৭৭, ১৯৬, ২১০
প্লেটো ...	১২
ফ	
ফজুলভাই করিমভাই ...	৬৬
ফার্গুসন কলেজ ...	৫০
ফিলিপ, দ্বিতীয় ...	১০৭
Fiscal Commission ...	১০৬
Flora Indica ...	৬, ৪৭
ব	
বকল ...	১৪৪
বঙ্কিমচন্দ্র	১৮, ১৯, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৪১, ৯১, ১৩১
"বঙ্গদর্শন" ...	১৯, ৩০, ৩৬
"বঙ্গদেশের কৃষক" ...	১৩১
বঙ্গলক্ষ্মী ...	৮০, ১২০
বঙ্গীয় যুগীসঙ্ঘ ...	২০৬
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ...	২১২
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ...	২১১
বগুড়া ...	২০৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ...	১৯৫, ১৯৬
Burdwan Muslim Conference	১৭২
বরাহমিহির ...	২৭
বল্লভ ...	৪৬
বল্লাল সেন ...	১৪১
বশিষ্ঠ ...	১৪৩
বসু, আনন্দমোহন ...	৬৯
বসুমতী ...	১৬৯
বসু, যোগীন্দ্রনাথ ...	৪৭
বসু, রাজনারায়ণ ...	১১১
বসু, সত্যানন্দ ...	১৮৮
বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ...	১৭৭, ২১১
বাইবেল ...	৮৯, ১২৯, ১৩৯
Buckle's History of Civilisation	১৪৩
"বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার"	১১
বার্ক ...	৩৪, ৬৯
বার্কমায়ার, আয়রনসাইড ...	৬৬
বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় ...	৪৩, ৭৬
বার্লিন ...	২০
বালি	১৬৫, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৪
বালি সাধারণ গ্রন্থাগার ...	১১
বাসন্তী দেবী ...	১৮৮, ২০৩
বায়রণ ...	৩
বাঁকীপুর ...	২৯
"বিজ্ঞান রহস্য" ...	৩০
বিদ্যাসাগর ...	৪১, ৯১, ১৯৮

পৃষ্ঠা

"বিবিধার্থ সংগ্রহ" ... ১৯
বিবেকানন্দ ৪১, ৬৭, ৯১, ১২৯, ১৩৯, ১৪৩, ১৫০, ১৯২
বিরলা, ঘনশ্যামদাস ... ৪৬, ১০৬
বিশপ্ হিবার ... ১৭, ১৮, ২৯
"বিষবৃক্ষ" ... ৩০
বুদিয়াস ... ৪৮
বুদ্ধ ... ৫০
বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদ ... ৫০
"বেঙ্গল কেমিক্যাল" ২০, ২১, ৮৭, ১২৭, ১৭৭, ২১০
Bengal Canning & Condiments Works ১২৭
Bengal Miscellany ... ১২৭
Bengal Relief Committee ১৬৯, ২০৭
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ৩৩, ৩৪, ৪৩, ৪৭, ১০২
বেদ ২৯, ৩১, ৫৫, ১২৯, ১৩৮
বেদান্ত ... ২৯, ৫৫, ১২৯
বেন্ট্লি, ডাঃ ... ৫৭
বেবর ... ১৩৮
"বোধদয়" ... ১৯২
বোম্বাই ২৮, ৮০, ১১৫
বৌদ্ধ শাস্ত্র ... ২৯
ব্যক্তি সত্যাগ্রহ ... ১৯৩
ব্যানার্জি, জে. সি. ৬১, ৭৪, ১০৬
ব্যানার্জি, ডবলিউ. সি. ... ৬৯
ব্যাস ... ১৪৩
ব্রহ্মপুত্র নদী ... ২০৮
ব্রাহ্ম সমাজ ... ১৮২
ব্রেহী, টাইকো ... ৪৮
ব্রোচা, শুর সাপুরজি ... ১০৬, ১০৭
ব্ল্যাকী ... ২

পৃষ্ঠা

ভ

ভক্তমাল ... ১৪২
ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকমল ... ৩১
Bhattacharya, Jogendranath ৭১
ভট্টি ... ১০০
ভবভূতি ... ১৩৮
ভবানীপুর ... ১৬৫, ১৬৭
ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির ৪০, ৫১, ১০৮, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭২, ১৮৮
ভাটপাড়া ... ২৯
ভাণ্ডারকর ... ৭৭
ভার্জিল ... ১৩১
ভারতচন্দ্র ... ১৬৬
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ... ২১১
ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি ২১১
"Vision in a Dream" ... ২৩

ম

মগধ ... ১৪০
মজুমদার, ৺প্রতাপ ... ৪৯, ৬০
মণিপুর ... ১৪০
মনু ১১৬, ১২৯, ১৪৯, ১৫১
মর্গান ... ১০৬
মল্লিক, রাজা সুবোধচন্দ্র ... ১৩২
মল্লিনাথ ... ৪৬, ৬৭, ১০০
মহম্মদ ... ৫০
মহলানবিশ, প্রশান্ত ... ১৩৫
মাইকেল কলিন্স ... ১৯৯
মাইকেল মধুসূদন ৪৬, ১৩১, ১৭৭
মাঙ্গোপার্ক ... ১০২
মাণ্ডুক্য ... ২৯
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ... ৪২

পৃষ্ঠা

মাধবরাও, স্যর টি. ... ১৫০
মান্দ্রাজ ১৪, ৮০, ১২১, ১৪৩
মারবার ... ৫৯
মারে, স্যর আলেকজাণ্ডার ... ১০৬
মাসিক বসুমতী ... ১০৮
মায়াবাদী ... ২৮
মিত্র, রাজেন্দ্রলাল ১৯, ২২, ৬০, ১৩৮
মিল, জন ষ্টুয়ার্ট ... ১০০
মিলটন ৯৮, ১৩১, ১৪১
মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ... ২১১
মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ... ১৩১
মুখোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ ৫৮, ৬৯, ১৭৯
মুখোপাধ্যায়, স্যর রাজেন্দ্রনাথ ৬০, ৭৪, ১০৬
মুদ্দফরাস ... ১৪৭
মুরা ... ১৪৩
"মেঘদূতের পক্ষীতত্ত্ব" ... ১৯
মেট্রোপলিটন কলেজ ... ২১০
মেদিনীপুর ... ১৬৮
"Mental Limitations of the Experts" ... ১০৩
মৈত্র, যোগেন ... ১৮৯
মোতিচাঁদ ... ৯৯
মোরারজি, গোকুলদাস ... ৮০
মোহনবাগান ... ৩২
ম্যাক্সমুলার ... ২৭, ১৩৮
ম্যাটসিনি ... ৪৩
ম্যাঞ্চেষ্টার ... ৭৬, ১১৫
"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" ... ২০৭
Malcolm ... ২৮
"Massacre of St. Bertholomew" ৪৮

য

যশোর ... ২১
যিশু ... ৫০
"যুগশঙ্খ" ... ১৭৪

র

রকফেলার ... ১২৮
রকস্‌বার্গ ... ৬
রঘুনন্দন ... ১৫১
রণজিত সিংহ ... ৬৫, ১০০, ১৩৩
রবার্টস্‌, লর্ড ... ৬৬, ১৪৪
রবিনসন ক্রুশো ... ১০২
রবীন্দ্রনাথ ১১, ১৪, ১৮, ২৩, ২৯, ৩১, ৪১, ৫০, ৬০, ৯১, ১৩১, ১৫০, ২০৯
রবিনসন ... ৪৪
"রহস্য সন্দর্ভ" ... ২২
রহিমতুল্লা, স্যর ইব্রাহিম ... ৪৬, ১০৬
রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি ২৮
রয়েল সোসাইটি ... ১১, ৩৪
রংপুর ... ১৭, ২৯
রাও, স্যর টি. মাধব ... ১২৪
রাজনারায়ণ ... ৪৬
রাজসাহী ... ২০৬
রাজেন্দ্রনাথ, স্যর ... ৬০, ৭৪, ১০৬
রাদারফোর্ড ... ৪৫
"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" ... ১৩০, ১৩১
রামপ্রসাদ ... ১১
রামানন্দবাবু ১৫৮, ১৬১, ১৬২
রামানুজম্‌ ... ১১, ৯১, ১৮৯
রাড়ুলী ... ১৭৭, ১৮৬
Russell, Bertrand ... ৩৮
রায়, কালীনাথ ... ৪৭
রায়, কেশবচন্দ্র ... ১০৬

	পৃষ্ঠা
রায়, যতীন ...	২০৭
রায়, রাজা রামমোহন	১৭, ২৯, ৩৭, ৪১, ৫১, ৯১, ১৩১, ১৮৪, ১৮৫, ১৯৫
রায়, লালা রাজপত ...	৩৫
রায়, শ্রীমতিলাল ...	১৯৩
রায়, হরিশ্চন্দ্র ...	১৭৭
"রিফর্ম বিল" ...	১২১
রিসলি ...	১৪১
রীড ...	১৮
রেগান ...	২০
রেঙ্গুন ...	৬৩
রেড ইণ্ডিয়ান ...	১৩৭
রেলী ...	৯৪
রোডস, সিসিল ...	১০৪
ল	
ল' কলেজ ...	১৮৩
লণ্ডন	৫, ১৬, ২৬, ৪৫
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ...	৪৩
লর্ড আমহার্ষ্ট ...	১৮, ২৯, ১৩১
লর্ড এভবেরী ...	৯, ২৫
লর্ড কর্ণওয়ালিস ...	৮১
লর্ড কার্জন ...	৫০
লর্ড কিচনার ...	৬৬, ১৪৪
Lord Morley	২২, ২৩, ১১৯
লর্ড রবার্টস ...	৬৬, ১৪৪
লর্ড সিংহ ...	১১৯
লর্ড হার্ডিঞ্জ ...	৪৬
"Light of Asia" ...	১২৮
লামা ...	২৯
লাবক (Lubbock) ...	৮,৯
লিঙ্কন, আব্রাহাম ...	৪৩
লিপটন ...	৬৬
লিভারপুল ...	৭৬
লিভিংষ্টোন ...	১০২
League of Nations ...	১৫০
লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় ...	৪৩, ৭৬
লুথার, মার্টিন ...	১১৮
লেফ্রয় (Lefroy) ...	৭
লেসিং ...	৫০
লেয়ার্ড ...	৪৪
শ	
শঙ্কর ...	২৮
শরচ্চন্দ্র ...	১৮, ৩১
শান্তিনিকেতন ...	২৪, ২১১
শাস্ত্রী, শিবনাথ	২, ১৬, ১৩০, ১৪৭
শাস্ত্রী, শ্রীনিবাস ...	৫০, ১২২
শিউড়ী মেলা ...	২১১
শিবপুর কলেজ ...	২১
শিবাজী ...	৬৫, ১০০
শীল, মতিলাল ...	৫৮
শীল, স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ ...	১৯৭
শেফীল্ড ...	৭৬
শ্যাকল্টন ...	৪৭
শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়	১৬৪
শ্রীঅরবিন্দ ...	১৯৬, ১৯৭
শ্রীরামচন্দ্র ...	৪০
শ্রীরামপুর ...	১৪৪
শ্রীহট্ট ...	১৬৯
ষ	
ষড়দর্শন ...	১২
স	
সক্রেটিস	১২, ৪২, ৪৮, ১১৫

	পৃষ্ঠা
সঙ্কটত্রাণ সমিতি ...	২০৮
সত্যাগ্রহ ...	১৯৩
Sarkar, Akshay Kumar	৭১
সরকার, অধ্যাপক যতুনাথ	৪৫
সরকার, এন. সি. ...	৭৪
সরকার, নলিনবিহারী ...	৬০
সরকার, নিবারণচন্দ্র ...	৯৭
সরকার, পুলিনবিহারী ...	২১১
সাগরদাঁড়ি ...	১৭৭
সাদি ...	৩
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির	১৫১, ১৬১
সাস্তাহার ...	২০৫
"Subjection of Women"	১০০
"Sartar Resartus" ...	২৬
সারদারঞ্জন ...	৪৬
সাহা, মেঘনাদ	৪৫, ১৯৮, ২১১
সিকিম ...	৫, ৬
সিদ্ধার্থ ...	৫০
সিরাজগঞ্জ ...	৬১
সিংহ, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ...	১৪৪
সীতারাম ...	৩০
সুন্দরমল	১০০, ১০১, ১০৬
সুবোধচন্দ্র ...	১৩২
সুভাষচন্দ্র ...	২০৬
সুরেনবাবু ...	৩১
"সেকাল ও একাল" ...	১১১
সেক্সপিয়র	৯৮, ১৪১, ১৯০, ১৯৭, ১৯৯
সেন, এ. সি. ...	৮৪
সেন, কৃষ্ণবিহারী ...	৩৬
সেন, কেশব ...	৩৬, ৬০, ১১৮, ১৯৫
সেনগুপ্ত, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ ...	২০৬
সেন, জে. সি. ...	৮৪

	পৃষ্ঠা
সেন, নগেন্দ্রনাথ ...	২০৪
সেন, নরেন্দ্রনাথ ...	৫১
সেন, যামিনী ...	১৯৯
সেনেট হল ...	২১২
"সেল্‌ফ-কালচার" ...	২
স্কট ...	১৮
স্কালিগার ...	৪৮
"Study of Literature" ...	২৩
স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ...	১৩৮
স্পেনসর, হারবার্ট ...	১০৪
স্বদেশী ...	১৯৫
স্যান ইয়াত সেন ...	৩৭
স্যর আশুতোষ ...	৫৮
স্যর গুরুদাস ...	৭৭
স্যর টি. মাধবরাও ...	১২৪
স্যর তারকনাথ	১৫, ৩৬, ৬৯, ১৭৯
স্যর দোরাব তাতা ...	১২৬
স্যর পি. সি. রায় ফেলোসিপ	১৭৯
স্যর বেঞ্জামিন ...	১০৪
স্যর রাসবিহারী	১৫, ৩৬, ৬৯, ১৭৯
স্যর শঙ্কর নায়ার ...	৫৬
স্যর সালারজঙ্গ ...	১২৪
স্যাড্‌লার ...	১০৭

হ

হরতাল ...	১৩৩
হরিজন ...	১৯২
হরিশ্চন্দ্র ...	১৭৭
হামডেন ...	১৩২
হাড়ি ডোম ...	১৩৯, ১৪৭
হালিসহর ...	১১
হারগ্রিভ্‌স ...	৭৯

পৃষ্ঠা

হারভার্ড ... ৪৬
হার্শেল ... ৪৮
হায়দর আলি ... ৬৫, ১০০, ১৩৩
হিউ, এ. ... ১০৬
হিউবার ... ৬
হিন্দু কলেজ ... ৬৮
হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস ২৮, ১৪৮
হিন্দুসভা ... ৩৫
"হিষ্ট্রি অফ ইংলিশ ড্রামা" ... ১৯০

পৃষ্ঠা

"History of Bees" ... ৬
"History of Hindu Chemistry" ২৮, ১৪৮
হুকার ... ৫, ৪৭
Henry Froude ... ২৬
হেয়ার স্কুল ... ১৯৫, ২১০
হোমার ... ১৩১
হ্যানকিন, ডাক্তার ... ১০৩
হ্যামিলটন ... ১৮
হাঁচি টিকটিকি গিরগিটি ... ১১৬